প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৭

চন্দন ঘোষ কর্তৃক
মন্মথ মুদ্রণী, ২৮।৩।আর, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলিকাতা-৫৪ থেকে মুদ্রিত।
গ্রন্থ-গৃহ, ৮এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত

॥ সূচীপত্র ॥

মনের কথা ১

কয়েকটি স্বপ্নের কথা ১৮

খাইবার জিনিস ২০

সেনগ্রাম ২৩

সেনগ্রামের চিকিৎসা ২৪

রাত্রে খাট দিনে সিন্দুক ৩০

কুণ্ডু মহাশয় ৩১

হরিদাসের হিন্দুয়ানী ও মাথাধরা ৩২

কালের কথা ৩৬

ফুল ৩৮

মৌনীবাবা ৪০

ধর্ম বিশ্বাস ৪৩

ভয়ানক সমস্যা ৪৪

বাঙালীর হুজুক ৪৫

দলাদলি ৪৬

বাঙালীর ভাগ্য ৪৭

মারি ভয় ৫১

জমিদার ও প্রজা ৫২

কেনী কাহিনী ৫৪

দীনপালিনী শ্রীমতি রাণী স্বর্ণময়ীকে 'মহারাণী' উপাধি দান ৫৮

পদ্মানদী ৬০

ভূস্বামী ৭১

সেনগ্রামের ইতিহাস ৭৭

আরও কেনী কাহিনী ও চিরফন কাহিনী ৮৩

সূচীপত্র

কৃষি ও শিল্প কার্যে বর্তমান বিঘ্ন ও দুরবস্থা ১১০
তগাবি ও বঙ্গের কৃষকগণ ১২১
শ্রমবিভাগ ১২২
কৃষক ও পল্লীবাসীর স্বাস্থ্য ১২৬
কুষ্টিয়ার কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী মেলা স্থায়ী করার উপায় ১৩০
সদুপদেশ ১৩২

লালন জীবনী : হিতকরী পত্রিকা : রাইচরণ দাস
—আবুল আহসান চৌধুরী ১৩৩
মহাত্মা লালন ফকীর —রাইচরণ দাস ১৩৫
কুষ্টিয়ার স্মৃতিকথা : রাইচরণ দাস —ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন ১৩৯
রাইচরণেষু (রাইচরণ দাসের জীবন-কথা) —কুমারেশ ঘোষ ১৪২

বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও গবেষক

আবুল আহসান চৌধুরী

পরম প্রীতিভাজনেষু—

যাঁর আগ্রহে

এই বইখানি প্রকাশিত।

পূর্বকথা

বছর দুই আগে একদিন বাংলাদেশের কুষ্টিয়া থেকে আমার নামে রেজেষ্ট্রী ডাকে একখানি বই এলো। নাম 'লালন স্মৃতিগ্রন্থ'। গ্রন্থের সম্পাদক মঃ আবুল আহসান চৌধুরী পাঠিয়েছেন এবং একখানা চিঠিতে জানিয়েছেন, বইখানিতে 'মহাত্মা লালন ফকীর' নামে প্রবন্ধটি আপনারই মাতামহ কুষ্টিয়ার উকিল রাইচরণ দাস মশায়ের লেখা। হিতকরী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

চৌধুরী সাহেব আরও লিখেছেন, দাদামশায়ের লেখা তিনি আরও প্রকাশ করতে চান এবং তাঁর জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে জানতে চান। কাজেই আমি যেন দাদামশায়ের লেখাগুলি খুঁজে বার করে তাঁকে পাঠাই। শুধু তাই নয়, তিনি আমার একটি কুষ্টিয়ার স্মৃতিকথা লেখবার জন্যেও অনুরোধ করেছেন।

চৌধুরী সাহেবের বইখানি পেয়ে মুগ্ধ হলাম এবং চিঠিখানি পেয়ে চমকিত হলাম। নিজে সাহিত্য করি, অথচ দাদামশায়ের সাহিত্যকর্মের তেমন কোন খবরই রাখিনা। শুধু জানতাম, তিনি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন। নিশিকান্ত পাত্র সম্পাদিত 'জাগরণ' পত্রিকার কার্যালয় ছিল তাঁর কুষ্টিয়ার বাড়ির একটা ঘরে এবং আর একটা ঘরে ছিল পাড়ার লাইব্রেরী। দাদামশায় মাঝরাত্রে উঠে মাথার কাছে রাখা ডেস্কে কাগজ আর দোয়াত কলম নিয়ে কী যেন সব লিখতেন, তাও শুনেছি। সে তো ওকালতি-মুসাবিদাও হতে পারে।

দাদামশায়ের জন্ম ১৮৫৯ সালের নভেম্বরে, মারা যান ১৯৩২ সালের নভেম্বরে ৭৩ বছর বয়সে কলকাতায় ৪৫এ গড়পার রোডে আমাদের বাড়িতে। তাঁর একমাত্র জীবিত সন্তান আমার মা সরলাবালা মারা গেলেন মাত্র সাত মাস পরেই ১৯৩৩ সালে ৩রা জুনে ৪২ বছর বয়সে। তারপরেই উত্তরাধিকার সূত্রে কুষ্টিয়া, সেনগ্রাম ও মহলের দেখাশোনার ভার পড়লো আমারই ওপর। আমি তখন সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র আই-এস-সি পড়ি। বাবা প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ও যশোরের চিরুণী শিল্পের

প্রতিষ্ঠাতা মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর কর্মক্ষেত্রে রীতিমত ব্যস্ত। তাই ছুটির ফাঁকে ফাঁকে জমিজমা বাড়িঘর দেখবার কাজে আমিই বহাল হলাম।

তারপর হলো বঙ্গভঙ্গ। তল্পিতল্পা গুটিয়ে অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে এলেন পশ্চিমবঙ্গে। আমিও। সঙ্গে আনলাম বেঁধে ছেঁদে সব কিছু দলিলপত্র ও কাগজপত্র। তার অনেক কিছুই কোনদিন হাত দেবারও দরকার হয়নি।

চৌধুরী সাহেবের চিঠি পেয়ে হাতড়াতে লাগলাম সেইসব কাগজপত্র। পেলাম দাদামশায়ের জড়ানো পাকা হাতের লেখা কয়েকখানি খাতা। তার দু-একটায় দেখি উইপোকারা রসাস্বাদন করেচে, আগের থেকেই খবর পেয়ে। একে পাকা লেখা, তায় পোকায় কাটা—উদ্ধার করা রীতিমত বিদ্যা-বুদ্ধি ও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু মন তখন অনুতপ্ত। কাজেই দাদামশায়কেই স্মরণ করে লেগে গেলাম কাজে।

আমার নাতনী, মেয়ের মেয়ে অর্থাৎ দাদামশায়ের নাতির নাতনী বর্ষাতি বা সুস্মিতা (মজুমদার)কে দিয়েই শুরু করালাম অনুলেখন। দাদামশায়ের 'মনের কথা'। আমি পাঠোদ্ধার করে বলে যেতে লাগলাম। পরে এই অনুলেখনে সাহায্য করলেন অসীমানন্দ মুখোপাধ্যায়, বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, দেবাশীষ মজুমদার, রামকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যজিৎ বসু প্রভৃতি। আর নানাভাবে সাহায্য পেলাম স্ত্রী বেলারাণী, পুত্রদ্বয় চন্দন, সৌরভ এবং আরো অনেকের

দাদামশায়ের লেখা খুঁজে পাওয়ার খবর দেওয়ায় কুষ্টিয়া থেকে আবুল আহসান চৌধুরী সাহেব লিখলেন (৭.৩.৭৬) 'আপনার দাদামশায়ের সম্পর্কে আমি গবেষণামূলক কিছু কাজ করতে চাই। এই কাজের জন্য আপনার দাদামশায়ের 'মনের কথা' ও অন্যান্য পাণ্ডুলিপি বিশেষ প্রয়োজন। আশাকরি এ ব্যাপারে আপনার উদার সাহায্য ও সহানুভূতি পাবো। কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। ···এই সঙ্গে কাজী মোতাহার হোসেনের ঠিকানা দিলাম :- ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন (জাতীয় অধ্যাপক) ১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২, বাংলাদেশ। ইতি—'

তারপর চৌধুরী সাহেব আমাকে তাগিদ দিতে লাগলেন আমার কুষ্টিয়ার স্মৃতিকথা এবং দাদামশায়ের জীবনের ঘটনাবলীর জন্যে। শেষ পর্যন্ত পাঠাতে হলো আমার কুষ্টিয়ার বাল্যের স্মৃতিকথা দাদামশায়ের

জীবনের মজার মজার ঘটনাসহ। ('রাইচরণেষু' দ্রষ্টব্য, অংশ বিশেষ) তাতে চৌধুরী সাহেবের ক্ষতিই হয়ে গেল। তিনি লিখলেন—'আপনার স্মৃতি-কথা পড়তে গিয়ে আমার একটি ক্ষতি হয়ে গেছে। জেলা প্রশাসকের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ছিল, তা ফেল করেছি। বেশ কয়েকজনকে পড়ে শুনিয়েছি। বড় দরদ দিয়ে লিখেছেন। এমন সরস স্মৃতিকথা বড় বেশী একটা পড়িনি। আপনার চোখ দিয়ে পুরনো কুষ্টিয়াকে দেখলাম—বড় ভাল লাগলো। স্মৃতিকথার যৌবন-অংশ করে পাঠাচ্ছেন ?'

স্মৃতিকথার যৌবন-অংশ লেখবার সময় এখনও পাইনি। তবে দাদা-মশায়ের 'মনের কথা' কপি করে পাঠালাম। চৌধুরী সাহেব লিখলেন (৬।৯।৭৬), 'পরম শ্রদ্ধেয় রাইচরণ দাস মহাশয়ের 'মনের কথা' পাণ্ডুলিপি যথাসময়েই পেয়েছি। তাঁর লেখটি বড় ভাল লাগলো। পুরনো দিনের কথা তিনি মনের মাধুরী মিশিয়ে লিখেছেন। আপনি বড় ভাগ্যবান—পিতৃকুল এবং মাতৃকুলের সাহিত্য-স্বভাব পূর্ণরূপে আপনাতে বর্তেছে। নানা বৈষয়িক কর্মকাণ্ডের মধ্যে থেকেও যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আপনি সাহিত্য-চর্চা করে যাচ্ছেন, তা অনুসরণযোগ্য ও শ্রদ্ধার্হ। ···কী করে আপনার ঋণ শোধ করবো জানি না।'

আবুল আহসান চৌধুরী সাহেবের চিঠিতে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবের ঠিকানা পাওয়ার পর, তাঁকে আমার পরিচিতি দিয়ে যে চিঠি দিয়েছিলাম, তার উত্তরে তিনি যে চিঠি দিলেন, তা আমার কাছে পরম মূল্যবান সম্পদ বিশেষ। ইনি চৌধুরী সাহেবের মাতুল। বর্তমানে বয়স ৮০ তিনি লিখলেন (২৪।৪।৭৬) 'গতকাল আপনার পত্র পেয়ে অতিশয় সন্তুষ্ট হলাম। আমি সেনগ্রাম স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। (তাঁর 'কুষ্টিয়ার স্মৃতিকথা' দ্রষ্টব্য) ৺রাইচরণবাবু আমার পিতৃতুল্য লোক। সেনগ্রামের লোক এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের লোক তাঁর কৃপায় শিক্ষালাভ করেছে বলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি জানি, কুষ্টিয়ারও বহু লোক তাঁকে তাঁর দান-ধর্ম ও সহৃদয়তার জন্য ভক্তি করে। কুষ্টিয়া স্কুলে পড়বার সময় (১৯১১-১৯১৪) তিনি আমাকে স্নেহ করতেন, আর আমিও বহুবার তাঁর বাড়ীতে গিয়ে আহার করেছি। সেই সব স্মৃতি আমার মনে চির-জাগ্রত রয়েছে। আমি সামান্য লোকে, বিজ্ঞান পরিষদের লোক। তবু সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও কিছু কাজ করে পশ্চিমবঙ্গের লোকেদেরও প্রীতি লাভ

করে ধন্য হয়েছি। আমার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক বোধহয় মামা-ভাগিনেয়-র মত। আমার এই নতুন ভাগিনার সকল কার্য সার্থক হোক, যশঃগৌরব বৃদ্ধি হোক, আর দেশের লোক তাঁর সেবায় ও মানবতায় উপকৃত হোক—এই আমার আশীর্বাদ ও প্রার্থনা। ইতি— আপনার মঙ্গলাভিলাষী মামা কাজী মোতাহার হোসেন। পুঃ— পত্রপাঠ উত্তর দিবার জন্য পোষ্টকার্ডেই লিখলাম।'

এত কথা লেখবার কারণ, আমি এতদিন জানতাম না, বাংলাদেশে এখনও দাদামশায় কতজনের কাছে কতখানি শ্রদ্ধার পাত্র। আর আমিও কতজনের আশীর্বাদের পাত্র এবং কতজনের ভাইয়ের মতো, তাও ছিল অজানা। নিজেকে যেন নতুন করে চিনলাম।

দাদামশায়ের এই 'মনের কথা, অনেক কথা বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছিল। অবহেলার মহাপাপে মগ্ন হতে যাচ্ছিলাম। চৌধুরী সাহেবের আগ্রহেই আমি আজ সে পাপ থেকে মুক্ত। এখন বুঝচি যে, দাদামশায়কে আমি ভয়ই করতাম, এঁরা করতেন ভক্তি-শ্রদ্ধা।

আজ অসংকোচে স্বীকার করি, আবুল আহসান চৌধুরীর আন্তরিক আগ্রহেই দাদামশায়ের রচনাবলী এ যুগের মানুষের কাছে প্রকাশিত হলো। এজন্যে তাঁর কাছে আমি চিরঋণী। তাই এ বইখানি তাঁর নামেই উৎসর্গ করলাম।

কিন্তু তাতেই কি ঋণ-মুক্ত হলাম? না।

—কুমারেশ ঘোষ

।। করুণাধারা ।।
২৮।৩।আর, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড
কলকাতা-৫৪

কয়েকটি কথা

ডঃ স্যমুয়েল জনসন বলেছিলেন, 'Everyman's life should be best written by himself.'

আর ডঃ জোসেফ কলিনস যা বলেছিলেন, তার মর্মকথা হচ্ছে, আত্ম-চরিত আর জীবন-চরিতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমটায় অন্তরের কথা প্রকাশ পায়, অন্যটা হয় অন্তঃসার শূন্য।

আমাদের মনে হয় শিক্ষিত প্রত্যেক লোকেরই উচিত যথাসাধ্য নিজের জীবনের কথা, অভিজ্ঞতার কথা লেখা। তাতে তাঁর বংশধররা নিজেদের পরিচয় জানতে পারেন, সে রচনা হয় বংশের পরম সম্পদ। আর প্রকাশিত হলে, অনুসন্ধিৎসু পাঠকরাও হন উপকৃত। পুরোন অনেক কিছু জানতে পারেন। প্রকৃত ঘটনাবলী পেলেই হলো, সাহিত্য নাই বা হলো!

দাদামশায়, রাইচরণ দাস মশায় তাঁর 'মনের কথা' লেখবার সময় মনে হয় দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছিলেন। তাই প্রথমেই লিখেচেন 'লেখা মনের মত হয় না, লিখিবার আগেই সমালোচনা করিতে বসি...কখনো বিবেকবাণী অগ্রাহ্য করিয়াছি, বিপদগামী হইয়াছি, কখনো বিবেকের কথা শুনিয়া চলিয়াছি, সংসারে কোন বাধাবিঘ্ন মানি নাই। এই ঘোরতর সংগ্রামের চিত্র নিশ্চয়ই শিক্ষাপ্রদ সন্দেহ নাই।' এছাড়াও তাঁর এই আত্মচরিত লেখবার জন্যে আরও অনেক যুক্তি-তর্ক দেখিয়েচেন। সেগুলি উপাদেয়, তবে আত্মচরিত লেখবার যুক্তি হিসাবে দরকার ছিল না। কারণ আত্মচরিত লেখবার অধিকার—অধিকার কেন, কর্তব্য সকলেরই, আগেই বলেচি।

তাছাড়া এই রচনাবলীতে শুধু তাঁর 'মনের কথা'ই নেই, আছে দেশের কথা, দশের কথা, অনেক কথা। তাই বইখানির নামকরণ হলো—'মনের কথা, অনেক কথা'।

'মনের কথা' দাদামশায় মন খুলেই লিখেচেন। বেশ সরস করে লিখেচেন। লেখায় রঙ্গব্যঙ্গেরও অভাব নেই। ইলিশমাছের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বের কথা গোপন করেননি, আবার বড়লোকদের মাছ-ধরা, তাঁদের শ্রমবিমুখতা, অর্থ-কার্পণ্য নিয়ে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েননি। তখনকার দিনের কয়েকটা মজার গল্পও তিনি বলেচেন।

লেখার ভাষাটা যেন ওজন করা। ছোট ছোট সেনটেন্স। একেবারে লক্ষ্যভেদী। ভারসাম্য লক্ষ্য করবার মত। বক্তব্য অতি স্পষ্ট, কোথাও ধোঁয়াটে ব্যাপার নেই।

দাদামশায় তাঁর কয়েকটি 'স্বপ্নের কথা'ও বলেচেন। খাবার জিনিস নিয়ে রসালো আলোচনা করেচেন। আবার তেমনি ফুল-এর কথাও বলেচেন, খাবার-ফুলের কথাও। 'রাত্রে খাট দিনে সিন্দুক' একটি গৃহস্থ বাড়ির মনোরম বিবরণ।, 'কুণ্ডুমশায়' একটি সেকালীন মজাদার গ্রামীন চরিত্র। তেমনি 'হরিদাসের হিন্দুয়ানী ও মাথা ধরা'য় দেখতে পাই চমৎকার এক ভৃত্য-চরিত্র, যা আজও কোন কোন বাড়িতে দেখা যায়। ঐ মাথাধরা সারাবার দাদামশায়ের ওষুধটিও বেশ ফলপ্রদই দেখা গেল। 'কালের কথা'য় দাদামশায় তাঁর কালের কথা জানিয়েচেন। 'মৌনীবাবা' সত্যিই এক চমকপ্রদ অজানা কাহিনী।

দাদামশায় তাঁর সাবলীল লেখার মাধ্যমে আমাদের 'ধর্মবিশ্বাস' 'বাঙ্গালীর হুজুক', বাঙ্গালীর সমস্যা', 'বাঙ্গালীর ভাগ্য' 'দলাদলি' 'মারিভয়' ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে অতি যুক্তি-পুর্ণ আলোচনা করেচেন। বিষয়গুলি সেকালীন হলেও, একালেও তার জের দেখতে পাই এবং ঐসব বিষয়ে জেরবারও হয়ে থাকি।

'জমিদার ও প্রজা' নিয়েও তাঁর আলোচনা রীতিমতই তথ্যপুর্ণ। আজকের দিনে ঐ জমিদার আর প্রজা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার হয় না বটে, তবে এর ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। সেকালের নীলকুঠি ও নীলকুঠির সাহেবদের কথা, যথা 'কেনী কাহিনী' বা 'ষ্টিফেন কাহিনী' সত্যিই বিস্ময়কর। অখণ্ড বঙ্গদেশে এও এক মর্মান্তিক ইতিহাস। দেশীয় জমিদারদের সঙ্গে ঐসব নীলকুঠিয়াল সাহেবদের ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, মোকদ্দমা, জব্দ করবার কৌশল ইত্যাদি রচনার কৌশলে আমাদের চোখের সামনে যেন বাস্তব হয়ে ভেসে ওঠে। ঐসব অজানা কাহিনী ইতিহাসের গবেষকদের পক্ষে বিশেষ বিষয়।

কাশীমবাজার রাজ-পরিবারের সঙ্গে দাদামশায়ের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। গড়পারের বাড়িতে দাদামশায়ের শ্রাদ্ধে মহারাজা ৺মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পুত্র মহারাজা ৺শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের উপস্থিতির কথা আজও মনে আছে। দীনপালিনী শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ীকে ইংরেজ সরকারের

'মহারাণী' উপাধি দান এবং কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী-র জীবনকথা দাদামশায়ের কলমে পরম আন্তরিকতায় সুপরিস্ফুট। বঙ্গদেশের এই প্রখ্যাত রাজপরিবারের বহু অজ্ঞাত তথ্য জানা যায় এই রচনা দুটিতে।

'পদ্মানদী' রচনাটি যেমন বিস্ময়কর, তেমনি তথ্যপূর্ণ। পদ্মানদীর গতি-প্রকৃতির বিবরণ যেভাবে দাদামশায় দিয়েছেন, তাতে বেশ বোঝা যায় এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান কত গভীর ছিল। কীর্তিনাশা পদ্মানদীর দুধারে কত যে গ্রাম, তাদের নাম, তাদের পরিণতি পাঠক-মনকে অভিভূত করে দেবার মতই। বিশেষ করে রচনাটির শেষাংশে পদ্মানদীর উদ্দেশ্যে তাঁর মন্তব্য রসোত্তীর্ণ সাহিত্য বিশেষ।

বঙ্গদেশের কৃষক ও শিল্পীদের কথা তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। নানাভাবে তাদের উপদেশ দিয়েছেন। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দায়িত্ব ও শ্রম বিভাগের কথা নিয়ে আন্তরিক আলোচনা করেছেন।

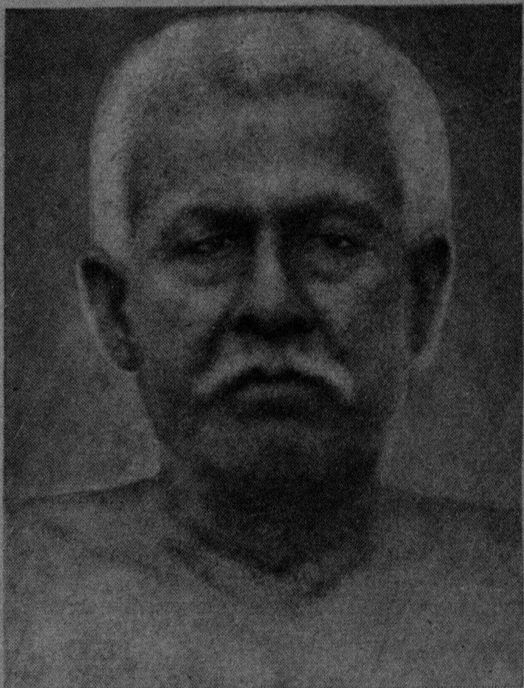
দাদামশায় তাঁর নিজের গ্রাম সেনগ্রামের কথা, সেনগ্রামের লোকেদের কথা, ইতিহাসের কথা আমাদের বলেছেন। গ্রামের কুসংস্কার, চিকিৎসা পদ্ধতি, অন্ধ-বিশ্বাস ইত্যাদির কথা পড়লে বোঝা যায়, তিনি কতটা সংস্কার-মুক্ত ছিলেন, কতটা দূরদৃষ্টি ছিল তাঁর। এ ক্ষেত্রে সেনগ্রাম শুধু তাঁর গ্রাম নয়, বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রায় সব গ্রামগুলিরই প্রতীক।

দাদামশায় উকিল ছিলেন, অথচ আশ্চর্য, তাঁর রচনায় কোন তারিখ দেওয়া নেই। তবে রচনাগুলি ৬০।৭০ বছর আগেকার এবং ঘটনাবলী ১০০।১৫০ বছরের পুরোন। তবে এই বইয়ের বানানগুলি আধুনিক ধাঁচের করা হয়েছে। কারণ, পুরোন বানানের টাইপ এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য।

পরিশেষে দাদামশায়ের কথা দিয়েই আমার কথা শেষ করি। তিনি এক জায়গায় সবিনয়ে লিখেছেন,—'এই জীবনে যাহা কিছু দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, আমার অস্তিত্বের পরিচয় স্বরূপ (তাহা) লিখিয়া রাখিতেছি মাত্র। ইহা কোন শিক্ষাপ্রদ বই হইবে না। ইহা জনসাধারণের নিতান্ত অরুচিকর না হইলেও পাঠাগারে ইহার স্থান হইবে না। লোকে কিনিয়া পড়িবে দূরে থাকুক সাধিয়া দিলেও পড়িবে না।'

তবুও প্রকাশ করা দরকার মনে করেছি। তাই এই প্রচেষ্টা।

—কুমারেশ ঘোষ



রাইচরণ দাস

জন্ম : নভেম্বর, ১৮৫৯ (সেনগ্রাম)

মৃত্যু : নভেম্বর, ১৯৩২ (কলিকাতা)

মনের কথা

অনেক দিন হইল আমি আমার এই 'মনের কথা' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। সেও প্রায় ২৫ বৎসর অধিক দিনের কথা। তখন আমার স্নেহের ভাই ত্রৈলোক্য জীবিত ছিল। আমি তাহার নিকট বিদায় লইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই অকালে আমার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। সেই অবধি আজ পর্যন্ত লেখা আর শেষ হইল না। লেখা মনের মত হয় না, লিখিবার আগেই সমালোচনা করিতে বসি; কাজেই সমালোচনার তীব্র দৃষ্টিতে লেখার ভাব সহজেই লেখার আগেই মনেমনে পর্যবসিত হইয়া যায়। এই লেখার উদ্দেশ্য এই যে, আমি এই সংসারে ৭০ বছর হইল আসিয়া কত দেখিলাম, কত শুনিলাম, কত করিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। মনেমনে কত ভাবিলাম তাহাও মনেই মিশিয়া গিয়াছে। চিত্তোপরি এখনো অনেক অঙ্কন আছে, সে খাঁটি চিত্রটি জনসমাজে দেখাইলে মন্দ হয় না। কখনো বিবেকবাণী অগ্রাহ্য করিয়াছি, বিপদগামী হইয়াছি, কখনো বা বিবেকের কথা শুনিয়া চলিয়াছি, সংসারের কোন বাধাবিঘ্ন মানি নাই। এই ঘোরতর সংগ্রামের চিত্র নিশ্চয়ই শিক্ষাপ্রদ সন্দেহ নাই।

সংসারের মায়াবন্ধনও কত অনুভব করিয়াছি। স্নেহময়ী জননী, পরমারাধ্য পিতাঠাকুর পূজনীয়া বড় ভগিনী, পিসিমা, ভক্তিভাজন খুড়া, স্নেহময়ী খুড়িমা, সহোদরা সুখদা, পরমসাধু ভাই ত্রৈলোক্য, পরম অনুগত ভাই অভয়, ও খেলার সাথী ও পাঠের সঙ্গী ও কার্যক্ষেত্রের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন বহু ব্যক্তির মায়াবন্ধনে সংসারে বেশ সুখেই ছিলাম। সে সকল বন্ধন যখনই একটু খসিয়াছে তখনই যে কষ্ট পাইয়াছি তাহা মন জানে ও

আমি জানি। —সে সব এখন মনে আনিতে পারি না ও ভাষায় প্রকাশ করিতেও অক্ষম। এখনো আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী, কন্যা, প্রভৃতির মমতায় দৃঢ় রূপে সংসারে আকৃষ্ট আছি—কবে সে বন্ধনপাশ ছিন্ন হইবে এই আশঙ্কায় আশঙ্কান্বিত। আত্মীয়-স্বজন পরোপকারী প্রিয় সুহৃদগণকে ছাড়িয়া যাওয়া কালে মনের কথা যাহা এতদিন মনেমনে রাখিয়াছি তাহা এখন ব্যক্ত করিয়া বিদায় লইতে চাই। কিন্তু ভাষা ও শক্তি কোথায়?

ইহা ছাড়া মৃত্যুর পর কোথায় যাইব কিভাবে থাকিব তাহাও ভাবিয়া কূল কিনারা পাই না। এই সকল জ্ঞান ও এযাবৎ যাহা করিয়াছি তাহাই আমার অজ্ঞানের পরিচয়। তাহার নমুনা রাখিয়া না গেলে এ সংসারে আসা না আসা সমান; সমুদ্রের মধ্যে জলবিম্বের ন্যায় উদিত হওয়া ও অচিরাৎ বিলীন হওয়া ব্যতীত কিছু নহে। জগতের সকলই নশ্বর—কেবল বিশ্ব-পিতার সৃষ্টি চন্দ্রসূর্য্য পৃথিবী ও আকাশের গ্রহাদির স্থায়িত্ব দেখিতে পাই। জীবজন্তু সকলগুলি মানবেরই উত্থান পতন দেখিতেছি, ইহাও স্বাভাবিক। মানবজন্ম গ্রহণ করি। শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া শেষে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, এ ত নূতন কথা নহে, ইহা সকলেই জানেন, ইহাতে আবার লিখিবার কি আছে, এক শ্রেণীর লোক ইহা বলিতে পারেন; আমি বলি তাহা ঠিক নহে। এ জগতে আমরা মানবজীবনের বিগত কালের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া কত উপকৃত হইতেছি। মহামতি ধর্মপরায়ণ মহাত্মাগণের জীবনীপাঠে সন্তোষ লাভ, মহাপাপী নৃশংস দুর্বৃত্তের জীবনী পাঠেও মহা উপকার সাধিত হয়। বিপথগামী হইলে কি পরিণাম হয় তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়া আমরা সতর্ক হই ও শিক্ষা লাভ করি।

ভালমন্দ সকলই আমাদের শিক্ষার সামগ্রী। আমরা কাব্য ও ইতিহাসে মানবজীবনের যে সকল রেকর্ড পাইতেছি তাহা খাঁটি ও সম্পূর্ণ অবস্থায় পাই নাই, পাইলে জনসাধারণের বিপুল উপকার সাধিত হইত। এখন আর তাহা পাইবার উপায় নাই। এই বিস্তীর্ণ সংসারে কত মহাত্মা পবিত্র কুসুমের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাহার সুগন্ধ লাভ করিতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। যদি তাহার নমুনা কিছু পাইতাম, লাভবান হইতে পারিতাম। সেকালের সত্যযুগের কথা স্বতন্ত্র; পূর্ব যুগে পূর্ণাবতার যীশু, ধর্মাবতার মহম্মদ, প্রেমাবতার মহাপ্রাণ চৈতন্য ও একালের জনহিতৈষী ধর্মপ্রাণ রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন,

রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জনহিতৈষী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি—ইঁহাদের সকলে তাঁহাদের হৃদয়ের ভাবকুসুমগুলি ফুটাইয়া জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া যদি তাহা আমাদের সম্ভোগের জন্য রেকর্ড করিয়া রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমাদের কত প্রভূত উপকার হইত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য, কেহই তাহা করেন নাই। যদি পাপিষ্ঠ জগাই মাধাই কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে বিবেকের দংশন কিরূপ চলিয়াছিল ও পরিণামে উদ্ধারের সময় কিভাব প্রাপ্ত হইলেন তাহা তাঁহারা যদি লিখিয়া যাইতেন তবে তাহা একটি মহাগ্রন্থ হইত। যদি অত্যাচারী ব্যক্তিগণ, যাহাদের নির্যাতনে সেকাল হইতে একাল পর্যন্ত জনসাধারণ প্রপীড়িত হইতেছে, কিভাবে বিবেকের বাণী অগ্রাহ্য করিয়া পাপের প্রলোভনে পাপপঙ্কে পতিত হইয়া মহা নির্যাতনে লিপ্ত ছিলেন, তাহা লিখিয়া রাখিয়া গেলে, তাহাতেও মহোপকার সাধিত হইত।

আমি এই সকল বড় বড় কথা বলিয়া ও দুঃখ করিয়া নিজে কিছু করিয়া যাইতেছি, কেহ এরূপ কিছু মনে করিবেন না। আমার দেহটি ও মন ও আত্মাটি যিনি সৃষ্টি করিয়া নানা সদ্গুণে বিভূষিত করিয়া সকল রকম মনোবৃত্তিতে সুসজ্জিত করিয়া দিয়া পরীক্ষার্থে সংসারক্ষেত্রে দিয়াছেন, যদি তাঁহার ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিতাম তবে এ সংসারক্ষেত্র জীবন্ত ফুল-বাগান হইত। তাহা হয় নাই, এইবারও সময় নাই। লিখিয়া রাখিবারও কিছু নাই। তবে এই জীবনে যাহা কিছু দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, ভালমন্দ যে সকল ঘটনা লইয়া আমার এই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব, তাহার নমুনা নিতান্ত সাধারণ হইলেও আমার অস্তিত্বের পরিচয় স্বরূপ কিছু লিখিয়া রাখিতেছি মাত্র। ইহা কোন শিক্ষাপ্রদ বই হইবে না। ইহা জনসাধারণের নিতান্ত অরুচিকর না হইলেও পাঠাগারে ইহার স্থান হইবে না। লোকে কিনিয়া পড়িবে দূরে থাকুক সাধিয়া দিলেও পড়িবে না। তথাপি ইহা লিখিয়া নিজের কষ্টলব্ধ অর্থ ব্যয় করিতে চাহি কেন, তাহার অবশ্য কারণ আছে।

একদিন নবাবিষ্কৃত কলের গানে gramophone যন্ত্রে একটি সুললিত তাল লয় সংযুক্ত সংগীত শুনিয়া মন বিমোহিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম গায়ক কে?

প্রত্যুত্তরে শুনিলাম তিনি অনেকদিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

মনে হইল, কই, তিনি তো ইহলোক ত্যাগ করেন নাই। ঠিক যেন অদৃশ্যে পর্দার অন্তরালে গান করিতেছেন। তাঁহাকে তো আমরা পাইয়াছি, তাঁহার চেহারায় আমাদের আবশ্যক নাই। জীবন্ত মানুষের গলার স্বর ঠিক বর্তমান আছে। গানটিতে তিনি স্বয়ং জাগ্রত বিদ্যমানতার পরিচয় ভাল রূপেই দিতেছেন। গানের রেকর্ড বহুদিন থাকিবে। তিনি নিজ হাতে নিজের জীবনের ঘটনাবলী ও হৃদয়ের ভাবগুলি যথাযথরূপে লিখিয়া রাখিলেও জীবনের একটি সুন্দর রেকর্ড হইত। গানটি তাঁহার স্বরচিত মনের ভাবজ্ঞাপক না হইতে পারে কিন্তু আপন স্বরজ্ঞাপক বটে।

আমার পরমাত্মীয় যশোহর জেলার পূর্বশ্রীকোল নিবাসী আবগারি বিভাগের একজন সুযোগ্য কর্মচারী শ্রীযুত হীরালাল বিশ্বাসের চিত্তবিনোদক গান যে শুনিয়াছে সেই মোহিত হইয়াছে। ভাল ভাল গানগুলি হীরালাল আমাকে যখন শুনাইত তখন আমি সব ভুলিয়া গিয়া মুগ্ধ হইয়া মনে করিতাম, আমি ইহার এই ভাল ভাল গানগুলি কর্ণকুহরে শ্রবণ করিয়া হৃদয়ের তারে গ্রহণ করিয়া রাখিতে পারিলে আর আহার নিদ্রার আবশ্যক হইত না। উহা পাইয়াছি ভাবিয়া সুখে থাকিতাম। দুঃখের কথা কী কহিব, হীরালাল আর ইহজগতে নাই, তাহার গানের নমুনাও রক্ষিত হয় নাই। তাহার গান আমার হৃদয়পটে যেরূপ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করিবার ভাষাও আমার নাই।

যদি বাল্যসখা শ্রীমান জলধর সেন রায় বাহাদুরের মত লিখিবার শক্তি ও মীর মশাররফের মত প্রকাশ করিবার শক্তি আমার থাকিত তবে হয়ত প্রকাশ করিতে পারিতাম। আমার দেহান্তরে হীরালালের গানের তাৎপর্যের কিছুই থাকিবে না। কবিরা নিজ নিজ মানস সরোবরের ফুলগুলি কুড়াইয়া কতক জন-সরবরের নিকট হাজির করিয়া দিয়া নিজ নিজ জীবনের রেকর্ড রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ের আসল চিত্রটি হৃদয়ের অন্তরালেই লুক্কায়িত। অন্যে তাহা দেখিতে বা জানিতে পারে না।

মানুষ কি একটা তুচ্ছ পদার্থ। আমরা যে সামান্য নগণ্য ধরণীশায়ী ক্ষীণকায় দীনবেশ মানুষকে দেখিয়া তাচ্ছিল্য করি, ফিরিয়াও চাহি না, সেও সেই পরম করুণাময় মহান পরমেশ্বরের হাতের জিনিস। তাহার মধ্যেও সেই মহাপুরুষ বিরাজমান রহিয়াছেন। তোমার আমার মনের মত না হইলে কি হইল? একটু ভাবিয়া দেখ দেখি, উহার রক্ত মাংসের মধ্যে

উহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কে থাকিয়া কল চালনা করিতেছে। আমার নিজের শরীর বা মনের বিষয়ে অন্যে কী বুঝিবে, আমি নিজেই ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই বুঝিতে পারি না। শরীরতত্ত্ববিদ বিদ্যাভিমানী সুপণ্ডিত ডাক্তার হৃৎপিণ্ড ও শরীরের নানা অংশকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ব্যবচ্ছেদ করিয়াও সে মহাশক্তির অবস্থিতি-স্থান নির্দেশ করিতে অক্ষম। ডাক্তার আইনষ্টাইন বলিয়াছেন 'Man is quriously made', মানুষের সৃষ্টি-কৌশল কৌতূহলজনক।

আমিও সেই মানুষ। আমি তৃণের ন্যায় ক্ষুদ্র হইলেও সেই মহান পিতার হাতে গড়া জিনিস। তিনি সৃজন অবধি কখন কাছছাড়া হয়েন নাই। আমাকে জগতের আর সকলের ন্যায় সমান উপকরণে বিভূষিত করিয়া সংসারক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমি সেই সকল ঈশ্বর প্রদত্ত মহাদানের যথাযথ সদ্ব্যবহার না করিয়া এই দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছি বৈ ত নয়? একজন মহাকবি বলিয়াছেন 'মানবমণ্ডলী জগতে প্রসূন স্বরূপ, বাহ্যবস্তুর সাহায্যের উপর উহার উন্নতি ও জীবন নির্ভর করে। যখন একটি গোলাপের কলম উৎকৃষ্ট জমিতে উত্তম বায়ু জল আলো পাইবার সুব্যবস্থা পায় তখন তাহার শ্রীবৃদ্ধি ও কুসুম মনোমুগ্ধকর হইয়া থাকে। আর যদি প্রকৃতির সাহায্যে বঞ্চিত হয় তখন তাহার শ্রীবৃদ্ধি ও সুকুসুম কিছুই দেখা যায় না।

কত ভাল ভাল প্রসূন ফুটিয়া সংসারকানন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আর শোভ বর্ধন করিতেছেন না, আমরা তাহা দেখিয়াছি ও দেখিতেছি। তাঁহাদের কোন পদচিহ্ন দেখিতে পাই নাই ও পাইতেছি না। সে কাহার দোষ? দোষ আমাদের। যে সুদূর সুন্দরবনে বৃক্ষরাজি প্রকৃতির কোলে বাহ্যবস্তুর আহার্য সুন্দর ফল প্রসব করিতেছে, তাহা সবই প্রকৃতির নিয়মে চলিতেছে। আমাদের সাহায্য সেখানে প্রয়োজন হয় না। সেখানে বিনা জলসেচনে কাননে সুদৃশ্য তরুরাজি গগনে শীর্ষ উত্তোলন করিয়া ক্রমবর্ধিত হইতেছে। আর যেখানে মানুষের করাল কুঠার সেই প্রাকৃতিক কাননে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানেই বাধা পড়িতেছে।—অতএব দেখিলেই ইহার প্রতিকার আবশ্যক। নতুবা এই জগত সৌর জগতের ন্যায় শোভা বর্ধন করিয়া চলিবার কথা।

আমরা আপন দোষে পথভ্রষ্ট হইয়াছি, তাই পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা প্রকৃতির কোলভ্রষ্ট হইয়া কুপথে চলিতেছি। আমাদের

সুনিয়ন্ত্রিত কাজের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছি, তাই আমরা ভাল প্রসূন প্রসব করিতে পারিতেছি না। এই আমাদের অবস্থা ও বহিচিত্র। আমরা লোকসমাজে সংহতি রাখিতে পারিতেছি না।

বাল্যকালে একদিন ফ্রী-চার্চ কলেজে পাঠ্যাবস্থায় খ্রীষ্টীয়ান মিশনারী রেভারেণ্ড রায়ডি বসুর বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। তিনি নাকি কুমারী চন্দ্রমুখী বসুর পিতা। ইনি সেকালে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত হইয়া তত্রস্থ একটি শিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষার গল্প করিয়াছিলেন। বক্তা ইহজগতে নাই। কিন্তু তাঁহার কথা আমার পাষাণ হৃদয়ে ক্ষোদিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, আমেরিকার সেই আদর্শ শিশু বিদ্যালয়ের শিশুগণ তাহাদের সাপ্তাহিক জীবনের ভাল-মন্দ সমস্ত কাজ লিখিয়া শিক্ষকের নিকট উপস্থিত করে। আমরা যেরূপ এদেশে বাল্যকালে স্কুলে রচনা লিখিয়া তাহার ভাষা ও ব্যাকরণ-দোষ শিক্ষকের দ্বারা দৈনিক বা সপ্তাহান্তে সংশোধন করাইয়া লই, তাহারা সেইরূপ তাহাদের জীবনের সাত দিনের দায়িত্বপূর্ণ জীবনী লইয়া শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হয়। শিক্ষকগণ কোন দূষিত ব্যবহার দেখিতে পাইলে তাহার তীব্র সমালোচনা না করিয়া যাহাতে এই দোষের মূলোৎপাটন হয় তাহার ব্যবস্থা করেন, শুধু মুখেমুখে বাগাড়ম্বর করিয়া দায়িত্ব শেষ করেন না। শিশুদের মধ্যে অন্য কেহই তজ্জন্য নিন্দা বা তীব্র সমালোচনা করিতে সমর্থ ও সাহসী হয় না। শিশুদের মধ্যে অনেকে আবার নিজের দোষগুলি নিজে লিখিতে গিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলে। শিক্ষক বা অন্য কেহ তজ্জন্য ঘৃণা বা তিরস্কার করেন না। শিশুরাও কোন ঘটনা তজ্জন্য গোপন করে না। গোপন করিলেও তাহা থাকে না। তাহা অনুসন্ধান লওয়ার ব্যবস্থা আছে। ইহাকেই বলে শিক্ষা। হায় রে, এদেশের মুখস্থ শিক্ষা স্বতন্ত্র।

এদেশে ডাক্তার যেমন রোগীর রোগ নিরাময়ের ঔষধ দেন, কিন্তু ঐ রোগের কারণ এবং যাহাতে ঐ রোগ আর না হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করেন না, আমাদের দেশের ধর্ম-শিক্ষক গুরুদেবগণও সেইরূপ ধর্মোপদেশ দিয়া যান, শিষ্য তাহা গ্রহণ করিয়া মানুষ হইল কিনা ও জীবনে প্রতিফলিত করিবার সাধ্য আছে কিনা তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। ধর্ম উপদেশকগণ শাস্ত্রের বড় বড় উপদেশ দেন, কিন্তু আমরা নিম্নতম স্তরে পাপ-

কূপের মধ্যে দণ্ডায়মান—উপরের স্তরের কথা জীবনে উদযাপন করিবার সাধ্য নাই। উপরে উঠিবার সিঁড়িও নাই, তাহা উপদেশকগণ ভাবেন না। তাঁহারা শিষ্যের সেই নিম্নস্তরে আসিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া, অর্থাৎ কুরোগাক্রান্ত রোগীকে সুপথ্য দিয়া ক্রমে সবল হইয়া উঠিতেও চেষ্টা করেন না। শিষ্য নিম্নস্তরে থাকিয়া সুদূর উচ্চস্তরের বড় বড় কথা মুখস্থ করে বটে, কিন্তু জীবনে প্রতিফলিত করিয়া পুষ্ট ও নিরোগ হইতে পারে না। আমি অন্যের সমালোচনা করিতে গিয়া ও বড় কথা লইয়া অভ্যাস-দোষে রচনা লিখিতে বসিলাম। আসল প্রসঙ্গ ভুলিয়া গেলাম।

জীবনের বিগত অংশের চিত্রপট জনসমাজে প্রকাশ করা সহজ নহে, তাই আমার দীর্ঘ জীবনের সকল কথা বলিতে না হউক ঘটনা ও লোকদের কথা যতদূর সম্ভব লিখিয়া জীবনের একটি রেকর্ড রাখিতে চাই।

১৮৫৯ সালে নভেম্বর, বাংলা ১২৬৫ সাল অগ্রহায়ণ মাসে রেবতী নক্ষত্রে মীন রাশিতে জেলা নদীয়া পুলিশ স্টেশন কুমারখালির অধীন সেনগ্রামে আমার জন্ম হয়। এখন সে তীর্থ জেলা ফরিদপুর পাংশা থানার অধীন হইয়াছে। আমার জন্মকুষ্ঠী বা ঠিকুজী নাই। যাহাদের ঘরে আমার জন্ম ঠিকুজী ছিল তাহাদের বংশের কেহ জীবিত নাই, ঠিকুজীও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে। ঠিকুজী দিয়া কি হইবে? কুমারখালির পরলোকগত মোহিনীমোহন বিশ্বাস যেদিন মরিয়াছেন তাহা তাহার কুষ্ঠীতে লেখা ছিল। কবে মরিব তাহা জ্যোতির্বিদগণ গণনা করিয়া বলিতে পারেন। মরণ তো অবশ্যম্ভাবী তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে। হাবাসপুরের দীনু সর্দার ৯৫ বৎসর বয়স স্বাস্থ্য পালন করিয়া ১২০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করায় নিজের আয়ুটা একটু বাড়াইব মনে করিয়াছিলাম—দেখিলাম সেটা ভ্রম। আমার বয়সী কতজন ঐরূপ বয়স হিসাব করিয়া চলিয়া গিয়াছে, জীবনের কথা কিছু লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

আমি চিরকাল টোপাপানার মত ভাসিয়াই চলিলাম, ভিতরে ডুবিয়া দেখিলাম না। শিশুকালে খেলা ছাড়া ভাবিবার বিষয় ছিল না। বাল্য কালে লেখাপড়া, শিক্ষকের ও পিতামাতার তাড়না ব্যতীত আর কিছুই ভাবি নাই। যৌবনে অর্থোপার্জন ও ইন্দ্রিয়সেবা ছাড়া আর কিছু ভাবিবার অবসর ছিল না। সংসারে গুরুজনের উপদেশ ও চিৎগুরুর নিত্য উপদেশ

মানিয়া চলিলে নিজের কিছুই থাকে না। সংসারে ভোগবিলাসের বাধা বিঘ্ন হয় বলিয়া তাহা প্রয়োজন মনে করি নাই। মনে মনে করিয়াছি, ওসব শুনিবার সময় নাই। এখন প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া শেষকালে নিশ্চিন্ত হইয়া ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করিব। এই শেষকালের সীমা কোথায়? আমার বয়েস যখন পঞ্চাশ বৎসর তখন সমবয়স্ক বন্ধু-বান্ধবের পরলোকগমন দেখিয়া মনে করিলাম আমার শেষকাল হয়ত ষাট বৎসর পর্যন্ত। যখন ষাট অতিক্রম করিলাম তখন মনে করিলাম, মা ৭০ বৎসরে বাবা ৮২ বৎসরে মারা গিয়াছেন, তাহা ধরিলে আরও ১০-১৫ বৎসর আমার বাঁচিবার কথা। গ্রামের আনন্দ কবিরাজ ১১০ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন দেখিয়া আমার আয়ুর সীমানা খুব বাড়াইয়া রাখিয়াছি। তবে গত ১১ই বৈশাখে শেষকালের অবস্থায় পড়িতেছিলাম। যুগপৎ হাঁপানী ও বাতের পীড়া একসঙ্গে আক্রমণ করায় আমি এক বৎসর কাল ভুগিলাম। তাহার পর নিউমনিয়া জ্বরে কয়েকদিন আক্রান্ত হইয়া শেষকালের সীমান্ত স্থলে উপনীত হইয়া, কোনো রূপে রক্ষা পাইয়া, সেখানেই দাঁড়াইয়া কিছু grace extention লইয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছি। মৃত্যু তো নুতন কথা নহে। আমরা তো প্রতি পলেপলে মৃত্যুর পথে চলিতেছি। অধিক কি, যখন নিশ্চিন্ত থাকি তখনও কালচক্র আমাকে মৃত্যুর দিকে বহন করিতে ক্ষান্ত হয় না। আপত্তি করিলেও চলিবে না। আমার মত অনেকেই মরিবার কাল আপনার সুবিধামত বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া শেষপর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় সংসারের প্রিয়জন ও আত্মীয় বন্ধুর নিকট প্রাণ খুলিয়া কথাও বলিতে পারে নাই।

তাই আমি আর বৃথা কালবিলম্ব না করিয়া কথা বলিবার ভাবিবার চিন্তা করিবার ও মনের কথা লিখিয়া ব্যক্ত করিবার সুযোগ সুবিধা ও শক্তি থাকিতে থাকিতে 'মনের কথা' শেষ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি এবং ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া লেখনী ধারণ করিলাম।

হে পরমারাধ্য পিতৃদেব, হে স্নেহময়ী জননি, সর্বাগ্রে তোমাদের কথা মনে পড়িতেছে। তোমরা আমার জন্মাবধি প্রাণাপেক্ষাও বেশী ভাল বাসিতে। আমাকে লালন পালন ও মানুষ করিয়া দিয়া আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছ। তোমাদের সেই স্নেহ মমতা দেখিয়া কখনও ভাবি নাই,

তোমরা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। তোমরা কি তোমাদের প্রাণের প্রাণ এই হতভাগ্যকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া গিয়াছ? ইহাতে তোমাদের কোন ক্ষতি হয় নাই? ভগবানের ইচ্ছা ও আদেশে আমাকে লালন পালন করিয়াছিলে, আবার তাঁহারই ইচ্ছায় ছাড়িয়া গিয়াছ। কিন্তু এখন তোমরা কোথায়? তোমরা ভুলিয়াছ, আমি তো ভুলি নাই। তোমাদের মধুমাখা মুখগুলি চিত্তপটে অঙ্কিত আছে। ফটোগ্রাফার যেরূপ অঙ্কনে সমর্থ, চিত্রকর সেরূপ চিত্রাঙ্কনে সমর্থ নহে। মা, তোমার ফটো এনলার্জ করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। বাবা, তোমার ফটো তোমারই প্রিয় দৌহিত্র সুখদার বড় ছেলে অনুকুল শিশুকালে নষ্ট করিয়াছিল, তাই তোমার সেই প্রেমময় চেহারা আর ইহজগতে মিলিতেছে না। তবে ফটো ও ছবি দেখিয়া মন তৃপ্ত হয় না।

আমি চাই জ্বলন্ত জীবন্ত ভালবাসার ছবি। তোমরা যদি আবার মানবদেহ ধারণ করিয়া থাক, বেশ, একবার স্বপ্নেও তো দেখা দিয়া কোথায় আছ বলিয়া দিতে পার। আমি সেখানে গিয়া প্রাণ ভরিয়া তোমাদিগকে দেখিয়া মনের সকল ক্ষোভ দুঃখ নিবারণ করিতে পারি, তোমাদেরই কাছে গিয়া পড়িয়া থাকিতে পারি। মানুষ মরিলে কি হয় এ প্রশ্নের উত্তর এ পর্যন্ত পাইলাম না। হিন্দুশাস্ত্র মতে পুনর্জন্ম হয়। সাধু রামপ্রসাদ এক সঙ্গীতে বলিয়াছেন—

'বল দেখি ভাই কি হয় মোলে,
এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেহ বলে আলোক্য পাবি
কেহ বলে সাযুজ্য মেলে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিলায় জলে।'

কোনই মীমাংসা হইল না।

কেহ কেহ বলেন, মরণান্তে দশ দিন জীবন-আত্মা সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া নিকটেই থাকেন। তাই মানুষটি যতটুকু লম্বা তত দীর্ঘ একটি বংশদণ্ড খাড়া করিয়া তাহার শীর্ষভাগে একটি মেটে খুরি রাখিয়া ওই মৃৎপাত্রে ঘৃতসহ দুধ কলা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত রাখিয়া দেয়। প্রেতাত্মা কাক কোকিল হইয়া উহার আস্বাদন করেন। ইহাকেই বলে 'কাক বলি'।

যদি কোনদিন কাক উহা স্পর্শ না করে তবে শ্রাদ্ধকর্তা অনুমান করে, ‘কাক বলি’তে নিশ্চয়ই কোন দোষ হইয়াছে।

ওই প্রেতাত্মা সংসারী হইয়া পূর্ব অতৃপ্ত বাসনা তৃপ্তি সাধনের জন্য পুনঃ তদুপযোগী জড়দেহে প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার পৌরাণিক শাস্ত্রীয় বাক্য গীতার বয়ানে আছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা,
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে।

এ তো গেল দর্শনের কথা। প্রমাণ কোথায়?

যদি মৃত্যুর পর জীবাত্মা অন্য দেহ ধারণ করে তবে আদ্যশ্রাদ্ধ, বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ও বহু দিনের পরের শ্রাদ্ধেও নিম্নের শ্রাদ্ধের এই বচনটির তাৎপর্য কি?

আকাশস্থ নিরালম্ব আয়ুর্ভূত নিরাশ্রয়
ইদং নিরং ইদং ক্ষীরং স্নাত্বয়া পীত্বয়া সুখী ভব॥

শ্রাদ্ধের সময় শ্রাদ্ধাধিকারীকে বলা হয়, তোমার এই পরলোকগত আত্মীয়দের আত্মা আকাশস্থ পূর্বপুরুষের আত্মার সহিত সংযুক্ত ও মিলিত হইতে চলিলেন। এবং তোমার স্বর্গগত পূর্বপুরুষ যাঁহার উদ্দেশ্যে এই পিণ্ড দান করিতেছ তিনি সূর্যসাক্ষী হইয়া ইহা গ্রহণ করিলেন।

আধুনিক গ্রন্থকারদের মধ্যে কাহার কাহারও মতে মৃত্যুর পর অনেকের প্রেতাত্মা বায়বীয় শরীরে অনেক কাল বিচরণ করিতে থাকেন ও কখন কখন মানবীয় শরীর গ্রহণ করিয়া লোকালয়ে উপস্থিত হন ও কথাবার্তা কহেন। পূর্ব প্রেতাত্মাগণ ভূত নামে অভিহিত ও তাঁহারা অনেকেই অত্যাচার করিয়া থাকেন।

আমরাও পূর্বকালে সেনগ্রামের অনেককে বিশেষতঃ যুবতী স্ত্রীলোক-দিগকে ভূতে ধরিতে দেখিয়াছি। গ্রামে নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ রামকুমার ঠাকুর একজন প্রসিদ্ধ ভূতের ওঝা ছিলেন। মাঞ্জদিয়ার যাদব জেলেও একজন একালের ওঝা। ইহারা হলুদ পোড়াইয়া কোন ভূতে-ধরা রোগীর

নাকের কাছে ধরামাত্র রোগী বিকট চিৎকার করিয়া ওঠে, ওঝার মন্ত্রের চোটে ভূত পলাইয়া রক্ষা পায়। ওঝা কখনও বাড়িতে গিয়া বলে, এই ভূতকে বাঁধিয়া লইয়া গেলাম। ওঝাগণ ভূতকে বলে, তুই আমার রোগীকে ছাড়িয়া যা। একটি জলভরা কলসী রোগীর দাঁতে লাগাইয়া দিয়া ওঝা বলে, আর আসবি না। রোগী জলভরা ভারী কলসী দাঁতে তুলিয়া মাটিতে দাঁত লাগিয়া পড়িয়া যায়, ও পরে ভাল হইয়া যায়।

ইহা ছাড়া 'কুলপড়া' একরকম ব্যাপার আছে। আমার পিসতুতো ভাই কালিদাদা বহুদিন শূল দশায় ছিলেন। কিছুতেই ভাল হইল না। তাইতে পিসিমা আমাদের বাড়িতে কুল পাতাইলেন। ইহাকে ব্রহ্মদৈত্য আনাও বলে। রাত্রির অন্ধকারে ওঝা ভূতকে মন্ত্র পড়িয়া ডাকিবামাত্র ঘরের চাল নাড়া দিয়া ঘরে প্রবেশ করে ও নিজের পরিচয় দিয়া বলে, আমি পূর্বজন্মে একজন ওমুক ব্রাহ্মণের বাপ ছিলাম, অপমৃত্যুতে এই ভূত হইয়াছি। ওঝা বলে, কালী কালী বল। সকলে তখন কালী কালী বলিতে থাকে। হরি হরি, রাম রাম, বলা নিষেধ। তাহাতে ব্রহ্মদৈত্য বা ভূত আসে না বরং রাগিয়া চলিয়া যায়। ভূত রোগীর পীড়া ভাল হইল বলিয়া দেয় ও কখনও ওষুধ স্বরূপ ধুলা বা প্রস্তর (?) দিয়া যায়। কুল পাতিলে ২।০ টাকা খরচ পড়ে। ওই কুল পাতিলেও কালিদাদার পীড়া ভাল হয় নাই। তখন আমার বয়স দশ বারো বৎসরের অধিক নহে।

সেনগ্রামের পশ্চিম সীমান্তে কর্ঠগড়রায় এক কুণ্ডুর বাড়িতে ভূতে ঘরে গু ফেলিয়া দিত ও নানারূপ অত্যাচার করিত শুনা যাইত। এখন ভূতের কথাও বেশী শুনি না, দেখিতেও পাই না। তবে ভূতের ব্যাপার অনেক আছে। শ্রীযুত ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত 'পরলোক ও প্রেততত্ত্ব' বইখানিতে ভূতের গল্প অনেক আছে।

ডেপুটি বঙ্কিমবাবু (ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) নাকি ১৮৬০ সালে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নাগড়া মহকুমায় কার্য উপলক্ষে এক জমিদারের বাগান বাটিতে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি ভূত, রমণী আকারে তাঁহাকে দেখা দিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

দুই বৎসর হইল আমার ভক্তিভাজনীয়া শ্রীযুক্তা সরোজিনী ঠাকুরানী আমার নবদ্বীপের দোতলা গৃহে ভাড়াটিয়া হইয়া বাস করিবার সময় পশ্চিম পার্শ্বে এক ধোপাবাড়ির অপমৃতা রমণীকে মৃত্যুর পর প্রেতাত্মাবস্থায় তাঁহার

সমীপবর্তিনী হইয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিয়াছেন, তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। তাঁহার কথা অবিশ্বাস করা সুকঠিন বটে। গয়ায় পিণ্ড দিলে হিন্দুভূত মুক্ত হয় শুনিয়াছি। এইজন্য গযায় অনেকেই পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, ধান ভানিতে শিবের গীত অভিনয় করিয়া বসিলাম।

বাবা ও মা, তোমরা আমাকে দেখা দিয়া বাঁচাও। তোমরা যদি চন্দ্রালোকে অথবা অন্য কোন স্বর্গীয় গ্রহে যাইয়া থাক, সেও ভাল, সেখান হইতে স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়া তোমাদের ও আমাদের তত্ত্বাবধান লওয়া দেওয়া করিতে পার। আর যদি স্বাধীনভাবে নিরাবয়বে বিমান অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে পার, তবে তো কথাই নাই। যখন ইচ্ছা যেখানে সেখানে আমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পার। যেভাবেই যেখানে থাকি না কেন, স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়া যাওয়ার কোন বাধাই দেখি না।

মা, মধ্যে মধ্যে তোমাকে স্বপ্নে দেখিতে পাই। প্রায় তিন বৎসর হইল শেষ রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলাম, নিজ গ্রামে কালী-বটতলায় আমি দাঁড়াইয়া আছি, তুমি উহার কিয়ৎদুর দক্ষিণে ফকিরের দোকানের বটতলার নিকটে দাঁড়াইয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছ। আমি সাড়া দিতেছি, তাহা দুর হইতে তোমার কর্ণগোচর হইতেছে না। সেজন্য তুমি উত্তরোত্তর ডাকিতে ডাকিতে আমার কাছে আসিলে ও আমাকে বলিয়া গেলে, তুমি চক্ষু বুজিয়া ভগবানকে ডাকিও, আমার কাছে আসিতে পারিবে। তখন স্বপ্নে তোমার যে চেহারা দেখিয়াছিলাম তাহা এখনও বেশ মনে আছে। মা, তোমার সেই পৃষ্ঠদেশে দোলায়মান শুভ্র কেশ, ললাটে সিঁদুরফোঁটার যে অতুলনীয় শোভা হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। যাহা হউক, আমার মেয়ে সরলা ও আমার জামাতা শ্রীমন্মথকে স্বপ্নের কথা বলিলাম।

মা তখনকার হিসাবে প্রায় ১৮ বৎসর আমার মেয়ে হইয়া আসিয়াছেন। পুনর্জন্ম হইয়া ১৮ বৎসর বয়স্কা হইয়া কাটাইবার পর, তাহার পুত্র-জননী হইবার সময়। তাই সে আমাকে বলিয়াছে দশমাস মধ্যে আমাকে চলিয়া যাইতে হইবে। এ কথা শুনিয়া সকলেই ভীত হইল। আমিও কম ভীত হইলাম না। মা ছাড়াও এ সংসারে এখন ঢের মায়াজাল পাতিয়া বসিয়া আছি। সংসার ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা নাই। আবার মাকেও চাই, না মরিয়া সংসারেও থাকিতে চাই। ইহা অসঙ্গত ও অসম্ভব। যাহা হউক,

প্রায় তিন বৎসর কাটিয়া গেল। স্বপ্ন অমূলক। চিত্তের চিন্তা বিকার মাত্র। এই মনকে বুঝাইয়া আশ্বস্ত হইলাম।

বাবা, তোমার কথা সংক্ষেপে কিছু বলি। শৈশব হইতে আমি স্কুলে ও পরে কলেজে পড়ি। প্রথমতঃ তুমি ১৩৫নং হাটখোলা গয়ারাম সাহার আড়তে, সেনগ্রামের ঘোষবাবুদের আড়তে মহাজনী কাজে লিপ্ত ছিলে। পরে কুমারখালি হাটখোলা মহাজনীতে ব্রোকারের কাজ করিয়াছ। স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্বাহ করিতে ও আমার পঠন ব্যয় করিতে। তুমি অতি সাদাসিধা ও সরল প্রকৃতির ভালমানুষ ছিলে। কখনও কাহারও সহিত অন্যায় বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হও নাই, অথবা মামলা মকর্দমা কর নাই। আমার ওকালতি আমলে প্রায় ২৪ বৎসরাবধি আমি তোমাকে সেনগ্রাম বাটিতে নিশ্চিন্তভাবে রাখিয়া যথাসাধ্য সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছি।

বাবা, তুমি সেকালে কলিকাতা হইতে আসিবার সময় কুষ্টিয়ার ডাকদাই মোহনা স্টেশনে ট্রেনে নামিয়া তথা হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ দূর পায়ে হাঁটিয়া সেনগ্রামে বাটিতে আসিতে। তখন খোকসা স্টেশন হয় নাই।

একবার ওইরূপে বাটিতে আসিতে গিয়া গৌরী নদীর অপর পারে কয়াগ্রামে আসিতেই সন্ধ্যা হয়। কাজেই আতিথ্য গ্রহণ নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছিল। পঞ্চুঘোষ গিয়া কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া আশ্রয় না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। নীলাম্বর রাহা বলিলেন, এ কাজ তোমাদের নহে। নীলাম্বর রাহা গ্রামে গিয়া একটু অবস্থাপন্ন এক পালের বাটির লোকের নাম ও মোটামুটি বিবরণগুলি অপরের নিকট সংগ্রহ করিয়া শেষে তাহার বাটিতে গৃহকর্তার মৃত বাপের নাম ধরিয়া দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। গৃহকর্তা হাজির হইয়া বলিলেন, বাবা অনেকদিন মারা গিয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র নীলাম্বর কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, একথা জানাও নাই কেন? আমি তোমাদের নিকট আত্মীয়, দাদার জ্ঞাতি, তাহা কি তুমি জানিতে না? দাদা থাকিতে কত যাতায়াত ছিল, এখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সব সম্বন্ধ উঠিয়া গেল। এই বলিয়া তিলার্ধ বিলম্ব না করিয়া 'ভাইপো' পাল মহাশয়কে বলিলেন, বাবাজী, গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক সঙ্গে আছেন, তাহাদিগকে ডাকিয়া আনি। এই বলিয়া, তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া নিজেই উদ্যোগ করিয়া বসিতে দিলেন ও ভাইপোর সহিত কানে কানে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, দেশে

গিয়া দাদার নামে যাতে বদনাম না করে সেইমত ভাল করিয়া খাওয়াইতে হইবে। রাত্রিকালে নিজের গুরুদশার বৎসর বলিয়া ভাইপোর ঘরে জাতির ভয়ে না খাইয়া নিজে রান্না করিয়া খাইলেন। অপর কয়জনের রান্না তাঁহারা আলাদা করিয়া লইলেন। সে রান্নার ভার বাবার উপর পড়িয়াছিল। পরে সকালে সকলে মিলিয়া বাটি রওনা হইলেন। এ গল্পটি বাবার মুখে শুনিয়াছি।

বাবার আমলে কাকা বাটিতে চাকর রাখিয়া চাষ আবাদ করাইতেন। বাবা বিদেশে থাকিয়া টাকাকড়ি পাঠাইতেন; যথেষ্ট সংখ্যক টাকা হাতে হইলে একখান পাঁচহাত প্রশস্থ নৌকা খরিদ করেন ও ২০০ টাকা মূলধন দিয়া রাসিদপুরের দুর্গাচরণ বিশ্বাসকে ধানের ব্যবসা করিতে দেন। দুর্গাচরণ মূলধনের টাকা আত্মসাৎ করিয়া লোকসান হইয়াছে বলিয়া সরিয়া পড়েন। বাবা বাটি আসিয়া এই সংবাদ শুনিবামাত্র ভাবিয়া ব্যাকুল হইলেন। ঠাকুরমা শ্রীমতীরা ও কাকার সহিত ইহা লইয়া ঝগড়া হইল। ইহাতে বাবাকে অনেক কথা সহ্য করিতে হইরাছিল। সেকালে ২০০ টাকা আজকালকার ২০০০ টাকার সমান।

আমার কাকার ও কাকিমার গুণের কথা বলিয়া ও লিখিয়া শেষ করা যায় না। আজীবন আমাদের জন্য করিয়াছেন। কাকিমার বিয়োগের পর তিনি আরও অনেকদিন বাঁচিয়াছিলেন। সেকালে ঘোষবাবুদের বাটিতে দুর্গোৎসবে গ্রামের সকলেরই নিমন্ত্রণ হইত। আমি কসকরা সিমলাই ধুতি পরিয়া চাদর গলায় বাঁধিয়া কাকার কাঁধে চড়িয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতাম; কাকা আমা অপেক্ষা আমার বড় দিদিকেই বেশী ভালবাসিতেন। ঝগড়ার সময় যখন বাবার সহিত পৃথক হইতে চাহিতেন, তখন দিদিকে তাহার ভাগে লইতে চাহিতেন। তাঁহাদের ভায়েদের সেরূপ স্থায়ী বিবাদ কখনও হয় নাই। পরস্পরের মধ্যে খুব ভালবাসা আজীবনকাল ছিল। কাকা ইলিশ মাছ আনিতেছে আশা করিয়া তাঁহার হাট করিয়া আসিবার প্রতীক্ষায় আমরা বসিয়া থাকিতাম। কাকা আমার দিদির জন্য হাট হইতে কুশর (আখ) আনিতেন। হাট হইতে মাছ কিছু কিছু নিশ্চয়ই আনিতেন।

ঠাকুরমা দিদিকে খুব ভালবাসিতেন, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া জোলাপাড়া বেড়াইতে যাইতেন। ঠাকুরমার হাতে একখান লাঠি থাকিত। তিনি তাহা ভর দিয়া চলিতেন, দিদি পাছে পাছে যাইতেন। আমি

যাইতে চাহিলে আমার পৃষ্ঠে সেই লাঠির মৃদু আঘাত পড়িত। আর যদি জোর করিয়া মানা না শুনিয়া যাইতাম তবে আমি পৃষ্ঠে বেশী লাঠিপেটা খাইতাম। ঠাকুরমা বাটিতে চরকা কাটিতেন, সেই চরকা-কাটা সুতা দিয়া কাপড় বুনাইয়া লইতেন। আমাদের বাটিতে বুড়িরা সকলেই চরকা কাটিত। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান, সকল বাড়িতেই চরকার চলন ছিল। ঠাকুরমা একটু ঝগড়াটিয়া লোক ছিল। তাঁহাকে বাটির ছেলেবুড়া সকলেই ভয় করিত। কেহ ভয়ে তাঁহার সহিত কথা বলিতে সাহস করিত না।

চরকা কাটা আমি আদ্যোপান্ত বসিয়া দেখিতাম। সুতাওয়ালা তুলা মাথায় করিয়া আমাদের বাড়িতে আসিয়া সুতা লইয়া যাইত ও কয়েক গুণ ওজনে তুলা দিত। আমার পিসি ও ঠাকুরমা, ওই তুলা হাতে পিঁজিয়া ধোনাই যন্ত্র ধুনিতেন। সে ধোনাই যন্ত্রটির কিছু বর্ণনা আবশ্যক। এখন তাহার নমুনা দেখাইবার উপায় নাই। একটি বাঁশের উপর-প্রান্তে দুইটি একটু বাঁকা কাঠি বাঁধিয়া কাঠির প্রান্তে সুতার তার বাঁধিয়া ওই তার তুলার মধ্যে বাধাইয়া হাত দিয়া তার দ্বারা তুলা ধুনিয়া দরকার মত সাদা ও পাতলা করিয়া, ফুঁ দিলে উড়িয়া যায় এরূপ করিতে হয়। তাহা হইতে আঙুলের মত সরু লম্বা ও গোল পেঁজ তৈয়ারী করিতে হয়। ওই পেঁজ চরকায় কাটিয়া সুতা করিতে হয়। যাহা চক্ষে দেখিয়াছি তাহাতে কেমন করিয়া পেঁজ তৈয়ারী করিতে হয় ও সুতা কাটিতে হয় জানি। চরকা পাইলে সুতা কাটিয়া দেখাইতে পারি। সেদিন আর নাই, সেসকল গুরুজনকে ও তাঁহাদের চরকাকাটা আর আমি দেখিব না। সেই স্মৃতি মনে করিয়া সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

মাকে অনেক সময় কাঁদিতে দেখিতাম। আমার বড় দীনদাদা ও আমার ছোট রামকৃষ্ণ ও ছোট ভগিনী কামিনীকে ও জামাতা উমাচরণ বিশ্বাসকে হারাইয়া মা প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলেন ও অবসর পাইলেই কাঁদিতেন। তখন আঁচলার কাপড় মুখে চাপা দিয়া কাঁদিবার প্রথা ছিল। মাকে কাঁদিতে দেখিলে কাছে আসিয়া আমিও কাঁদিয়া ফেলিতাম।

আমার পেট ফুলিলে মা পাথরচুনের সহিত পাথরকুচির পাতার রস খাওয়াইতেন। পেটে ক্রিমি হইলে আনারসের পাতার রস খাওয়াইতেন। পিলা ভাল হওয়ার জন্য কালকেসে পাতা খাওয়াইতেন। একদিন গ্রামের

ওমর শেখের কথামত একটা মধ্যমাকার কাঁঠালের সবগুলি কোয়া আমাকে খাওয়াইয়াছিলেন। শেষে পেট ফুলিয়া মরি। মা কত ভাবিতে লাগিলেন। বহু কষ্টে রক্ষা পাইয়াছিলাম।

সেকালে আমার লেখাপড়ার জন্য মা বড়ই যত্ন করিতেন। আমি নানা আপত্তি করিয়া পাঠশালা কামাই দিবার চেষ্টা করিতাম। যদি বলিতাম দ'তে (দোয়াতে) কালি নাই আজ যাওয়া হইবে না, মা তখনই ভাতের হাঁড়ির পিছনের কালি চাঁচিয়া লইয়া তাহাতে লাউপাতার রস মিশাইয়া কালি করিয়া দিয়া পাঠশালায় পাঠাইয়া দিতেন। আমি বড় হইলেও মা আমার জন্য কত ভাবিতেন। আমার বেশী বয়সে আমি বাটি হইতে খোকসা স্টেশন আড়াই ক্রোশ হাঁটিয়া স্টেশনে আসিয়া গাড়ি ধরিতে খুব মজবুত ছিলাম।

তখন পাল্কি বেহারার খোরাকী ও জনের দেড় টাকা দিলেই পাল্কিতে যাওয়া হইত। অনেক সময় সরকারী কাজে যাতায়াত করিলে আমাকে খরচ দিতে হইত না। কিন্তু হাঁটিতে পারিলেও পাল্কি করিয়া বড়মানুষী না দেখাইলে পসার জমিত না। কাজেই পাল্কি চড়িতাম। শেষকালে পাল্কি চড়া খুব জুটিত। একদিন পাল্কি না পাওয়ায় হাঁটিয়া যাইবার পথে এছাখ শেখের বাটির নিকট একজন আমাকে হাঁটিয়া যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি অবাক হইলাম। হাঁটিয়া যাওয়া যেন ঘোরতর দুঃখ ও মুর্খতার কারণ। একদিন পাল্কির অভাবে একজনের ঘোড়া চাহিয়া লইয়া স্টেশনে যাই। মা ওই ঘোড়াকে বারবার বলিতে লাগিলেন, বাবা, রাইচরণকে ফেলিয়া দিয়া কষ্ট দিও না।

মা আমার ওকালতি পরীক্ষার বৎসরে কলিকাতায় গিয়া রাঁধিয়া খাওয়াইয়া পড়িবার অবসর করিয়া দিয়াছিলেন। তাই পাশ হইয়াছিলাম। মা একদিন কালিঘাটে গিয়াছিলেন, আমি তাঁহার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি আসিয়া খাইয়া বলিলেন, রাঁধা অতি উত্তম হইয়াছে। তিনি আমার ওই রাঁধার প্রশংসা করিতেন। ইহা ছাড়া তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিতাম। সেজন্য বড়ই খুশি হইতেন।

মার আজিমা বুড়ির (সেনগ্রামের শিবনাথ সরকারের মা) যখন বয়স একশ বৎসর তখন তিনি তাঁহার বাড়ি হইতে আমাদের বাড়িতে আসিয়া খাবার লইয়া যাইতেন। তাহার গায়ের চামড়া খুব কোঁচকানো ছিল।

তাঁহার দুই পা ও তাঁহার সমান উঁচু একখানা লাঠি দুই হাতে ধরিয়া, এই তিনটির উপর নির্ভর করিয়া কুঁজা হইয়া একটু একটু চলিতে পারিতেন। দাঁত ছিল কিনা মনে নাই। তাঁহার মত পুরানো মানুষ সেকালে কেহ ছিল না। একালে আনন্দ কুণ্ডুক একশ দশ বছর বয়সে মরিতে দেখিয়াছি। উক্ত বৃদ্ধার সহিত আমার কোন কথাবার্তা হইত না, ভালবাসা-বাসিও ছিল না। তাঁহার জন্য কোন দুঃখ বিলাপও হৃদয়ে আসিতেছে না। অশীতিপর এই বৃদ্ধাকে কি আর এতকাল ধরিয়া রাখিতে পারা যায়? অত বয়সের মানুষকে একালে দেখিবার আশা করা বৃথা।

আমাদের সেজ ঠাকুরমা, আমার ঠাকুরমা, মেজ বুড়ি, নওয়া বুড়ি, বুড়ি-ঠাকুরমা, তিন শরিকের তিন ঠাকুরমা বুড়ি ছিলেন। তাঁহাদের বয়স ৯০।৯৫ মধ্যে ছিল। আজকাল বঙ্গদেশে বেশী বয়সের বুড়াবুড়ি দেখা যায় না। আমাদের সৌভাগ্য যে তাহা দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার নিজ মাতা, কাকা, কাকিমার বয়স হইল। দিদি ও সুখদার কথা সতত হৃদয়ে জাগিয়া আছে। এ শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ফুরাইয়া যাইবে।

ভগিনী সুখদা, তুমি আমার ছোট। ভগ্নিপতি অমৃতলাল ও তোমার ছেলে অনুকল, ফণী, ননী, মণীন্দ্র, কন্যা নগেন্দ্রনন্দিনী ও নাতি সকলেই বাঁচিয়া আছে। তোমার জামাতা প্রিয়নাথ, তুমি থাকিতেই পরলোকগত হইয়াছেন। দিদির কাছে ছোটবেলায় সেনগ্রামে সকল ভাগিনেয় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া আমার নিকট থাকিয়া লেখাপড়া করিয়া পরে কলিকাতায় কলেজে পড়িয়াছে। অনুকূল রেলওয়েতে ষ্টেশনমাষ্টার, ফনী বি,এ, পাশ করিয়া ইস্কুলে কাজ করিতেছে। ননী রেলওয়ে অফিসে কাজ করে, মনীন্দ্র আমার বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছে।

দিদি, পুর্ব-শ্রীকোলের বিশ্বাস-বংশে তোমার বিবাহ হয়। তুমি বাল্যকালে বিধবা হওয়ায় পিত্রালয়ে আমাদের বাটিতে সতীত্বের ও পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জীবনলীলা শেষ করিয়াছ। তুমি দিদি হইয়া আমার দাদাও ছিলে ও সংসারের সকল ভার তোমার উপর ছিল। ছোটবেলায় আমাকে কোলে করিয়া যেমন মানুষ করিয়াছ, বড় হইলে তেমনি আমার দেখাশুনা করিয়াছ। তুমি একটু কৃপণ স্বভাবের ছিলে, কাহাকেও কিছু দিতে-থুতে ভালবাসিতে না।

কয়েকটি স্বপ্নের কথা

সেকাল হইতে একাল পর্যন্ত কত স্বপ্ন দেখিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কয়েকটি স্বপ্ন আমি উপর্যুপরি দেখি। তাহার তাৎপর্য কিছুই বুঝি না।

আমি কম হইলেও আটবার স্বপ্নে দেখিলাম, কলিকাতা শহরের প্রান্ত-স্থলে অর্থাৎ শহরের একটু বাহিরে আমার একটি খুব বড় তেতলা বিল্ডিং আছে। প্রায় দশকাঠা স্থান জুড়িয়া আছে। উহাতে উঠিবার বহু সিঁড়ি। প্রকোষ্ঠ সংখ্যাও কম হইলে চল্লিশ পঞ্চাশটা হইবে। বাহিরে খালি জমি প্রাচীরে ঘেরা। কিন্তু প্রত্যেক বারেই স্বপ্নে দেখি বিল্ডিংয়ের উপরটা ভাঙা। মেরামত না করিলে চলিবে না। ছাতের কার্নিশটা ভাঙা। কোথাও এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে যাইবার উপায় নাই, ভাঙা। যে কয়বার স্বপ্ন দেখিলাম, প্রত্যেকবারেই বিল্ডিংয়ের একই দশা দেখিলাম।

আমি কুষ্টিয়ায় আসিয়া ওকালতি করিবার দুই তিন বছর পর বাবু জগদীশ গুপ্ত কুষ্টিয়ায় মুন্সেফ হইয়া আসিলেন। তাহার আগে ব্রাহ্মধর্ম সংস্রবে আত্মীয় বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়ের সহিত আমার খুব ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছিল। আমি ও বিপিনবাবু উকিল ছিলাম এবং দেবীবাবুর সহিত ব্রাহ্মধর্মের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। জগদীশবাবু আমার নামীয় দেবীবাবুর পত্র দেখাইয়া পরিচিত হইলেন। পরে জগদীশবাবু ব্রাহ্মধর্মের যুগান্তর আনয়ন করেন। তিনি আসিয়া জীবন্ত ব্রাহ্মধর্মের প্রসার করিলেন। তৎকালীন সাহিত্যিকশ্রেষ্ঠ শিবনাথ শাস্ত্রী ও হেরম্ববাবুকে (মৈত্র) আনিয়া উৎসব করান। তবে মুসলমান ও ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের জলচলন, এসকল অনেকেরই সহ্য হইল না। অবশ্য আরও অনেকে তাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলেন। শ্রদ্ধাস্পদ দুর্গাচরণবাবুর যত্নে বহু অর্থসাহায্য সংগৃহীত হইল। দুর্গাচরণবাবু তাঁহার কলিকাতার দেবতুল্য ভ্রাতা কুঞ্জ ও কনিষ্ঠ পুত্রসহ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন।

জগদীশবাবুর স্ত্রী কালিতারা দেবী নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি আমাদিগকে খুব যত্ন করিতেন। যেদিন যেসময় কলিকাতায় পিতার

অ্যাবসিন পীড়ায় জগদীশবাবু গতাসু হয়েন, ঠিক সেইদিন সেইসময় আমার এক বন্ধুকে হঠাৎ বলিলাম, বোধহয় জগদীশবাবু আর নাই। আশ্চর্য, পরে জানিলাম, ঠিক সেইদিন সেইক্ষণে অপরাহ্নে তাঁহার জীবন শেষ হয়। যাহাহউক তিনি আমাদের ধর্মগুরু ছিলেন। আমরা তাঁহার উপদেশমত কাজ না করিয়া পথভ্রান্ত হইয়াছি দেখিয়া তিনি অনেক সময় স্বপ্নে দেখা দেন। ঠিক বুঝিতে পারি, আমাদের কাজকর্মের জন্ম তিনি বিরক্ত।

মাকে প্রায়ই স্বপ্নে দেখি। একদিন দেখিলাম মা রাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, কিছুতেই অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছি না। আমার মাও জানিয়া শুনিয়া দেখা দিতেছেন না, যেন পর হইয়া গিয়াছেন। জীবন্ত মাকে দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে প্রাণে বড়ই ব্যথা অনুভব করিতেছি। তবে ঘুম ভাঙিয়া রক্ষা পাইয়াছি।

বাবাকেও প্রায়ই স্বপ্নে দেখিতে পাই। একবার দেখিলাম, আমাদের সেই কলিকাতার কুমারটুলির বাড়ি হইতে বাবা হারাইয়া গিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়া হয়রান হইলাম, তবুও বাবার কোন খোঁজ পাইলাম না। আমার ধর্মমাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও বাবার খোঁজ পাওয়া গেল না। দেখিলাম আমাদের ঘরবাড়ি সেইরূপই আছে। কোন একখানে ফাঁক হইয়া যাওয়ায় ঘরখানি বেশ গোলতাই হইয়াছে। ঘুম ভাঙিবা। সঙ্গেসঙ্গে জ্ঞান হইল, বাবা তো অনেকদিন মারা গিয়াছেন।

বহুদিন পর স্বপ্নে দেখিলাম আমার কাকা আমাদের সেনগ্রামের বাড়িতে তুধে ও কাঁচামিঠা গাছের আম খাইতেছেন। আমি গাছতলায় পড়া একটি আম কুড়াইয়া দেখিলাম, তাহার কিছু কাঁচা হইলেও পাকা, নরম হইয়াছে। কাকা বলিলেন, কাঁচামিঠা তুধে গাছের আম খুব মিষ্টি। আমি বলিলাম, এই আম ও কাসন জগদীশবাবুর জন্ম পাঠাইয়া দিব। ঘুম ভাঙিয়া গেল।

আর একবার বাড়ির পুকুরের স্বপ্ন দেখিলাম। পুকুরটির পাড় ভাঙিয়া মাটিতে বুজিয়া গিয়াছে। জল সামান্য। বহু পাঁক। আর একবার পঙ্কোদ্ধার না করিলে চলিবে না।

(১৮-৫-১৯২৭)

খাইবার জিনিস

সেকাল হইতে একাল পর্যন্ত কত খাইয়া শেষ করিলাম। যদি সে সকল একস্থানে মজুত করা যাইত তাহা স্তুপাকার পরিমাণ হইত। আমি বাঙালী, ছোটবেলা হইতেই মাছ ভাত ডালি তরকারি খাইয়া আসিতেছি। মাংস খাই না। মৎস্য-মাংসও মাংস বটে, কিন্তু শিশুকাল হইতে মাছ খাইতে খাইতে এমন একটি অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে যে উহাকে প্রয়োজনীয় খাদ্য বলিয়া মনে করি। মৎস্যেরও প্রাণ আছে, সেও আমাদের হাত হইতে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে, তাহা দেখিয়াও দেখি না।

মৎস্য ধরা একটা মহা আমোদ। আমি ছোটবেলায় বড়শী দিয়া মাছ ধরিবার জন্য বোলতার চাকা অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতাম। মাছ ধরিবার জন্য বাঁশ কাটিয়া ও চাঁচিয়া ছিপ প্রস্তুত করিতাম এবং মাছ ধরিবার জন্য খাঁচা তৈয়ারী করিতাম। ঐ খাঁচা বা যন্ত্র সন্ধ্যার সময় জলে পাতিয়া রাখিতাম এবং খুব প্রত্যুষে উঠিয়া অনেক কল্পনা ও আশা লইয়া ঐ যন্ত্র উঠাইতে যাইতাম। সে সময়ে যত বড় আশা করিয়া যাইতাম মাছের আকার ও পরিমাণ তত হইত না। প্রতিদিনই আশা পূর্ণ হইত না, তবে অনেক সময় কিছুকিছু মাছ পাইতাম। এই মাছ ধরার প্রবৃত্তি বড়ই বাড়িয়াছিল এবং মা কাকা ইহার জন্য আমাকে উৎসাহ দিয়া আমার মাছের নেশা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

বড়বাবুরা মাছ ধরার কলের যন্ত্র লইয়া ও ছিপ লইয়া, চার বানাইয়া, পুকুরের পাড়ে বসিয়া সখ করিয়া মাছ ধরেন। আমি কখনও বাবু ছিলাম না, কাজেই সেরূপভাবে আমি কখনও মাছ ধরি নাই ও তাহাতে আনন্দও করি নাই। আমি চাষাড়ে ধরণে মাছ ধরিতাম। ইহার জন্য জলে জঙ্গলে অনেক কষ্ট করিয়াছি, অনেক সময় বিষধর সর্পের সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে।

লেখাপড়া এককালে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। বর্ষাকালে আমি মাছ ধরিবার ব্যাপারে উন্নতির সোপানে সমাসীন হইলাম বটে কিন্তু লালনদাদা মহিষবাথান স্কুলে অনেকটা পড়া আমার অপেক্ষা আগাইয়া গেল। আমি অনেক পাছে পড়িলাম। তাহাতে প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলাম। পদ্যপাঠ খানা লালনদাদা প্রায় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে শুনিয়া অনুতাপে ভস্মীভূত হইলাম।

আমার এক কাকা অনেক মাছ ধরার গল্প করিয়া আমার উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া দিতেন। তাঁহার লম্বা-গল্পের কথা এখনও মনে আছে। তিনি বলিলেন, বিলের ধারে মল ত্যাগ করিতে বসিয়াছেন এমন সময় দেখিলেন, কয়েকটা বড় মাছ জলের কিনারায় মারামারি করিতেছে। অমনি তিনি তাড়াতাড়ি শৌচকার্য শেষ করিয়া বেতঝাড়ের বেত লইয়া তাহাদিগকে মারিয়া বাড়িতে আনিলেন। উহা শুনিয়া ঐভাবে মাছ ধরিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু জীবনে সে সুযোগ ঘটে নাই।

বড়শীতে ধরা ট্যাংরা, জিওল মাছ বেগুন দিয়া মায়ের রাঁধা এবং লাউ দিয়া রাঁধা চিংড়ি বড়ই ভাল লাগিত। রোহিত প্রভৃতি বড়লোকের খাদ্য, বড় পাইতাম না খাইতাম না। এখন তাহার জন্য দুঃখ নাই। ইলিশ মাছ মাছের রাজা। কাকা হাট হইতে কখন কবে ইলিশ মাছ আনিবেন সারাদিন তাহার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম। মাছ আসিলে খুব খুশী হইতাম। অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া উহা না খাইয়া শুইতাম না।

এখন মাছের উপর তত ভক্তি নাই। ছাড়িতেও ইচ্ছা হয় কিন্তু ইলিশের সহিত ঘনিষ্ঠতাটা কিছুতেই ছাড়িতে পারিলাম না। আমাদের দেশে হেরম্ববাবু (হেরম্ব মৈত্র) প্রভৃতি কেহ কেহ ঐ মৎস্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিনা মাছে এখনও বেশ বাঁচিয়া আছেন। আমার ইলিশ মাছের কথা মনে হইলে জিহ্বার জল বন্ধ করিতে পারি না।

বড়লোকের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের আহার্য দ্রব্য বহুমূল্যের ও বহু ধরণের। দধি দুগ্ধ সংযোগে মিষ্ট হইতে যত রকমের খাদ্যসামগ্রী এযাবৎ কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদেরই জন্য। তাঁহারা সূক্ষ্ম দেহধারী ও অল্প-আহারী আমি শিশুকাল হইতেই একটু পেটুক আছি। তবে কালিয়া, পোলাও, মিষ্টান্নাদির বড় ধার ধারি না। সোজাসুজি গরম ভাত সাধাসিধা তরকারি ও কিছু ঘৃত হইলেই আমার আর কোন আপত্তির কারণ নাই।

বহুদিন হইল, ফরিদপুর হইতে জলপথে নৌকায় কুমারখালির স্বর্গগত উকিলবাবু প্রমথনাথ সান্যাল ও তদীয় যোগ্য কৃতবিদ্য সহোদর হেমবাবুর সহিত আসিতেছিলাম। গোয়ালন্দ পৌঁছিয়াই ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তিনি আজ্ঞাবহ ম্যানেজারকে খাদ্যের বরাদ্দ করিয়া দিলেন। দেখিলাম প্রত্যেকের ভাগ্যে দুই টাকার অধিক নহে। আমার ক্ষুধার মাত্রা বুঝিয়া

আমি ভয়ে ভয়েই বলিলাম, কিছু খাড়াইলে হইত। তিনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। খিচুড়ী প্রস্তুতের পর আমার পাতে বারো আনা পড়িলেও আপত্তি করিলাম না। কাজেই আবার রাঁধিবার আয়োজন করিতে হইয়াছিল।

এখন প্রাচীন হইয়া বেশী না হইলেও ভাল রকমই খাইতে পারি। অল্প আহার ভাল, ইহা শাস্ত্রে লেখা আছে। ডাক্তার কবিরাজও বলেন। আমি তাহা বুঝি, কিন্তু কাজে ঘটিয়া ওঠে না। কত প্রিয় খাদ্য খাইলাম, কত সম্ভোগ করিলাম, তাহা এখন মনে হইতেছে। সেই খাদ্যাদির দ্বারা যে শরীরটাকে যত্ন করিয়া এতদিন পোষণ করিলাম তাহা এখন ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে। আহারের মাত্রাও কমিতেছে। রুচিও কমিতেছে। কমিতে কমিতে যাহা হইল তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। যাহা হউক, আজ সারাজীবনের খাওয়া দাওয়ার কথাটা আলোচনা করিয়া শেষ খাদ্য দ্রব্যের নিকট আগেই বিদায় হইতেছি। জিহ্বাকেও ক্ষান্ত ও নিবৃত্ত হইতে বলিতেছি। ভগবান! এতদিনের খাওয়ান পরানো শরীরটা শেষে মাটি করা তোমার উদ্দেশ্য হইল! এ শরীর ছাড়িতে আমার কখনই ইচ্ছা হয় না। তবে ছাড়িবার দিন নিকট। এই শরীরটা লইয়া এতদিন চলিলাম। যে শরীরে একটু আঘাত লাগিলে আমি বেদনায় কাতর হইতাম, মর্ত হইতে সে শরীর সহজেই বিদায় লইবে।

যে-আমি এখন শরীর ও খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি সে-আমি শরীর ছাড়া হইব সন্দেহ নাই। আমি শরীরের শিরায় শিরায় অণুতে অণুতে মাত্র আছি। এই আমি শরীরের কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে নাই। আমার কোন আকার প্রকার নাই। কিন্তু আমি আছি। আমার সঙ্গে এক মহাপুরুষ নিয়ত বাস করিতেছেন, তিনি পরম পবিত্র, পরম হিতৈষী। সকল সময় আমাকে সৎপথ দেখাইয়া চলিতেছেন। তিনি আমার শরীরে অদৃশ্য হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি তদ্রূপ অদৃশ্য হইয়াও বিদ্যমান ও জাগ্রত। আমি তাঁহাকে ছাড়িব না। শরীরটা ছাড়িবার সময় পর্যন্ত তাঁহাকে ধরিয়া থাকিব। তিনি এতদিন ভালবাসিলেন, তখন কি ফেলিবেন? এই ভরসায় দিন কাটাইতে থাকিব।

সেনগ্রাম

আমার জন্মভূমি সেনগ্রামের আদি বৃত্তান্ত সেনগ্রামে বিশেষ কিছুই জানা যায় না ও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেনগ্রামের আনন্দ বা কন্দু (কবিরাজ) এখানকার মধ্যে প্রাচীন। বয়স অনুমান ১০০ বৎসর। আমরা এই আনন্দ কবিরাজ অপেক্ষাও বয়সে প্রাচীন হাবাসপুর নিবাসী বদনচন্দ্র সরকারকে ৯০ বৎসর বয়সে মরিতে দেখিয়াছি। সেও আজ প্রায় ৩৩ বৎসরের কথা। আমার পিতাও ৮০ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন, সেও প্রায় ১৫ বৎসর হইল। ইঁহাদের মুখে সেনগ্রামের সেকালের কাহিনী যাহা শুনিয়াছি ও সেনগ্রামের বালিতলার বটগাছ, পঞ্চু ফকিরের বটগাছ ও রাধা বিনোদিনী ঠাকুরাণীর বটগাছ প্রভৃতি প্রাচীন বৃক্ষরাজির বয়ঃক্রম ধরিয়া সেনগ্রামের কোন অস্তিত্ব ১৪০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং বিগত ৫০০ বৎসরকাল সেনগ্রামের বয়স ধরিলে স্থূল হিসাবে ইহার প্রতিপোষক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার পূর্বে সেনগ্রাম অতলস্পর্শ পদ্মাগর্ভে অবস্থিত ছিল। মেজর রেনেল সাহেব ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মানদীর যে ম্যাপ অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতেও সেনগ্রামের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পূর্ব্বের কোন ম্যাপে দৃষ্ট হয় না।

সেনগ্রামের চিকিৎসা

সেনগ্রাম একটি গরীব পল্লীগ্রাম। সেকালের সেই মুন্সী সাহেবের পাঠশালায় বিদ্যালোক ব্যতীত কাহারও বিদ্যাবুদ্ধি বেশী ছিল না। সকলেই প্রায় নিরক্ষর। সেকালের অন্ধবিশ্বাস লইয়া তাহাদিগকে বাস করিতে হইত।

কলেরা পীড়াকে বিভীষণের হাওয়া, জ্বরকে জ্বরাসুরের দৃষ্টি, বসন্ত পীড়াকে বসন্ত ঠাকুরাণীর প্রকোপ মনে করিয়া তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আরাধনা ব্যতীত গত্যন্তর দেখিত না। কলেরার সময় সেনগ্রামবাসীর আতঙ্কের পরিসীমা থাকিত না। কলেরা নিবারণের জন্য গ্রামে রক্ষাকালী পূজার বন্দোবস্ত হইত। সকলকেই তাহার জন্য চাঁদা দিতে হইত। বেতের ঝাঁপির মধ্যে একটি ছোট বিকটমূর্তি সিন্দুরে রঞ্জিত বসন্তদেবীকে বেদেরা বাঁকে করিয়া ঘরে ঘরে দেখাইয়া ভিক্ষা করিত। ঐ দেবীর শরীরে বসন্তের ঘায়ের চিহ্নস্বরূপ পিতল-বিন্দু আঁটা থাকে। বাহক এক অদ্ভুত বাদ্য বাজাইয়া ঘরে ঘরে ফিরিত ও তাহাতে শুধু বালক বালিকা কেন সকলেরই হৃদয়ে প্রভূত ভীতি উৎপন্ন হইত। ঐ দেবীকে চাউল, সিন্দুর, তৈল, ডাইল, প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী দিলে আর বসন্তের ভয় থাকিবে না মনে করিয়া সকলেই ভিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হইত না। জ্বর ও অন্যান্য প্রকার পীড়ার জন্য জ্বরাসুরের পূজা ও হরিলুঠ দেওয়া হইত।

রাজা রাজেশ্বর এদেশের সর্বপ্রধান দেবতা ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মদাপুর। কিন্তু তাঁহার এলাকা সেনগ্রাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। মদাপুরে একটি শালবৃক্ষ ও তৎপরে একটি বটগাছের তলায় এই রাজ রাজেশ্বরের পূজা হয়। অসংখ্য ব্রাহ্মণ এই পূজার আয়ে প্রতিপালিত হয়। ইঁহার পূজায় মেড়া (ভেড়া) বলিদানের ব্যবস্থা। যাহারা পীড়া উপশম মানসে মোড়া বা ভেড়া দিবার অঙ্গীকার করে, পীড়ার যেকান প্রকারে হউক উপশমমাত্র তাহাদিগকে ভেড়া লইয়া গিয়া ও ব্রাহ্মণের দক্ষিণা দিয়া পূজা দিয়া আসিতে হয়। পীড়া ভাল না হওয়া পর্যন্ত রোগীর মস্তকের চুল ক্ষৌরকার্য বন্ধ করিয়া রক্ষা করিতে হইত। তাহাতে মাথায়

জটার উৎপত্তি হইত, ও ঐ চুল ঐ রাজ রাজেশ্বরের মন্দিরে কাটিয়া দিতে হইত। তথায় বহু নাপিতের তাহাতেই বহুকালাবধি দিন গুজরান হয়। দৈনিক সহস্র সহস্র ভেড়ার রক্তের স্রোতে নিকটস্থ নানা খানা গর্ত পূর্ণ হইয়া যায়। সে প্রাণীহত্যা ভীষণ ব্যাপার। তবে চক্ষে দেখিলে উপাসকের প্রাণে হয়ত একদিকে অশুভ (?), কিন্তু অন্য দিকে পীড়া-শান্তির আশ্বাসে ও বিশ্বাসে শান্তির আবির্ভাব হইত।

পল্লীবাসীরা, রক্ষাকালী হরি গাজীবাবা জরাসুর বসন্ত ঠাকুরাণী রাজরাজেশ্বর প্রভৃতি গ্রাম্য-দেবতার করুণার উপর অধিকাংশ পীড়ার চিকিৎসা ভার রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। এরূপ আরোগ্যলাভে আজকালকার ডাক্তারী চিকিৎসার ন্যায় ব্যয়বাহুল্য ছিল না। জ্বর, গ্রহণী ক্ষুদ্র পীড়ায় হরিঠাকুরকে কিঞ্চিৎ হরিরলুঠ, বসন্তরোগের আশঙ্কায় বসন্ত ঠাকুরাণীকে কিছু চাউল ডাউল দিলেই হইত। কলেরা নিবারণের জন্য কিছু বেশী ব্যয়ের প্রয়োজন হইত। রক্ষাকালী ঠাকুরাণীর মূর্তি নির্মাণ ও পাঁঠাবলি দিয়া পূজা দিতে যে ব্যয় হইত, অবশ্য তাহার পরিমাণও কম হইত না।

গাজীবাবাকে তেমন কিছু দিতে হইত না। প্রথা অনুসারে মুসলমানগণ গাজীর বাঁশ তুলিত। গাজীর বাঁশগুলা এখন নাই বলিলেই হয়। সেজন্য সাক্ষাৎ নমুনা দেখাইতে পারা যায় না। ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করাও সুকঠিন। পল্লীর মুসলমানরা তাহাদের চিকিৎসার জন্য গাজীর বাঁশের উপর অনেকটা নির্ভর করিত। গাজীবাবার পূজার প্রণালী এই—

প্রথমে একটি রুজু বাঁশ কাপড়ে আচ্ছাদন করিয়া তাহার মাথায় কোষ্টা (পাট) কালো রঙ করিয়া চুলের মত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাহার কিছু নিম্নে পাঁচ ছয় গাছা দীর্ঘ রজ্জু বাঁধিয়া দিয়া তাহা পাঁচ ছয় জনের হাতে দিয়া বাঁশটি খাড়া করা হয়। এই বাঁশের নিম্নপ্রান্ত একটি বলবান ব্যক্তি নিজ কোমরে সংবদ্ধ দড়ির সহিত বাঁশটি রাখিয়া, বাঁশটিকে খাড়া রাখিয়া বাদ্যের সঙ্গে নাচিতে থাকে। নর্তক ঠিক কেন্দ্রস্থানে থাকে ও চতুর্দিকে লোকের হাতে রজ্জু সংবদ্ধ থাকায় বাঁশটি খাড়া থাকে ও তাহার মস্তকের চুল দুলিতে থাকে। নর্তকের পায়ের ঘুঙুর নাচের সঙ্গে বাজিতে থাকে। কখনও নর্তক বাহাদুরী দেখাইবার জন্য বাঁশ হইতে হাত সরাইয়া দিয়া ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিয়া নানা ভঙ্গিমায় নাচিতে থাকে। কোন গান

হয় না। ঐভাবে গৃহস্থদের দ্বারে আসিলে গৃহস্থেরা চাউল, ডাইল, তৈল, লবণ দিয়া বিদায় করে। এইরূপ কয়েকদিন বাঁশনাচ ও ভিক্ষার পর একদিন লোট জ্বালানো হয়। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। হিন্দুরা ইহাতে যোগ দেন না। তবে যাহার ইচ্ছা যোগ দিয়া থাকেন, কিন্তু কোন প্রসাদ লয়েন না। প্রসাদ প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই—

চাউল ধৌত করিয়া ও গুঁড়া প্রস্তুত করত: কুক্কুট মাংসসহ মিশ্রিত করিয়া পেষণ করিতে হয় ও তাহাতে মসলা ও মিষ্টাদি সংযোগ করিয়া আগুনে পোড়াইয়া সকলে তাহা ভাগ করিয়া ভক্ষণ করে। ইহাকে লোট জ্বালানো বলে।

এই লোট জ্বালানো শেষ না হওয়াতক, উপসক ও দর্শক মুসলমানগণ, কোন কোন হিন্দুও, সকলে একত্র হইয়া 'গাজীর জয়' বলিতে থাকেন। এইরূপ বলিতে বলিতে কাহারও ঘাড়ে দেবতার আবির্ভাব হয়। সে তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়াইতে নাড়াইতে হামাগুড়ি দিয়া ডাইনে ও বামে চলিতে থাকে। গাজী দেবতা আবির্ভূত হইয়া ভবিষ্যৎবাণী ও পীড়ার চিকিৎসার কথা বলিয়া দেন। দেশের মঙ্গল হইবে কিনা তাহাও বলিয়া দেন। কখনও কখনও কিছু মাটির ধুলা দিয়া বলেন, ইহা রোগীকে খাওয়াইয়া দিও পীড়া সারিবে। বিশ্বাসী বক্তিরা ঐ ধুলা যত্নের সঙ্গে গ্রহণ করে ও খাদ্যের সহিত ভক্ষণ করে। কাহারও পীড়া ভালও হইয়া যায়। গরুর পীড়া হইলে, দেশে চাষের সময় জল না হইলে, এই লোট জ্বালানো হইয়া থাকে। রোগীর পীড়ার জন্ম বিশেষ মানসা থাকিলেও লোট জ্বালানো হয়। ইহাতে কিছু ব্যয় হয়।

পীড়া উপশম করিতেই হউক বা কৃষিকার্যে ধান্য বপনের সময়ে জলের জন্যই হউক, এই প্রথা পুর্বে প্রচলন ছিল। এখন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেকালে ডাক্তারী চিকিৎসা ও কবিরাজী চিকিৎসা ছিল না, এমন নহে। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার কথা কেহ জানিত না। ডাক্তার কুমারখালিতে মিলিত। ওসমানপুরের শ্রীনাথ ডাক্তার (বাবু শ্রীনাথ রায়) এদেশেও বিশেষ দুরারোগ্য পীড়ার চিকিৎসার জন্ম কখনও কখনও আসিতেন। কিন্তু সে এত কম যে ধর্তব্য নহে। ভাল চিকিৎসা সেকালে ছিল না। কবিরাজী চিকিৎসা হাতুড়ে কবিরাজরা করিত। যশাইয়ের মদন সেন, লালন সেনকে কবিরাজী করিতে দেখিতাম। তাঁহারা

রোগীকে প্রত্যহ দেখিতেন। ঔষধ বড়ি ও গুঁড়া কাগজে মোড়ক করিয়া বাঁধিয়া তাহার পৃষ্ঠে লিখিয়া বাড়ীতে রাখিয়া দিতেন। অশ্বপৃষ্ঠে রোগীর বাড়ী যাইতেন।

সেনগ্রামে আনন্দ কবিরাজ খুব বিখ্যাত লোক ছিলেন। তাঁহার চিকিৎসাকার্যে খুব দক্ষতা ছিল। তাঁহার ছেলেরা কতক শিখিয়াছিলেন। ১১০ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। এখন অবশ্য গ্রামে গ্রামে ডাক্তারী চিকিৎসা বহুরকম চালু হইয়াছে। সেনগ্রামে পাশকরা ডাক্তার ও হাতুড়ে ডাক্তার অনেক হইয়াছে। Injection'ও চলিতেছে। আগে তুলসীপাতার রস, মধু ইত্যাদি অনুপানে কবিরাজী ঔষধের বড়ি খাইতে হইত। কুইনাইনের নাম তখনও শুনা যায় নাই। রোগীর আসন্নকালে নানারূপ চেষ্টা করা হইত। রোগীর পথ্য সাগুদানা ছিল। রোগীকে গরমজলে স্নান ও গরমজল খাইতে দেওয়া হইত। স্নান বহুদিনের পরে করিবার ব্যবস্থা ছিল। একদিন আমার পীড়ার চিকিৎসার সময় আমার মা কবিরাজকে তাড়াতাড়ি আমাকে খাইতে (পথ্য) দিতে বলিলেন, কিন্তু কবিরাজ খাইতে দিতে নিষেধ করিলেন। আমার রোগ না সারিলে যে কবিরাজই দায়ী। কবিরাজ হাত দেখিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিতেন, ভয়ে সময় সময় বলিতেন, নাড়ী ভার দেখিতেছি। রোগী স্নান করিলেই কবিরাজের বিদায়। কবিরাজ টাকা ছাড়া রোগবিশেষে ঘটি বাটি থালা ঘড়া পুরস্কার লইতেন। এই তো গেল কবিরাজের কথা।

কয়েক বৎসর পর গ্রামে চিকিৎসক হিসাবে হারাণ মণ্ডল আসিয়া জুটিলেন। ইনি গোয়াড়ীর (কৃষ্ণনগর) লোক ছিলেন। কথা বলিতেই পটু ছিলেন। বাহিরে ভাল পোষাক পরিতেন। একটি বাড়ীতে তাঁহার আড্ডা ছিল। তাঁহার কোন একটি নিন্দার বিষয় ছিল, যদিও তাহা বৃদ্ধসমাজে, যুবকসমাজে, ধর্মসমাজে কোন স্থলেই নিন্দনীয় গণ্য হইত না।

পরে দেশে কুইনাইন দেখা দিল। সকল চিকিৎসকই উহাই অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুদিন আগে কলিকাতায় (Plut medicine mixture) নামে একরকম মিক্সচারের চলন ছিল। উহা জ্বর নিবারণের জন্য। উহাতে সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই কুইনাইন থাকিত। তাই আমি কিছুতেই ঐ তিক্ত মিক্সচার খাইতে চাহিতাম না। বাবা কলিকাতা হইতে ঐ মিক্সচার কিনিয়া আনিতেন। এখনও তাহার কথা

মনে হইলে বড়ই ভয় হয়। এখনকার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এখন চিকিৎসার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

আর এক শ্রেণীর পীড়ার তখন প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহার নাম ভূতে-ধরা। রোগীকে ভূতে ধরিলে কখনও কাঁদিতে কখনও হাসিতে কখনও দাঁতকপাটি দিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইত। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ঐ রোগের বাড়াবাড়ি দেখা যাইত। মাজদিয়ার কাছে পুরোন সেনগ্রামের রামঠাকুর ইহার নামজাদা চিকিৎসক বা ওঝা ছিল। সেনগ্রামের কয়েকটি বাড়ীতে এই রোগের আবির্ভাব ও চিকিৎসা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ওঝা আসিয়া হলুদ পোড়াইয়া রোগীর নাকের কাছে ধরে। আশ্রিত ভূত তখন রোগীর মুখে কথা বলিয়া বলে, আমি এখুনি চলিয়া যাইতেছি। ওঝা তখন বলে, তুই যে ছাড়িয়া যাইবি তাহার নিদর্শন কি? এই জলপূর্ণ কলসীটি দাঁতে করিয়া ওঠা অথবা বাটির বৃক্ষের একটি ডাল ভাঙিয়া দিয়া যা, তবেই তো বিশ্বাস হইবে। ভূত তাহাই করে। রোগী তখন দাঁতে খিল লাগিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। পরে আর এরূপ হয় না। কণ্ঠগজরায় কয়েকটি বাটিতে এই ভূতের অত্যাচার হইয়াছিল। ভূত বাড়ীতে বিষ্ঠা আনিয়া ফেলিত। ওঝা আসিয়া ঐ ভূত ছাড়াইয়া দিয়াছিল।

আমরা স্কুলে পড়িয়া ভূতে অবিশ্বাসী হইয়াছি। তবে এখন আবার ভূতের কথা শুনিতে পাই ও আমাদেরও মধ্যে অনেকে ইহা বিশ্বাস করে। 'প্রেতাত্মা' নামক গ্রন্থখানিতে বহু ভূতের গল্প আছে তাহা পড়িয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। আমার নবদ্বীপ বাটিতে জনৈক বিধবা ব্রাহ্মণ মহিলা কিছুদিন ছিলেন। তিনি শিক্ষিতা রমণী। গীতাদি ধর্মগ্রন্থ ও গোপনে বিগ্রহের পুজা করিয়া থাকেন। ইঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, খুব উচ্চ বংশের মেয়ে ও খাঁটি চরিত্রের লোক। তিনি আমার নিকট একটি অদ্ভুত গল্প করিলেন।

তাঁহার ঘরের নিকট এক ধোপার স্ত্রী ছাদ হইতে পড়িয়া মরে। একদিন সন্ধ্যার পর ঐ মহিলা উপরের ঘরে দ্বারাদি রুদ্ধ করিয়া বসিয়া ভগবানের নাম করিতেছেন, এমনসময় কালোপেড়ে কাপড়-পরা কোন একটি সধবা স্ত্রীলোক খটখট শব্দ করিয়া জানালা দিয়া হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করায় খানিকক্ষণ পরে বলিল, আমি ঐ ধোপার বৌ মহিলা বলিলেন, হরি নাম কর। প্রেতাত্মা কহিল, বলিতে পারি না।

ঠাকুরাণী বলিলেন, আমি বলি তুমি শুনিয়া লও। ঠাকুরাণী ভগবানের নাম করিতেই প্রেতাত্মা অন্তর্ধান করিল। আর আসিল না। ঠাকুরাণী মিথ্যা বলিবার লোক নহেন। সেকালে এই ভুতে পাওয়ার খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। এখন নাই।

সেকালে ব্রহ্মদৈত্য নামাইয়াও রোগ সারানো হইত। সকল দুরারোগ্য পীড়ার স্থলে ঐ প্রকার ভৌতিক ক্রিয়া চলন ছিল। ভুতকে আহ্বান করিয়া আনা হইত। এখন ভুতও নাই, প্রেতও নাই।

আমি আজ পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে উপনীত। আমাদের গ্রামের যাঁহারা বেশী বয়সে মরিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আনন্দ বসু, হাবাসপুরের দীন সরকার, সেওরীয়াব লালন ফকির প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আনন্দ বসুর ১১০, লালন ফকির ১১২, দীন সরকার ১৩৩ বৎসর বয়সে মরিয়াছেন। একালে আর অত বয়সে মরিতে দেখি না।

আমার পিতা, ভৈরব বিশ্বাস প্রভৃতি ৮০ বৎসর প্রাক্কালে ইহধাম ছাড়িয়া গিয়াছেন। এরূপ আয়ুষ্কাল কমিয়া যাওয়ার কারণ কি জানি না। হয়ত তাহারা যে সকল স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করিতেন তাহা এখন আর করা হয় না। অথচ রোদ বৃষ্টি ইত্যাদি তাঁহারা গ্রাহ্য করিতেন না। শীতে এত পোশাকের ধার ধারিতেন না। খাইবার মধ্যে চাউল ডাইল মৎস্য ও দধি দুগ্ধ খাইতেন। ম্যালেরিয়া বলিয়া কোন ব্যাধির তখন জন্ম হয় নাই। পীড়ার মধ্যে মাথাধরা, জ্বর, প্লীহা, হাঁপানি, ভেদ (কলেরা) অতিসার, শূলবেদনা এই সকল ছিল। এখন নুতন পীড়ার নাম শুনিতেছি। সেকালে তাহার নামগন্ধও ছিল না। সেকালে এত রাস্তাঘাট ছিল না। ডাক্তারখানা, স্যানিটারি ব্যাবস্থা ছিল না। এখন এত মিটিং এত ডাক্তার এত রিপোর্ট সত্ত্বেও দুঃখের বিষয় আমরা অল্প বয়সে মরিতেছি।

সেকালে ঔষধ ছিল তুলসী পাতা অথবা পানের রস এবং কবিরাজী বড়ি। কুইনাইন বোধহয় ৫০ বছর আগে এদেশে ছিল না। তবুও লোকে বহুকাল বাঁচিত।

(১৯২৪)

রাত্রে খাট দিনে সিন্দুক

সেদিন মাছপাড়ার হাটের দিন। সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছাইয়া মাছের দোকানে গিয়া দেখি বড় মাছ নাই। পুঁটি, খলিশা, কয়েকটা মাগুর মাছ আছে। দর শহর অপেক্ষা কতক সস্তা। সেই রাত্রে একটি গরীব আত্মীয়ের বাড়ীতে তাঁহার অনুরোধে থাকিয়া প্রত্যূষে বাড়ী (সেনগ্রাম) রওনা হইব স্থির হইল। রাত্রে মোটা চালের ভাত পুঁটি মাছসহ সমাদরে ভক্ষণ করিয়া মহাতৃপ্তির সহিত অনেক রাত্রির পর্যন্ত কথাবার্তার পর শয়ন করিলাম।

শয়নগৃহখানি বড়ই উল্লেখযোগ্য। সুতরাং তৎসম্বন্ধে পাঠকগণকে কিছু বলা কর্তব্য বোধ হইতেছে। ঘরখানি বাঙ্গালা, মটকাখানি ধনুকের ন্যায়, বারান্দার চাল'ও তদাকারে বক্র হইয়া অর্ধ বৃত্তাকারে ডোয়ার উভয় পার্শ্ব স্পর্শ করিয়াছে। শীতের সময় এইরকম ঘরে বাস করা সুবিধা, কিন্তু গ্রীষ্মকালে বড়ই গরম। ঘরের মাচার উপর কলসীতে নানা শস্য রাখা হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা কোষ্টার (পাটের) শিকা তৈয়ারী করিয়া তাহাতে জিনিস ঝোলাইয়া রাখিয়াছে।

ঘরের মেঝের উপর একটি সিন্দুক আছে। সিন্দুকটি bed at night & chest by day, দিনে খাটের কাজ করে, রাত্রে শয়নকার্য চলে। আমি ঐ সিন্দুকের উপর পাতা বিছানায় শয়ন করিয়া খুব প্রাতে উঠিলাম। তখন দেখি বাটির মেয়েরা সম্মার্জনীর দ্বারা গৃহ ও উঠান পরিষ্কার করিতেছে। পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া তাড়াতাড়ি প্রাতঃ ক্রিয়া সমাপনান্তে আত্মীয়ের সহিত দেখা করিয়া পদব্রজে বাটি রওনা হইলাম।

কুণ্ডু মহাশয়

একদিন মুহুরী কুণ্ডুমশাইকে সঙ্গে করিয়া কোন কার্যপোলক্ষে পোড়াদহের কিঞ্চিদোত্তরে একটি গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হই। সেখানে বেলা ১টার সময় গিয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অনেক কষ্টে কতকটা ঘৃত ও বেগুন ও চাউল ও ডাইল সংগ্রহ করিলাম। বাজারে জেলেনীকে ডাকিয়া সেই গোল বড় বেগুন কয়েকটিকে খণ্ডখণ্ড করাইয়া লইয়া ভাজিবার জন্য রাখিলাম, ও ডাইল দিয়া খিচুড়ী রাঁধা স্থির হইল।

কুণ্ডুমহাশয় স্নান করিয়া জল আনিলেন। রন্ধনে আমিই নিযুক্ত হইলাম। কুণ্ডুমহাশয় অনেকটা ভাবিয়া বলিলেন, বেগুন যেভাবে কাটিয়াছে উহা খাওয়া যাইতে পারে না। আমি বলিলাম, অাচ্ছা, আপনাকে অবশিষ্ট যে বেগুন আছে তাহা পোড়াইয়া দিলেই হইবে। কারণ কাটিবার যন্ত্র নিকটে নাই।

খিচুড়ী হইয়া গেল। মহুরীমহাশয় বেগুনপোড়া দিয়া খিচুড়ী খাইলেন, আমি বেগুন ভাজা দিয়া ঘৃত সহযোগে খিচুড়ী শেষ করিলাম।

পরে আমরা রওনা হইয়া কিছুদূর চলিবার পর একটি মিঠাইয়ের দোকানে আসিয়া বসিলাম। কুণ্ডুমহাশয় নিজের চর্মপাদুকা থলেতে পুরিয়া রাখিয়া শুদ্ধভাবে মিঠাইওয়ালার সামনে গিয়া বসিলেন। রসগোল্লা প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে ভক্ষণের পর জুতা খুঁজিতে গিয়া দেখেন অন্য কেহ তাহা ইত্যবসরে লইয়া গিয়াছে। মহা দুঃখে কুণ্ডুমহাশয় বলিলেন, হিন্দুয়ানী বজায় রাখা বড়ই কঠিন।

তাহার পর একদিন জেলের নৌকায় তাঁহার সহিত বাড়ী যাইতেছি। দুই প্রহরের সময়, নৌকায় রান্না করিতে হইবে, আমি কুণ্ডুমহাশয়কে নিযুক্ত করিলাম। তিনি চুলার ধোঁয়ায় বিনা শোকতাপে চক্ষের জলে অকারণ বয়ান ভাসাইলেন। নাসিকার রন্ধ্রদ্বার হইতে সুদীর্ঘ কফের ধারা ছাড়িয়া দিলেন। সে অসহায় দৃশ্য দেখিয়া আমি অগত্যা তাঁহার স্থলে রান্না করিলাম।

রান্না শেষ হইলে কুণ্ডুমহাশয় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, জেলের নৌকায় আহার হইতে পারে না। সেদিন বেচারীর কোনই আহার হইল না। ক্ষুধানলে ভস্মীভূত হইয়া মলিন হইয়া রহিলেন।

এই গোঁড়া হিন্দু কুণ্ডুমশাইকে লইয়া মহা ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হইয়াছিল।

হরিদাসের হিন্দুয়ানী ও মাথাধরা

শ্রদ্ধাস্পদ রায়বাহাদুর জলধরদাদা-র (জলধর সেন) ১৩৩৩ সালের বার্ষিক বসুমতীতে প্রকাশিত 'গৃহিণী রোগ'—প্রবন্ধটি আজ একাকী নির্জনে বসিয়া পাঠ করিতে করিতে অনেকবার হাসিয়াছি। একা একা হাসা, লক্ষণ ভাল নহে। লেখক সাহিত্য জগতে সুপরিচিত কিন্তু আমার বাল্যবন্ধু ও দেশের লোক। তাঁহার লেখার ভঙ্গিমা দেখিয়া অবাক হইলাম। তিনি আমার ছয় মাসের বড়। অনেকদিন আগে ছয় মাস মধ্যে তাঁহার মরিবার কথা ছিল, অর্থাৎ তাঁহার পেটে নাকি কি এক পাথুরী রোগ হইয়াছিল। তাহাতে ছয় মাসেই তাঁহার শেষ হইবার কথা, ইহা সুপটু চিকিৎসকগণ রটনা করিয়াছিলেন। মরিলে 'গৃহিণী রোগ' কে লিখিত? তাঁহার হাতে এরূপ আরও লেখা আদায় না করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। তাঁহাকে আরও অন্ততঃ অনেকদিন বাঁচাইয়া রাখা আবশ্যক। তাঁহার লেখা পড়িয়া আমার 'হরিদাসের কথা' মনে পড়িল।

আমার একটা চাকর ছিল। তাহার নাম হরিদাস। সে ভোজনে খুব মজবুত কিন্তু কাজে ভয়ানক কুঁড়ে ছিল। অর্থাৎ কাজে কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে ছিল। তাহার এসব জানিয়াও তাহাকে তাড়াইতে পারিতাম না। অনেক দিনের জন্য একটা ভালবাসা জন্মিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী থাকিলেও, আজ একটা ঘটনাই বলিতেছি।

প্রাতে তাহাকে বিছানা হইতে উঠাইতে হইলে বন্ধ দরজার পাশে অনেক চিৎকার করিয়াও ফল হইত না। অনেক সময় জানালার মধ্য দিয়া বাঁশের ডগা চালিত করিয়া খোঁচা দিয়া অনেক কষ্টে তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে হইত। কোন কাজ বলিলেই অনেক ওজর আপত্তি হইত। কাজের সময় প্রায়ই তাহার মাথা ধরিত, কিন্তু তাহা বেশীক্ষণ থাকিত না। ভোজনের সময় সম্পূর্ণ ভাল হইত। এরূপ মাথাধরা পুরাতন হইয়া পড়িয়াছিল।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে এরূপ একটি মাথাধরা রোগী চাকর রাখা না:

রাখা সমান। আমিও তাহাই বলি। কিন্তু তথাপি কেন রাখিতাম, তাহা আমি জানি ও হরিদাসও জানিত। আমাকে অনেক সময় কার্যোপলক্ষে দেশে দেশে বেড়াইতে হইত। তখন ঝি কি চাকরানী সঙ্গে লওয়া চলে না। মফঃস্বলে আমার সঙ্গে একজন হরিদাসের মত চাকর না থাকিলে লোকের নিকট আমার মর্যাদা কমিবারও সম্ভাবনা ছিল। হরিদাসকেও বেশী কিছু দিতে হইত না। যাহা দিতাম তাহা না দেওয়ার সামিল। সেও যাহা কিছু করিত তাহাও না করিবার সামিল। তাহারও অন্য স্থান জুটিত না, আমারও অল্প বেতনে হরিদাস ছাড়া অন্য কাহাকে পাওয়ার উপায় ছিল না। পথে-ঘাটে সঙ্গের জিনিসপত্র বহনের লোক সকল স্থানে মিলিত না, সেখানে হরিদাস ছিল আমার মূল্যবান সম্পত্তি।

যাহা হউক একদিন মফঃস্বলে 'ভেড়ামারা' বাজারে হল্ট (halt) করিতে হইল। বেলা তখন প্রায় ১২টা। একজন ভদ্রলোক আমার খাবার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিলেন, কিন্তু পাচকের অভাব। আমি সেকাজে নেহাত অপারগ ছিলাম না। হরিদাস ও আমার উভয়ের ক্ষুধার মাত্রা খুব বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা বলা বাহুল্য। হরিদাসকে না বলিতেই উনান করিবার জন্য হরিদাস কয়েকখানা ইঁট সংগ্রহ করিল। উনান সাজাইবার পর সংগৃহীত দ্রব্যাদির মধ্যে মাছ কোটা ও বেগুন কোটা ও জল আনা প্রথম দরকার হইল। হরিদাস বলিয়া উঠিল, ইঁট হাতে লাগিয়া নখ ব্যথা করিতেছে ও রাত্রিতে শোবার দোষে কাঁধে ও পিঠে ব্যথা হইয়াছে। তাহার মাথাও তখন ধরিয়া উঠিল। কাজেই হরিদাসের সাহায্যে আমি বঞ্চিত হইলাম।

বাজারের এক জেলেনী মাছ বেচিয়া বাড়ী যাইতেছিল। তাহাকে বলিলাম, বাছা, আমার মাছ ও তাজার বেগুনগুলি কুটিয়া দাও। মেয়েটি ভাল মানুষ, মাছ ও বেগুন কোটা শেষ করিবামাত্র জল আনিতে বলিলাম। সে অমনি কলসী লইয়া জল আনিতে চলিল। তখন হরিদাস বলিল, জাত মেরে চাকরী করিব না, ও বেগুন কিছুতেই খাইব না। বলিলাম, বেশ তোমার জন্য বেগুন যাহা আছে পোড়াইয়া লও এবং তুমি জল আনিতে যাইতেছ, ইহাই আমার পরম ভাগ্য।

আমি উনান ধরাইয়া দিলাম। কাছে সন্তআনা সুগন্ধযুক্ত গাওয়া ঘি একবাটি ছিল। তাহারই অনেকটা মনের মত লইয়া কড়াইতে দিলাম ও

চক্রাকারে কাটা বড়বড় বেগুন ভাজিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় এক পোয়া ঘৃতমধ্যে বেগুন যখন কটাহে ঘুরিতে লাগিল, হরিদাস তখন মুখ চুন করিয়া বলিল, বিদেশে নিয়ম নাস্তি, ঘৃতদ্রব্যে দোষ আছে নাকি? আমি বলিলাম, আমরা ইংরাজীনবীশ লোক, অত মানিয়া চলি না, তোমার হিন্দুয়ানীতে বাধা দিব না, তোমাকে বরং বেগুন পোড়াইয়া দিব। রাঁধা শেষ হইলেই জানিতাম, হরিদাসের মাথাধরা ভাল হইবে। সময়মত সে হাজির হইয়া বলিল, একটা ডুব দিয়া আসি, মাথাধরা অনেক কমিয়া গিয়াছে। হরিদাস স্নান করিয়া আসিয়া ভোজনে বসিল এবং আহার সমাপনান্তে শয়নে ব্যাপৃত হইল।

ট্রেনের সময় তাহাকে ডাকিয়া উঠাইলাম। হরিদাস বলিল, এখন তো একরূপ হইল রাত্রে কি হইবে? আমি বলিলাম, পোড়াইদহ স্টেশনে পৌঁছাইতে রাত্রি এগারোটা হইবে তখন ভাতের কোন যোগাড় করা সম্ভব নয়। স্টেশনে মেঠাইওয়ালাদের নিকট খাবার খাইতে হইবে। হরিদাস বলিল, আমি তো যে-সে মিঠাই খাই না। সিঙ্গাড়া, কচুরী, লুচি চলিবে না, কারণ ঐ সকল ভাজা খাবারের জন্য সেখানে কোন বামুনের দোকান নাই। ময়রা ও পালের দোকানের সন্দেশ চলিতে পারে। আমি তাহাতেই সম্মতি দিলাম।

রাত্রি ঠিক এগারোটার সময় পোড়াইদহ স্টেশনে পৌঁছিলাম। ফেরিওয়ালারা ডাক ছাড়িতে লাগিল 'গরম খাবার'। হরিদাস বহু অনুসন্ধানের পর ময়রার ও পালের সন্দেশ না খাইয়া ফেরিওয়ালার সেই সিঙ্গাড়া, কচুরী ও রসগোল্লা ইত্যাদি ১২ আনার খাইয়া গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া ভাবিতে দেখিয়া কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হরিদাস, কি ভাবিতেছ? সে কাছেই খাবারওয়ালাকে দেখাইয়া দিল। খাবারওয়ালা ঐ সকল জিনিসের দাম চাহিলে, আমি চটিয়া বলিলাম, মিথ্যা করিয়া দাম চাহিতেছ, হরিদাস ওসব খায় নাই। হরিদাস তখন ব্যস্ত হইয়া বলিল, আর শুনিবেন না, দায় ঠেকিয়া ঐসব খাইয়াছি। তাহা ছাড়া আমার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। অল্পদিন হইল, একজোড়া ভাল জুতা কিনিয়াছিলাম। আপনাদের মত জুতা। লোকের ভিড়ের মধ্যে জুতা খুলিয়া রাখিয়া খাবার খাইতেছি, এমন সময় কোন এক হারামজাদা আমার জুতা চুরি করিয়া নিয়া গিয়াছে। শুনিয়া দুঃখ করিলাম।

হরিদাস পরদিন বাসায় আসিয়া খুব ঘুমাইয়া উঠিবার পর যেই একটু কাজ করিতে বলিলাম, তখনই সাবেক পদ্ধতি মত মাথাধরার কথা বলিল। আমি বলিলাম, তোমার এই বহু দিনের ব্যারাম ক্রমেই বাড়িতেছে। চিকিৎসা আবশ্যক। এখনই না হইলে হোমিওপ্যাথি বা কবিরাজীতে কিছুই হইবে না। কলিকাতা হইতে বড় ডাক্তারের ঔষধ আনিতে হইবে। কয়েকদিন পর খুব তিক্ত কুইনাইন পাউডার কয়েক পুরা আনিয়া রাখিলাম এবং যেই হরিদাসের মাথা ধরিল, আমিও তখনই হরিদাসের কাছে গিয়া বলিলাম, ঔষধ আনিয়াছি। মাথাধরা থাকিবার সময় এ ঔষধ চলে না। তখন খাইলে মাথাধরা আটকাইয়া যায়। যখন খাবার আগে মাথাধরা কমিয়া যাইবে তখন ওষুধ আমি নিজে খাওয়াইয়া দিব। অল্পক্ষণ পরেই খাবার সময় হরিদাস বলিল, বাবু, এখন মাথাধরা নাই। আমি তিলার্ধ বিলম্ব না করিয়া কাছে গিয়া বলিলাম, হরিদাস, চক্ষু বুজিয়া, মুখ ব্যাদন কর দেখি, ঔষধ খাওয়াইয়া দিই। হরিদাস যেই মুখ হাঁ করিল, অমনি দুই পুরা ঔষধ তাহার গালে ফেলিয়া দিলাম। হরিদাস মুখ-বিকৃতি করিয়া বলিল, বাবা, এত তিতা ঔষধ? আমি বলিলাম, রোগ বহুদিনের তাই খুব কড়া ঔষধ ডাক্তারে দিয়াছে।

বলা বাহুল্য, গালের তিক্ততা বারবার জলকুচা করিলেও গেল না। সেজন্য তাহার আহারটাও ভাল হইল না। কিন্তু সেই হইতে হরিদাসের মাথাধরা চিরদিনের মত ভাল হইয়া গেল।

(৬ই মে ১৯২৭)

কালের কথা

জন্ম হইতে একাল পর্যন্ত কালের কোলে প্রতিপালিত হইতেছি। কাল আমাকে এক মিনিটের জন্যেও কাছছাড়া করে না। কোন এক অদৃষ্ট অনির্দিষ্ট স্থানে দিনরাত অবিশ্রাম লইয়া যাইতেছে। আমার দেহান্তর হইলেও কাল আমাকে ছাড়িবে না। আমার মনে হয়, আমার শরীরের মৃত্যু আছে কিন্তু আমার আত্মার মৃত্যু নাই। কাজেই কাল আমাকে অনন্তকাল ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে। শরীরটা যতদিন ছিল, ততদিন কালকে বেশ সম্ভোগ করা গেল।

আমাদের কালকে যেমন প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, সন্ধ্যাকাল, নিশাকাল এরূপ এক একটা দিনরাতকে ভাগ করিয়াছি, সেইরূপ ১২ মাস, ৬ ঋতুকে বিভাগ করিয়া লইয়াছি। এইরূপ ১২ মাসে বৎসর ধরিয়া আজ ৬৮ বৎসরে উপনীত হইয়াছি।

একালের প্রথম ও শেষ কোথায় জানি না। সাহেবরা শীতকাল হইতে বৎসর গণনা করে, আমরা গ্রীষ্মের প্রথম বৈশাখ হইতে বৎসর গণনা করি। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস বড়ই দুরন্ত। গ্রীষ্মকালকে আমরা তেমন পছন্দ করি না। আমরা বিশ্বজননীর প্রেম ও ভালবাসা না বুঝিয়া এই গ্রীষ্মের উত্তাপকে অপছন্দ করি। অথচ গ্রীষ্মে উত্তাপ না হইলে আম, কাঁঠাল, লিচু, কদলী, জামরুল, বেল ইত্যাদি পাকে না। তেমনি গ্রীষ্ম না থাকিলে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তরমুজ খরমুজ সাদা আলু (শাঁকালু) ডাব নারিকেল এসব কোথায় পাইতাম? কমল কোথায় আজ কণ্টক বিহনে?

হায়রে, চক্ষু মুদিয়া বিশ্বজননীর এই সকল উপকরণ উদরস্থ করিবার সময় একবারও তাঁহার নাম মনে করি না। কেবল গ্রীষ্মের দোষ দিয়া তাঁহার দোষ দিই। গ্রীষ্ম আর গ্রীষ্মের উত্তাপে শরীর উত্তপ্ত হওয়ায় বিশ্বজননী আমাদিগকে বর্ষার জলে স্নান করাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তখন বর্ষার উপকরণ তাল, তেঁতুল, নানান ফল, নূতন ধান, নূতন ধানের সুস্বাদু অন্ন, উচ্ছে, পটল, সুপারি, নারিকেল ইত্যাদি দিয়া আমাদের সকল অভাব পূরণ করিয়া দেন।

দেখিতে দেখিতে শরৎকাল কমনীয় বেশে উপস্থিত। কি সুন্দর সময়! আকাশ নির্মল, পথে ঘাটে জল নাই। জগৎ-জননী বিশ্বের যাবতীয় আবর্জনা বর্ষার জলপ্লাবনে ধৌতকরতঃ শস্যক্ষেত্রের উপকারের জন্য পলি পত্তন করিয়া বিশ্বকে সুন্দর করিয়া দিলেন। বঙ্গদেশের অনেকে শারদীয়া উৎসবে মগ্ন হইলেন।

তাহার পরক্ষণে হেমন্তকালে আমাদের জঠরাগ্নি নিবৃত্তির জন্য প্রচুর হৈমন্তিক ধান্য দিয়া আমাদের সম্বৎসরের খাদ্যের অভাব পূর্ণ করিয়া দিলেন।

তাহার পর-পরই বহুদিনের তাপিত শরীরকে শীতের সুশীতল হাওয়ায় শীতল করিবার জন্য শীত ঋতু আনিয়া দিলেন। তখন সূর্যের কিরণ স্নিগ্ধ। খাওয়া দাওয়ার সুখ কত। রবি খন্দ, সুমিষ্ট ইক্ষুরস, কপি, শাকসব্জী দিয়া ধরণীকে সাজাইয়া দিলেন। আমরা রৌদ্রে পিঠ দিয়া শীতকালকে সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। পিষ্টকাদি কত দ্রব্য দিয়া রসনা পরিতৃপ্তি করিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই।

শীতে থর থর, শীতেও সন্তুষ্ট নহি দেখিয়া জগৎ-জননী সুন্দর বসন্তকাল আনিয়া দিলেন। একালে তরুলতার নূতন শ্রী বৃদ্ধি, কাননের ফল ও ফুলের শোভা দর্শনীয় ও আকাশ অতি নির্মল। বিল খালের পদ্মফুল, কোকিল প্রভৃতি পাখীর সুললিত গান, এ সকল দেখিলে মনে হয় প্রকৃতি-সুন্দরী সুসজ্জিত হইয়া মহা উৎসবে নিযুক্ত। আমরা এই বসন্তকালের নানা উৎসবে মাতিয়া উঠি। ঘুড়ি ওড়ানো, বনভোজন, বকুলের মালা গাঁথা, দোল উৎসব কতকিছু করিয়া থাকি।

ফুল

জগতে ফুল একটি অতীব আশ্চর্য পদার্থ। প্রতি গাছ মাত্রেরই ফুল হয়। ফুল হইতে ফল হইল ও ফল হইতে তরুলতা শস্যাদির উৎপত্তি দেখিতেছি। ফুল সকলেরই আদরের সামগ্রী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই উদ্ভিদজগতে যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি তাহার অন্তরালে সেই বিশ্ববিধাতা আমাদেরই জন্ম ইহার সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা তাহার দ্বারাই জীবন-ধারণ করি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দে বাস করি। তরুলতা অশেষ কাজে লাগে, ও ফুল শস্যাদি খাইয়া জীবনধারণ করি। জীবাহার (মাংস) করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখি না।

আমি যে ফুলের কথা বলিব। তাহা দেখিবার ও গন্ধ লইবার ফুল। সজিনার ফুল, কুমড়ার ফুল প্রভৃতি অনেক ফুল আমরা খাদ্যের মধ্যেও গণনা করিয়া লইয়াছি। আমরা ঐসব ফুল দেবতার পুজায় লাগাই না। জলে স্থলে সর্বত্রই অশেষ রকমের ফুল দেখিতে পাই। সমুদ্রের মধ্যেও একরূপ ফুল হয়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। আমি বাল্যকালে কাশফুল দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ পাইতাম। জগতে সকল ফুলের মধ্যেই করুণাময় পরমেশ্বরের অপার মহিমা বিরাজ করিতেছে। আমরা একথা মোটেই ভাবি না।

শৈশবকালে আমি খুব ফুল ভালবাসিতাম। শীতকালে গাঁদা, বসন্ত কালের গোলাপ, বেল, গন্ধরাজ, চাঁপা ইত্যাদি, গ্রীষ্মকালের স্থলপদ্ম, জল-পদ্ম, রজনীগন্ধা, সর্বরকমের জবা, করবী প্রভৃতি পাড়াগেঁয়ে ফুলগুলির সহিত আমার সম্বন্ধ। এই সকল ফুল পুজায় লাগে। তাছাড়া অনেক ফুল আছে। যথা, মাদারের ফুল, কলমী ফুল, ঢেঁপের ফুল, মোরগ ফুল, রাধার পাশে বাঁকা, বর্ষাকালে দোপাটি প্রভৃতি আদৌ পুজায় লাগে না। ফুলের আবার উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণী ইতর-বিশেষ রকমের জাতি-ভেদ আছে। মোরগ ফুল, হিন্দুর বাড়ীতে নিষিদ্ধ। তাহা মুসলমানী ফুল। এই সকল জাতিভেদ বাল্যকালেই শুনিয়া শিখিয়াছিলাম।

গোলাপ, গন্ধরাজ, বেলফুল প্রভৃতির আমি ভক্ত ছিলাম। এই সকল

ফুলের সুগন্ধ গ্রহণকালে প্রাণের মধ্যে যে এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইত তাহা কথায় বলা যায় না। ফুল আহরণ ব্যাপারে মানুষে আর কিছু দেখে না ও ভাবে না। ফুলের সাজিতে ফুল সাজাইয়া পুরোহিত তাহা পুজায় লাগান। তৎপরে ঐ ফুলে কোন কাজ হয় না। তাহা জলে ফেলিয়া দিতে হয়।

জবা ফুল সাদা ও খুব লাল, সবরকমের আছে। বাল্যকালে সূর্যমুখী ফুল পাইবার জন্য ব্যাকুল হইতাম, ইহার বীচি ছড়াইয়া গাছ বানাইয়া ফুল ফুটাইয়া দেখিতাম। ঐ ফুল কোন পুজায় লাগে না। গোলাপের কথা, আর কি বলিব? আঘ্রাণ করিলে এক মহা ভাব আসে। সেই মহাভাব ভগবানের সাক্ষাৎ ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি গোলাপের কলম লাগাইয়া গোলাপ জন্মাইতাম। জলপদ্ম পাইলে মনটা আহ্লাদে আটখানা হইয়া যাইত। কৃষ্ণচূড়া অশোক আমাদের গ্রামে আগে ছিল না। অন্য গ্রাম হইতে তাহার চারা ও বেছন (বীজ) আনিতে চেষ্টা করি, কিন্তু কৃতকার্য হই নাই। স্থলপদ্ম ফুলের গাছ ভালে হয়। একদিন ইস্কুল হইতে আসিবার সময় এক বাড়ীর একটি ফুলগাছের ডাল না বলিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম। চাহিলে দিত না। এক সাহেবের বাগানে নানা ফুলের গাছ বাহির হইতে দেখিয়া তৃপ্তিবোধ করিতাম। ফুল অন্যের বাগানে থাকিয়াও নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে। এখন সংসারী হইয়া মনে আর ফুলের স্থান নাই।

আমার বাড়ীতে একটি কামিনী ফুলের গাছ এখনও আছে। স্থানাভাব হইলে তাহাকেও উঠিতে হইবে। হাসনাহানাকে বহুদিন হইল বাড়ীছাড়া করিয়াছি। এ সকল ছাড়া অন্যান্য রকমারী আরও অনেক ফুল আছে, লোকেরা তাহার আদর ও অনুসন্ধান করে না। কলমীর ফুল মাঠে বর্ষান্তে ফুটিয়া শোভা বিস্তার করে। আহা! সে শোভা কত মধুর! প্রাণ ভরিয়া তাহা দেখিয়া কত আনন্দ পাইয়াছি তাহা এখনও কিছুকিছু মনে পড়ে।

এখন সেভাবের অভাব দেখিয়া আমার ভয়ানক আশঙ্কা হইয়াছে ও সেই সঙ্গেসঙ্গে হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের অভাব হইয়াছে সন্দেহ নাই। এখন বড়ই সংসারী হইয়া ফুলছাড়া হইয়া বেদনার মধ্যে দিনরাত কাটাইতেছি।

মৌনীবাবা

বৈষ্ণব গ্রন্থে 'সাধু' শব্দের ব্যাখ্যা এই—'যাহার কাছে বসিলে প্রাণ শীতল ও প্রসন্ন হয়, সংসর্গে আসিলে শুদ্ধ ভাবের উদ্রেক হয় তিনিই সাধু'। ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসী বাবাজীকেও আমরা সাধু বলি। ইহা ছাড়া অনেক ভালমানুষকে, আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থবাস নিষ্ঠাবৃত্তি তপ জপ দান ইত্যাদির লক্ষণ দেখিলে বাস্তবিক ভক্তি করিয়া থাকি ও কখন কখন এরূপ মানুষকে ঋষি ব্রহ্মর্ষি মহর্ষি প্রভৃতি উপাধি দিতেও কুণ্ঠিত হই না।

তবে আমাদের এই সত্যযুগের সাধু মুনি বা ঋষিদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের মত কেহ হইতে পারেন বলিয়া ধারণা করিতে পারি না। তাঁহারা গিরিগহ্বরে দিনরাত্রি তপস্যা করিতেন। নির্জন অরণ্যে পর্ণ-কুটিরে বাস করিতেন। ফলমূল ভক্ষণে জীবনধারণ করিতেন। ক্ষৌরকার্য রহিত সুদীর্ঘ শুভ্র দাড়ি চুল রাখিতেন। স্থূলকায় ছিলেন না। তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন। পুরাণাদিতে তাঁহাদের সম্বন্ধে যাহা পাঠ করা যায় তাহাতে তাঁহারা মহা তেজস্বী ছিলেন, কোপান্বিত হইলে অভিসম্পাত দ্বারা মানুষকে ভস্মীভূত করিতে সক্ষম ছিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ জনৈক মুনির অভিসম্পাতে সর্পদংশনে নিহত হয়েন। কোনরূপে রক্ষা পান নাই। কোন কোন ঋষি খুব রাগী ছিলেন। কোন কোন ঋষি আবার আমাদের মত দার পরিগ্রহ করিতেন, সন্তান সন্ততি হইত। চাষকর্মও করিতেন। জাতিভেদ মানিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে অসবর্ণের পরিণয় প্রচলিত ছিল। এরূপ ঋষিগণের সহিত আমাদের বিশুদ্ধ চরিত্রের ব্রাহ্মদের সঙ্গে অনেকটা মিল দেখিতে পাই।

বাস্তবিক, ঋষিগণ যদি বনে জঙ্গলে থাকিয়া ফলমূল খাইয়া তপস্যা করিয়া অন্তরে ঈশ্বর দর্শন লাভ করিয়া দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা জগতের কার্য কী হইল? তবে যদি তাঁহারা জড় জগতের হিসাবে—বহির্জগতের কার্যাদি না করিয়াও আধ্যাত্মিক জগতে

মানবের হিতার্থ তাঁহাদের তপস্যা-লব্ধ জীবনের কার্যাদি লিখিয়া যান তবে তো যথেষ্ট হিতসাধন হইল। ব্রাহ্মসমাজ চাহেন কর্মীসাধু। সেইজন্য মৌনীবাবার কথা বলিতেছি।

ইনি কর্মী কি নিষ্কর্মী ইহাই ভাবিবার কথা। মৌনীবাবার কথা 'নদীয়া কাহিনী'তে যাহা লিখিত আছে তাহা ভ্রমসংকুল। ইনি জাতিতে গোপনি ছলে। ইঁহার মাতুল আড়ুদিয়ার দ্বারিকানাথ ঘোষ, শ্রীনাথ ঘোষ খুব ধনী ছিলেন। ইঁহার পিতা শিবনাথ উক্ত ধনীর ঘরে বিবাহ করিয়া স্বপরিবারে শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন। সেইখানে প্যারীলাল, কুঞ্জলাল পুত্রদ্বয় ও কামিনী, কুমুদিনী, কাদম্বিনী কন্যাসকল জন্মগ্রহণ করেন। নদীয়া জেলার কুমারখালি থানায় উক্ত আড়ুদিয়ার বাড়ি পদ্মার ভাঙনে ভাঙিয়া গেলে সেনগ্রামের সংলগ্ন কঠগজরা গ্রামে শ্রীনাথবাবু নূতন বাড়ি করেন। শিবনাথ তাহার আগেই গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া ধর্মানুরাগে নিরুদ্দেশ হয়েন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সর্বদাই মালাজপ করিতেন। ইহার স্ত্রীও পরম সাধ্বী ও ধর্মমতী। তিনি এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার বয়স এখন ৯০ বৎসর।

প্যারীলাল আমার বাল্যবন্ধু ও সহাধ্যায়ী ও সমবয়স্ক ছিল। আমরা উভয়ে বাল্যকালে হাবাসপুরে মহারাণী স্বর্ণময়ীর অবৈতনিক বিদ্যালয়ে একশ্রেণীতে পড়িয়া ১৮৭২ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হই। প্যারীলাল মাসিক চারটাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া পাবনা হাইস্কুলে ভর্তি হয়। ঐ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ হয়। ঐ স্কুলে পঠনকালে ঐ স্কুলের শিক্ষক ব্রাহ্ম কালিপ্রসন্ন বসুর নিকট ব্রাহ্মধর্মের কথা শুনিয়া প্যারীলাল ঐদিকে আকৃষ্ট হয়। নিজে, ভ্রাতা কুঞ্জলাল, ভগিনী কুমুদিনীও আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্মের কথা বুঝাইয়া দিয়া তাহার মতাবলম্বী করিতে অনেক চেষ্টা করে ও অনেকটা কৃতকার্যও হয়। কুঞ্জলাল ও কুমুদিনী কলিকাতায় ব্রাহ্মদিগের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া তথা হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করে। ইঁহারা ব্রাহ্মধর্ম যাপন করিতেছেন।

প্যারীলালের বিবাহ পূর্বে হিন্দুমতে এক গোপকন্যার সহিত সম্পন্ন হয় এবং মাখন নাম্নী একটি কন্যা হয়। প্যারীলাল ব্রাহ্মসমাজে থাকিতেই তৎকালীন ব্রাহ্মপ্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দলের সহিত মিলিত হইয়া যোগাদি অভ্যাস করেন। পরে নলহাটিতে কার্যপোলক্ষে বাস

করা-কালে একদিন হঠাৎ ভাই ভগিনী মাতাপিতা আত্মীয়স্বজন সকলকে ছাড়িয়া গৃহত্যাগ করেন। তাঁহার স্ত্রী কলেরা রোগে মারা যান।

প্যারীলাল নলহাটি হইতে প্রত্যূষে চলিয়া যাওয়ার কালে, জনৈকা মেথরানীকে দেখিয়া সসম্মানে প্রণাম করিয়া বলে, মা আপনি আমার দ্বিতীয়া জননী। আমি যখন শিশু অশক্ত ছিলাম, তখন মা আমার মলমূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন। আর আপনি তাঁহার অপেক্ষাও বেশী দয়াবতী ও হৃদয়বতী। কারণ এখন যাহারা নিজেরাই নিজেদের মলমূত্র পরিস্কার করিতে পারে, অথচ করে না, আপনি পরম কৃপাবতী হইয়া তাহাদিগকে স্বীয় পুত্রের লালনপালন করিতেছেন। আপনি আশীর্বাদ করুন আমি যেন দয়াময়কে লাভ করিতে পারি।

প্যারীলাল সঙ্গে গীতা, বাইবেল ও ব্রহ্মসঙ্গীত লইয়া ঈশ্বরের নাম করিয়া রওনা হইলেন। সঙ্গে পরণের ধুতি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন সম্বল না লইয়া ওঙ্কারনাথ পাহাড়ে একটি ক্ষুদ্র গুহায় আশ্রয় লইলেন। সেখানে মৌনব্রত অবলম্বনে গাছের পাতা খাইয়া থাকিতেন। কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না।

সে পাহাড়ে ভস্মমাখা বহুদিনের পশ্চিমের অনেক সাধু সন্ন্যাসী আছেন। তাঁহারা রুটি খাইয়া থাকেন। চাহিয়া লওয়ায় তাঁহাদের নিষেধ নাই। প্যারীলাল মৌনব্রত লইয়াছেন, কথা কহেন না। তাঁহাকে সকলেই মৌনীবাবা বলিত। সেখানকার সাধু-সন্ন্যাসীগণ এই মৌনীবাবাকে অনশনে মৌন হইয়া তপস্যায় রত থাকিতে দেখিয়া অবাক হইতেন। সময়-সময় নিজেদের রুটির কিয়দংশ এই মৌনীর নিকট রাখিয়া আসিতেন ও তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন।

একদিন একটি ধনী ব্যবসায়ী ইঁহাকে দেখিয়া কার্যে যাওয়া কালে কিছু জল ও কাঁচা দুধ দিয়া যান। সে যাত্রায় তাঁহার ব্যবসায়ে খুব লাভ হয় ও তাহা এই মৌনী সাধুর আশীর্বাদে হইয়াছে ভাবিয়া মধ্যেমধ্যে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া যাইতেন। মৌনী ইহা ঘোর বাধা জঞ্জাল মনে করিয়া সেস্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যান। পরে ঐ পাহাড়ে আর একদিন ঐ ধনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। সেদিন ধনী খাওয়াইতে চাহিলে ইনি খিচুড়ী খাইতে চাহেন। তখন মৌনীযোগের অবসান হইয়াছে।

ধনী খিচুড়ীর আয়োজন করিলেন। এবং সেইদিনই সাধু মৌনীবাবা

খিচুড়ী খাইতে খাইতে দেহত্যাগ করেন। সেইস্থানে ঐ ধনী একটি পাকা মন্দির করিয়া দিয়াছেন ও বহু ব্যয় করিয়া মহোৎসব করিয়াছিলেন।

মৌনীবাবার তপস্থার সময়ে ভাই ভগিনী আত্মীয়স্বজনকে চিঠিপত্র লিখিতে নিষেধ করিতেন। কারণ তাহাতে তাঁহার মন বিচলিত হইত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আদিনাথবাবু একবার ওঙ্কারনাথে গিয়া সাক্ষাৎ করেন ও শ্লেটে প্রশ্ন লিখিয়া ও তাহাতে উত্তর লইয়া অনেক আলোচনা করেন। পাহাড়ে এরূপ নিষ্কর্মী হইয়া জীবনযাপন ব্রাহ্মধর্মের অনুমদিত নহে, এইরূপ সমালোচনা পুস্তিকায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্প্রতি নবদ্বীপে একটি মৌনী সাধুকে দেখিয়াছিলাম। সে কিছু করিত না। তাহার দেহাবসানে একটি মাটির সাধু প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। আমাদের প্যারীলাল একটি মৌনীবাবা বটে। একটি মহাপুরুষ সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার তপস্যার ফলাফল কিছু ইজানিবার উপায় রাখিয়া গেলেন না।

ধর্ম বিশ্বাস

প্রকৃত ধর্মতত্ত্বে হিন্দু ও মুসলমান একশ্রেণীর মানুষ। ধর্মের মূল ভিত্তি একই। তথাপি বিশ্বাস ও প্রণালী অনুসারে ভিন্ন পথের পথিক মাত্র, তবে গন্তব্য স্থান এক। যাহা হউক ধর্মবিশ্বাস বাইরের জিনিস নহে, অন্তরের জিনিস। হিন্দু মুসলমান সকলেই অন্তরের অন্তঃস্থলে পোষণ করিয়া থাকেন। তাহার বিরুদ্ধাচরণ হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই অসহনীয়। এক জাতি অপর জাতিকে তাহার ইচ্ছা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করা অতীব গর্হিত কার্য সন্দেহ নাই। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট খ্রীষ্টধর্মে নিষ্ঠাবান হইয়াও আশ্রিত হিন্দু-মুসলমানকে জোর করিয়া খ্রীষ্টান করেন না বা কাহারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করেন না। ইহাই সভ্যতা।

ভয়ানক সমস্যা

বঙ্গদেশে বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইস্কুল কলেজের সংখ্যা দিনদিন বাড়িতেছে। অন্যান্য ভ ষার তুলনায় বঙ্গভাষা বড়ই দরিদ্র। সংস্কৃত-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও উত্তরাধিকারিত্ব ইহার অনুকূলে কি বর্তিয়াছে? তাই বড় অভাবী। মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি সকল জাতির নিকটই কিছুকিছু লইয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইহা অর্থকরী করিবার জন্য বঙ্গসন্তান বিশেষ যত্নশীল ছিলেন না। তাই দেশের বহু মান্য ব্যক্তিগণ সভাসমিতি করিয়া বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এটি ভাল কথা।

ইংরাজী ভাষা শিখিবার জন্য দেশের লোক পাগল। ইংরাজী সাহিত্য ভাণ্ডারে বিপুল রত্ন থাকিলেও তাহার জন্য কয়জন ব্যাকুল? এই ভাষা-শিক্ষা জীবনধারণের প্রশস্ত পথ জানিয়া সকলেই ইহার জন্য ব্যতিব্যস্ত। নতুবা এবিষয়ে ভাবিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না।

এখন সম্মুখে মহা সমস্যা। সংসারে গ্রাসাচ্ছাদন, কথাটি বড় কথা, বড় সমস্যা। ইহার জন্য এতদিন যে শিক্ষা প্রচলিত তাহা ক্রমে রহিত হইতেছে। কাপড়ের জন্য তুলার চাষ, চরকার সুতা ও তাঁতের প্রয়োজন। তজ্জন্য তুলার চাষ করিবার চাষী ছিল। সুতা ও কাপড়ের জন্য গৃহস্থের চরকা ও জোলার তাঁত ছিল। এখন চাষীরা তুলার চাষ ছাড়িয়াছে, গৃহস্থেরা চরকা ছাড়িয়াছে, জোলা কাপড় বুনন ছাড়িয়াছে। এখন বিদেশ ভরসা। কৃষিকার্যের জন্য লৌহকার, সূত্রধারের সাহায্য ও চাষীর প্রয়োজন। লৌহকার সূত্রধার ও চাষী সকলের সন্তান আজকাল জাতীয় ব্যবসা ছাড়িয়া লেখাপড়া শিখিতেছে। সে তো ভাল কথা। কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়া তাহারা কি পরে তাহাদের জাতীয় ব্যবসায় হাত দিবে? তাহা না হইলে সম্মুখে ভয়ানক সমস্যা।

('বার্তাবহ' সম্পাদককে লিখিত।
কুষ্টিয়া ২৯।১।১৯১৭)

বাঙালীর হুজুক

বাঙালী জাহান্নমে গিয়াছে। বাঙালীর মুখসর্বস্ব, কাজে কিছুই নহে, কিন্তু লিখিতে পড়িতে বলিতে সুদক্ষ। এ কথাটি সত্য কিনা আপনারাই ভাবিয়া দেখুন। বাঙালীর পূর্বতন আচার্য ঋষিগণ ধর্মকর্ম সকল বিষয়েই শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। পূর্বে চিকিৎসা, সাহিত্য, যুদ্ধবিদ্যা কোন বিষয়েই কাহারও অপেক্ষা কম ছিলেন না—এই বলিয়াই বাঙালী বক্ষ ফুলাইয়া চলেন, কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

এই সেদিন, বহুদিনের কথা নহে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেক কায়স্থ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সভাসমিতি করিয়া বঙ্গীয় রাঢ়ী বরেন্দ্র কুলীন মৌলিক সকল শ্রেণীর কায়স্থগণের সহিত বিবাহ ও সামাজিক বন্ধনে একীকরণের প্রস্তাব লিখিত হইল এবং জনক-ঋষি প্রভৃতি আর্যগণের অনুকরণে যাহাতে চলিতে পারেন তাহাও স্থিরীকৃত হইয়া গেল। শুধু তাহাই নহে, নড়াইলে গণ্যমান্য বড়লোক, এদেশের অনেক জমিদার, কায়স্থ সমাজের নেতাগণ লাঙল ধরিয়া কায়স্থগণকে হলকর্ষণের পথ প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু দেখিতেছি কায়স্থ সন্তানদের সেদিকে মন নাই। কেহবা কিছু বেশি লেখাপড়া শিখিতেছে, নিষ্কর্মা অবস্থায় বাটীতে বসিয়া মামলা মকর্দমায় মাতিতেছে, কেহবা বৃথা দলাদলি করিতেছে। কৃষিজীবি শিল্পজীবিদিগের অর্জিত অর্থ কুসীদ বা অন্য কৌশলে বাধিত করিয়া নিজের উদর পোষণ ও বাবুগিরি করিতেছে।

কাহারও চাষবাসের দিকে মনোযোগ নাই। সব ভুলিয়া গিয়াছে। চাষ-কার্যটা এমনি ঘৃণিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, 'চাষা' কথাটা একটা গালাগালির মধ্যে গণ্য হইয়াছে। মুসলমান, কুড়ি, কৈবর্ত প্রভৃতি শ্রেণীর নিরক্ষর লোকেদের মধ্যে চাষকর্ম নিবদ্ধ রহিয়াছে। আবার তাহাদের মধ্যেও যদি কেহ লেখাপড়া শিখিল, অমনি সে আর চাষ করিতে গেল না। কি জানি, কি এক বহুকালীয় বাধা ও প্রথা তাহাদিগকে এই কাজ করিতে দিল না।

আমার মনে পড়িতেছে, আমাদের গ্রামের যদু বিশ্বাস সামান্ত লেখাপড়া শিখিয়াছিল। দরকারমত খাতা ও হিসাব লিখিয়া অতি কষ্টে দিন গুজরাইত, কিন্তু জমিজমা থাকিতেও লাঙল ধরিতে পারিত না। বর্গা দিয়া যাইত। আমাদের দেশেও এইরূপ কিছুকিছু লেখাপড়া জানার দল চাষী শ্রেণী ও কায়স্থ শ্রেণীর মধ্যে অনেক আছে। তাহারা দেশবিদেশে চাকরী করিতেছে এবং চাকরী না পাইয়া নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া আছে ও নানা খারাপ উপায়ে উদরান্নের সংস্থান করিতেছে। এরূপ চলিলে আমাদের দেশের অবস্থা ভবিষ্যতে কি হইবে ?

দলাদলি

সকল দেশেই চিরকাল এই অপ্রেমের দলাদলি চলিয়া আসিতেছে। এই দলাদলির মধ্যেও অন্য দেশ ও জাতির বিশেষ মিলনের ভাব দেখিতে পাই। হতভাগ্য বঙ্গদেশের দলাদলি স্বতন্ত্র রকমের। এত ভেদাভেদ এত দলাদলি আর কোথাও নাই। এই দলাদলির মূলে অপ্রেম ও ধর্মহীনতা। আমি ছোটবেলায় গ্রামেগ্রামে এবং এক গ্রামের সঙ্গে আর এক গ্রামের দলাদলি দেখিয়াছি। আমবেড়িয়ার দল, সেনগ্রামের দলকে ভালবাসিত। অথচ সেনগ্রামের লোক ত্রুটি করিলে আমবেড়িয়ার লোক দ্বিগুণ আক্রোশে প্রতিশোধ লইত। ঘরেঘরে দলাদলিও দেখিয়াছি। এ দলাদলিতে দেশ ছারখারে গিয়াছে, অনেক সময় খুবই বিপদ ও সর্বনাশ ইত্যাদি হইয়াছে। দলাদলিতে রামচন্দ্রের বনবাস, কুরুপাণ্ডবের লড়াই, ট্রয় ধ্বংস ইত্যাদি পুরাণে পাওয়া যায়। আমাদের গ্রামের দলাদলি বিষময় ফল প্রসব করিয়াছে। কাহারও সাথে কাহারও মিল নাই।

ইহা অন্যায়।

বাঙালীর ভাগ্য

নীল কুঠিয়াল আমলে গরীব বাঙালীর ভাগ্যে যত নির্যাতন হইয়াছিল, তাহা যাহারা ভোগ করিয়া ইহধাম ছাড়িয়া গিয়াছে তাহারাই জানে আর ভগবান জানেন। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে' তাহার কতক দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বাড়ির নিকট খোবড়াকোল কুঠির আমলে প্রজাগণ কত লাঞ্ছনা কত কষ্ট সহ্য করিয়াছে তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। বাঙালীর ভাগ্যে এ দুর্দশা নুতন নহে। সেকাল হইতে আজ পর্যন্ত উহা চলিয়া আসিতেছে ও তাহার অনেক ঘৃণ্য ইতিহাস আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার কিছুকিছু বলিব মনে করিয়াছি। সেকালের সেইসব কাহিনী জানিয়া রাখা দরকার। এবং যাহারা সেসব ঘটনার বিষময় ফল ভোগ করিয়াছে, তাহাদের ভাগ্য ভাবিতেও কষ্ট হয়।

বাঙালী চিরকালই নিরীহ প্রকৃতির লোক। এই ভারতের রামায়ণ, মহাভারত ও ইতিহাসে বহু ঘটনা পাঠ করিয়াছি কিন্তু তাহার অনেক স্থল বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমাদের ধর্মগ্রন্থ রামায়ণে রামের বনবাস, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণের শক্তিশেল প্রভৃতি ও মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাণ্ডবদের নির্বাসন ও অজ্ঞাতবাস প্রভৃতি ঘটনা দেব-দেবতার কাণ্ডকারখানা বলিয়া মাথায় করিয়া লইয়াছি। তাহার পর বাঙালীর আরও যেসকল ঘটনা পাঠ করিয়াছি ও হৃদয়ে নির্যাতনের কালিমা রেখা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি তাহা মুছিবার নহে।

হিন্দু রাজা আদিস্থরের পর পালবংশীয় রাজাগণ নদীয়ায় রাজত্ব স্থাপন করেন। হিন্দুরাজ সামন্ত সেন নদীয়ার নিকট গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। বিজয়সেন তাহার পৌত্র, বল্লালসেন তাহার প্রপৌত্র। বল্লাল-দীঘি এখনও বর্তমান। বল্লালের শেষ পুত্র লক্ষ্মণসেন। লক্ষ্মণ পণ্ডিতআদি লইয়া নির্বিবাদে বসবাস করিতেছিলেন। কোন অপরাধে অপরাধী ছিলেন না। বিধাতার কি ইচ্ছা জানি না, দুরন্ত মুসলমান আততায়ীর হস্তে তাঁহারই আমলে বঙ্গের হিন্দু রাজত্বের অবসান হইল। নদীয়াবাসী

ব্রাহ্মণগণ ও অন্ত্যজ সকলকে যে কত নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

তাহার পর মুসলমান আমলে প্রজাদের কথা। তৎকালীন জমিদার মহাশয়গণ যে অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত ইতিহাস না বলাই ভাল। 'নদীয়া কাহিনী' পাঠ করিয়া জানিতে পাই, রাজস্ব আদায়ের ক্রটিতে নদীয়ার রাজার জমিদারী অনেক সময় খাস করা হইয়াছে এবং রাজাকে অনেক সময় কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছে।

১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ খুব বেশী দিনের কথা নহে। বঙ্গেশ্বর শের্সাহ জমিদারদিগকে যে লাঞ্ছনা করিয়াছেন তাহা অমানুষিক অত্যাচার। তিনি বড়ই হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন। হিন্দু প্রজারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর দিতে না পারিলে মুসলমান শাসনকর্তা তাহাদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করিবার আইন করিয়া দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য হিন্দুগণ করদানে অশক্ত হইয়া স্বীয় মুখ ব্যাদান করিয়া মুসলমান কর-সংগ্রাহকের থুথু খাইতে হইত। কি ভয়ানক কথা!

বাদশাজাদা আজিম ওসমানের আমলে করদানে সুব্যবস্থার জন্য মূত্রকুণ্ড বা মূত্রকুপ সৃষ্টির কথা যাহা শুনা যায় তাহাও ততোধিক ভয়ানক। ঐ মূত্রকুণ্ডের নাম রাখা হইয়াছিল 'বৈকুণ্ঠ'। করদানে অশক্ত হিন্দুগণকে ঐ মূত্রকুপে ডুবিয়া থাকিবার দণ্ড-ব্যবস্থা ছিল। ইহাদের রাজত্বে মানুষ মানুষের হাতে এত অত্যাচারও সহ্য করিয়াছে। অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণকে দায় ঠেকিয়া মুসলমান হইতে হইয়াছে।

সমুদ্রগড়ের রাজা কর দিতে অশক্ত হইয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিবিবাজারে উঁহাদের বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছেন। উঁহারা দুর্গোৎসব ও মহরম উভয় ধর্মোৎসব পালন করিয়া থাকেন। একজন ব্রাহ্মণ মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া মহম্মদ তাহের নাম গ্রহণ করিয়া পরে হিন্দুগণকে মুসলমান করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন। ইহারই আমলে কামদেব ও জয়দেব রায়চৌধুরী ব্রাহ্মণদ্বয় বাধ্য হইয়া মুসলমান হয়েন। ইঁহাদের বংশধরগণ এইরূপে শ্রোত্রীয় হইতে পিরালী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে বিশেষ দায়ে পড়িয়া যান। এইরূপ অনেক মুসলমান-কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত।

আমাদেরই নদীয়াবাসী কায়স্থ কাশীনাথ রায় ১৫৭৫ সালে আকবর বাদশার আমলে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া 'সমরসিংহ' উপাধি ও বাদশাহী ঝাণ্ডা, নগদ টাকা ও পালকী হাতী ঘোড়ার দ্বারা গৌরবান্বিত হন। পরে চক্রান্তে তাঁহার শিরঃচ্ছেদন করা হয়।

বারোভুঁইঞার মধ্যে কায়স্থ কুলোদ্ভব প্রতাপাদিত্যের কম পরাক্রম ছিল না। নদীয়ার দেবগ্রামের দেবপাল প্রবল পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি নাকি এক সন্ধ্যায় পরশপাথর পাইয়া ধনী হইয়াছিলেন। বাঙলার নবাব তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া বাদশাহের নিকট অভিযোগ করেন। বাঙলাদেশে বিশ্বাসঘাতকতার দোষেই সব মাটি হইল। ঘর-সন্ধানী বিভীষণ না থাকিলে আমাদের এত দুর্দশা হইত না।

ইংরাজ রাজত্বের আমলে করাদায়ের জন্য মুখের নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ ও জোরপূর্বক মুসলমানধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা, এ সকল অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু নানা প্রকারে আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের যে দুরবস্থা হইয়াছে তাহার কোনই প্রতিকার হইল না। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য উত্তরোত্তর বহু পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মন চাউল পাওয়া যাইত, তাহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারে না। আমাদের আমলেই ঘৃতের সের ৷৹ (আট আনা), তেল তিন আনা, ধান টাকায় ২০ কাঠা, গুড় তিন টাকা মন খরিদ-বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। তরিতরকারী প্রায় কেহই কিনিত না। তখন পটলের সের ২ পয়সা, বেগুন ১ পয়সা, এখন অনেক গুণ বাড়িয়াছে। কিন্তু আয়ের পথ রুদ্ধ। বাঙালী চাকরীর প্রত্যাশায় দ্বারেদ্বারে উপনীত। দুর্দশার একশেষ। আমার ন্যায় বই-মুখস্থ বিদ্যা ও লেখনী চালাইয়া, রচনা লিখিয়া, মুখ চালনা করিয়া আর চলে না। আসল কাজ চাই।

সেকালে যাহা ছিল না, বাঙালীর ভাগ্যে সেই নূতন ধরণের দুর্দশা উপস্থিত। আগে ম্যালেরিয়া ছিল না। আমাদেরই আমলে গত ৫০ বৎসরের মধ্যে ইহার আমদানী হইয়াছে। প্লেগ, কালাজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা নামটিও কেহ জানিত না। এখন এই সকল নূতন ব্যাধিতে দেশ উচ্ছন্নে যাইতেছে। সেকালে পানীয় জলের এত অভাব ছিল না। এখনই খাল, বিল, নদী, নালা শুকাইয়া জলের বিশেষ অভাব দেখা যাইতেছে।

সেকালে এক রকমের দস্যু ও ডাকাত ছিল। তাহারা রিভলবার

লইয়া ডাকাতি করিত না। সেকালে নদীয়া জেলার দস্যুদিগের মধ্যে বিশ্বনাথবাবু (বিশে ডাকাত) ডাকাতের সর্দ্দার ছিল। রনপা বা দীর্ঘ বংশ-যষ্টিতে ভর দিয়া ঐসব ডাকাত একরাত্রে বিশ ক্রোশ যাইতে পারিত। উহারা কখনও স্ত্রীলোক ও গরীবদের প্রতি অত্যাচার করিত না।

বিশ্বনাথ ক্যাডি সাহেবের কুঠি আক্রমণ করে। সাহেবের পত্নী পুকুরে ডুব দিয়া আত্মরক্ষা করে। সাহেব ধৃত হয়। দস্যুদল তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে বিশ্বনাথ রক্ষা করে। সেই ক্যাডি যতদিন বাঁচিবে বিশ্বনাথের অনিষ্ট করিবে না বলিয়া ভগবানের নামে শপথ করিয়া, পরে নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট সমীপে সবিশেষ জ্ঞাত করায় বিশ্বনাথ ধৃত হয় ও সদলে বাঁশবেড়িয়া কুঠির নদীতীরস্থ বটবৃক্ষে তাহার ও তাহার দলের অনেকেরই ফাঁসি হয়।

আর এক রকমের অত্যাচার আছে এবং তাহা বোধহয় চিরকালই থাকিবে। সে অত্যাচার জমিদারের। সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এ সকল ছাড়া প্রকৃতির বিধানে ঝড় ও জলপ্লাবনে বঙ্গবাসীর দুঃখের পরিসীমা ছিল না। সেদিন উত্তরবঙ্গে ভয়ানক জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া মহামারি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। ১৭৭৭ সালের দুর্ভিক্ষে এক তৃতীয়াংশ লোক মারা পড়িয়াছে। তাহাদের অনেকেই মরিয়া পড়িয়া থাকিত। কেহ কাছে আসিত না।

বাঙলাদেশে এই দুর্ভাগ্য চিত্র আমার হৃদয়ে অংকিত হইয়া রহিয়াছে। এ জীবনে এ দুর্দশার উপশমের কোন চিহ্ন দেখিতেছি না।

মারি ভয়

মারি ভয়ের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। ভরসা করি গভর্ণমেণ্ট এবং বণিক সমাজ তাহাতে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিবেন।

জগাই ষ্টেশনের অধীন ও তন্নিকটবর্ত্তী যাত্রাপুর প্রভৃতি স্থানসমূহে যে প্রকার মারি ভয় উপস্থিত হইয়াছে, বোধকরি অনেকেই সে বিষয়ে অনবগত। আমরা প্রামাণিক লোকমুখে শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি, অনেক পরিবার উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এমনকি শব জলে নিক্ষেপ করিবে এরূপ লোকও পাওয়া যায় না। পুর্ব্বে যেখানে দশের জন লোক ছিল, এক্ষণে দু'একজন হয়ত আছে। তাহারাও এখন তখন। ইহাতে কাহার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? উক্ত মারি ভয় জানিয়াও জমিদাররা এ বিষয়ে কেন ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা জানি না। জমিদারদিগের সর্ব্বদা প্রজাপালনই কর্ত্তব্য। প্রজার যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহার অন্যথা করিবেন না, ইহাই আশা করা যায়। প্রতি গ্রামে জমিদাররা এক একটি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিবেন, তাহা হইলেই অনেক কৃপা করা হইল।

দক্ষিণবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত মীর মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের গুণগান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি যথার্থই জমিদার। যে কোন শুভানুষ্ঠান হোক না কেন, তাঁহাকেই আমাদের জমিদারদিগের মধ্যে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। তিনি বিগত রামপুরের প্রদর্শনী ও মেলাতে যত টাকা দিয়াছেন বোধকরি তত টাকা আমাদের এদেশে কেহই দেয় নাই। তিনি আপন ব্যয়ে একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছেন এবং স্বাস্থ্য রক্ষনার্থে একটি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপনের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। বোধকরি প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে।

আমাদিগের এইটুকু বক্তব্য যে, এমত অবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষরা প্রজাহিত-করকার্য্যে বিরত কেন? তাঁহাদিগের এক্ষণে বিলাসনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বকল্যাণ ব্রতে সর্ব্বাগ্রে ব্রতী হওয়া উচিত। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নিকটেও প্রার্থনা নিন্দনীয় নহে। চিকিৎসা ছাড়া মারি নিরাকরণের অন্য উপায় নাই! হুগলী জেলায় মারি ভয় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব দাতব্য ঔষধালয়ের প্রয়োজন। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের টাকার অপচয় হয় না।

জমিদার ও প্রজা

আমরা প্রজাবর্গ সততই দয়ার পাত্র। আমাদের উপরে জমিদার, আমাদের নীচের কেহ নাই। জমিদার রাজাকে রাজস্ব দিয়া ভু-সম্পত্তির মালিক আছেন ও থাকিবেন। জমিদার জমিদারীর ভূমি দান বা বিক্রয় করিতে পারেন, যথেচ্ছা ভোগ দখল করিতে পারেন অর্থাৎ ইহাতে কূপ-খনন, বাগান ও বাটি, ইমারত প্রস্তুত এবং খাসে বা বর্গাবিলিতে আবাদ অথবা প্রজাবিলি করিয়া দখল করিতে পারেন। জমিদারের কোনোরূপ বিপত্তি নাই। এ দেশের জমিদারগণ খাসে আবাদ প্রায়শই করেন না। তাঁহারা প্রজাবিলি করিয়া রাজস্ব বাদে যে মুনাফা পান তাহাই সুপ্রচুর, তাহাতেই সংসারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হইয়াও সঞ্চয় হয়।

ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরের হাতে খান। বেহিসেবী হইয়া অনেকে বাজে (হেজাবেদা) খরচপত্র করিয়া, কেহ বা ভোগবিলাসে অযথা অর্থ ব্যয় করিয়া ঋণদায়ে জমিদারী খোয়াইয়া নিঃস্ব হইয়া পড়েন, ইহা ছাড়া ইঁহাদের অভাব কিসের? ইঁহাদের জমিদারীতে যে আয় হইবার হইয়াছে, আর হইবার আশা নাই। ইঁহারা প্রজার উপর জবরদস্তি করিয়া, কথায় কথায় ধর-পাকড় জরিমানা ও নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছেন। জমিদারের তাবেওয়ালা পেয়াদার রোজ-খোরাকী দিতে দিতেই প্রজাগণের দুঃখের সীমা ছিল না। গভর্ণমেণ্ট আইন করিয়া বিপদগ্রস্থ প্রজাকুলকে অনেক রক্ষা করিয়াছেন। এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে। পদেপদে ধরপাকড় জরিমানা অত্যাচার এখন অনেক কম। অধিক কি, এইরূপ অত্যাচার করিতে থাকিলে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১১০ ধারা প্রযোজ্য। প্রজাদের জমির পরিমাণ না বাড়িলে টাকায় দু'আনা বেশী খাজনা বৃদ্ধি করিবার রোগের মহৌষধ ১৯ ধারা বর্তমান। ২০ বৎসর উপরে হইলে দাখিলা প্রদর্শনের ভীতি জমিদারের স্মরণ রাখিতে হয়। প্রজারা অনুমতি লইয়া বাসা করিতে ও পুকুর কাটিতে পারে। নজর দিয়া নাম খারিজ করিতে পারে, দান বা বিক্রয় করিতে পারে না,

করিলে উচ্ছেদ হয় ইত্যাদি অসুবিধা দূর করিতে গভর্ণমেণ্টের নজর পড়িয়াছে। সবই ভাল কথা। কিন্তু প্রজা বলিতে যে কয় শ্রেণীর প্রজা আছে তাহার সুব্যবস্থা নিরপেক্ষভাবে হয় নাই।

জমিদারের নিকট জমি লইয়া নিজে আবাদ করেন না, খাজনা বিলিতে দখল করেন এই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক প্রজা, জোতদার। আর নিজেরা চাষ করিয়া আবাদকারী প্রজার নাম রায়ত। রায়তের নিকট জমি রাখিলে Under Ryot হয়। রায়ত মাত্রেরই অধীন Under Ryot. আর এক শ্রেণীর আবাদকারী লোক আছে, তাহারা জমিদার কি জোতদারের রায়ত সকলের অধীনেই এই নিয়মে জমি রাখিয়া কর্ষন করে ও শস্য অর্ধেক নিজে পায়, বাকী অর্ধেক উপরোস্থ ভূমির খাজনা হিসেবে দেয়। এবার তাহাদের লইয়া বড়ই আন্দোলন চলিতেছে। শুনিতেছি তাহারা যে জমি চষিবে তাহা তাহাদেরই হইবে। তাহার জন্য কর ধার্য কর'ইয়া লইয়া কর দিবে, আর জমিদারখানার অর্ধেক ফসল দিতে হইবে না।

ইহা কোন দয়ার কথা নহে। যে বুনিবে সেই ফসল পাইবে। যাঁহারা এতদিন কাজ করিতে শেখেন নাই, খাইতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের উপায় কি? তাঁহাদের বসিয়া খাওয়াটা অন্যায় ও তজ্জন্য তাঁহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত দরকার। কিন্তু সবংশে নিপাত করিলে চলিবে কেন? তাঁহারাও তো ঈশ্বরের জীব। রাজার প্রজা বটে। চাকরি বা চাকর রাখিয়া ব্যবসা বাণিজ্যে সুখ সুবিধা নাই। উকিল মোক্তার হাকিমীতেও সুখ নাই। জমিদার হইলে তাঁহাদের জীবন রক্ষা চলিত। মনে করুন, আমি একজন চাকুরিয়া ভদ্রলোক জোতদার। মাসিক ১০ টাকা বেতনে চাকুরি করি। ২০ বিঘা জমি আছে, তাহার খাজনা দেই ও বর্গাবিলি করিয়া অর্ধেক শস্য পাই। তাহাতেই সংসার চলে। আমার ঐ ২০ বিঘার খাজনা ৬০ টাকা হইলেও শস্য বাবদ মাসে ৫ টাকা লাভ হইল। ঐ ৫ টাকায় মাত্র ২০ সের চাউল পাই। ইহা ছাড়া তেল, লঙ্কা, হলুদ, তরিতরকারিও জমি হইতে পাইবার আশা রাখি। অতএব জমি ছাড়া উপায় কি আর?

কুষ্টিয়ার 'জাগরণ' পত্রিকায় লিখিত।

কেনী কাহিনী

টমাস-আই-কেনী সাহেবের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন।

হাবাসপুরের আমার সহাধ্যায়ী ললিত সরকারের নিকট ছোটবেলায় কেনী সাহেবের কথা শুনিতাম। তাহার পিতৃব্য পরমানন্দ সরকার সে সময়ে মানঘর কুঠিতে ঐ সাহেবের আশ্রয়ে ছিলেন। ললিত অনেক কথাচ্ছলে সাহেবের নাম করিত মাত্র। সেও সাহেবের আর কিছু জানিত না।

অনেকগুলি বড় বড় প্রকোষ্ঠযুক্ত চন্দ্রাকৃতি আয়তনের প্রাচীন বিল্ডিংস আজও কুষ্টিয়ার বর্তমান হাইস্কুলের কিছু উত্তর পশ্চিমে বিদ্যমান। তাহাই টমাস-আই-কেনী সাহেবের একটি প্রাচীন কীর্তি। অনুন ৫০টি কামরায় ঐ বিল্ডিং পরিসমাপ্ত। ঘরগুলি প্রশস্ত ও উচ্চ। উত্তর ধারে বারান্দা প্রত্যেক কামরার সঙ্গে সংযুক্ত। এক-একটি বারান্দাযুক্ত কামরায় এক-একটি বড় পরিবার বাস করিতে পারে। কিছুদিন আগে কুষ্টিয়ার দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত উহার এক কামরায় অবস্থিত ছিল। সাব-রেজিষ্টারী অফিস ও হাকিমদেরও অনেক আমলাদের অবস্থান ঐ সকল কুঠরীতে সংকুলান হইত। উহার সম্মুখস্থ উত্তর প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি চাঁদনির বাজার বসিবার বৃহৎ আয়তনের ছাদহীন খোলা বিল্ডিং ছিল।

শুনিতে পাই সাহেব নাকি একটি বড় কারবারের উপযোগী করিয়া ইহার সৌষ্ঠব সাধন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ইহা ছাড়া কেনী সাহেবকৃত ঐ কুঠির সম্মুখে বড় একটি রাস্তাও আছে, উহার নাম কেনী রোড। কেনী বিল্ডিং কুষ্টিয়ার পশ্চিমাংশে বর্তমান। সতীশবাবুর বাড়ী ও কেনী সাহেবের কুঠি, ইহার মধ্যস্থলে প্রাচীন কুষ্টিয়ার রেলষ্টেশন খুবই নিকটে ছিল। এখন সে ষ্টেশনের কিছুই নাই। কেবল পুকুর ও তাহার উত্তর পার্শ্বের একটি একতলা রেলওয়ে অফিসারের বিল্ডিংটি আছে মাত্র।

এখন রেনউইক সাহেবের কুঠি ও কারখানা একটি দেখিবার জিনিস বটে। সেকালে রেনউইক সাহেবের বর্তমানে আখমাড়াই করার কলের

মত কারখানা ছিল না। তাহাতে আখমাড়াই হইত। তাহা না দেখাইয়া দিলে, বুঝান কঠিন। এখন দেশী কলুরা তেল প্রস্তুতকালে যেরূপ কাষ্ঠের গোরগাছা ও জাইট ব্যবহার করে সেইরূপ। তবে এক্ষেত্রে গোরগাছাটি খুব বড় ও জাইট কাঠটি আট হাত দীর্ঘ, তাহার উপর ঠেকা দিয়া রাখিতে হইত। দেশী গৃহস্থেরা বর্তমান কলের কোনো খোঁজ খবর রাখিত না। সে যাহা হউক, সেকালে বড় রকমের কোন কারবারই দেশী লোকেরা করিত না।

দেশী মহাজনের মধ্যে কুমারখালি ও আমলার সাহাবাবুদের এবং আজুদিয়া ঘোষবাবুদের চাউল ও ঘৃতের কারবার ছিল। বড় সায়ার বা নৌকায় (দীর্ঘ ১০০ হাত, প্রস্থে ৩০ হাত) চাউল আমদানি হইত এবং কলিকাতায় নীত হইত। বহুত মাল্লায় ঐ সায়ার পরিচালিত হইত। এখন ষ্টীমার হইয়া সায়ার চলন রহিত হইয়াছে। কোষ্টা-র (পাট) কারবার তখন ছিল না। বড় কারবারের মধ্যে সাহেব কোম্পানীর রেশমের কুঠি ছিল। কুমারখালির রেশমকুঠি খুব প্রসিদ্ধ ছিল। উহার উপর দিয়া রেললাইন পত্তন হওয়ায় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে রেশমকুঠির পুকুর কারখানা ঘরের নমুনা কুমারখালি বাজারের পূর্বদিকে এখনও বর্তমান আছে।

রেশমকুঠি মুর্শিদাবাদ ও মালদহে অনেক ছিল। এ দেশে তখন নীলের আবাদ খুব হইত। কুঠিয়াল সাহেবগণ বঙ্গদেশের অনেক স্থলে নীলকুঠি খুলিয়া দেশটিকে নীলক্ষেত্র করিয়াছিল। বিদেশী সাহেব আসিয়া এ দেশের উপর আধিপত্য করিয়া গিয়াছে। জমিদারগণ জমিদার ছিলেন না। তাহাদের জমিদারী, জোতদারের জোত, পত্তনীদারের পত্তনী সকলই প্রায় নীলকুঠিয়াল সাহেবদের করতলগত হইয়াছিল। সাহেবরা কলে-কৌশলে উহার ইহাজরা (ইজারা) লইয়া নীল আবাদ করিত।

চিরকালই বাঙালী হিন্দু মুসলমান নিরীহ গরীব প্রকৃতির লোক। ইহাদিগকে আয়ত্ব করা কঠিন ছিল না। ইহাদের অগ্রণী মাতব্বরকে সাহেবরা দেওয়ান, নায়েব, আমীন প্রভৃতির চাকরী দিয়া গরীবের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য করিত। গরীব প্রজাদের দাঁড়াইবার স্থান ছিল না। অগ্রণী মাতব্বরেরা সাহেবের লোক, তাহারাই সাহেবের হাতের লাঠি। তাহাদের হাত করিয়া সাহেবরা গরীবদের ভাল ভাল ধানের জমিগুলিতে

নীল বুনিয়া দিয়া লাভবান হইত। আমাদেরই হিন্দু মুসলমান লাঠিয়ালকে নিজ কুঠিতে বহাল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পশ্চাদপদ হইত না। ইহা ছাড়া অনেক কুঠিয়াল সাহেবের আবশ্যক হইলে, এদেশের গরীব অনাথা, অনেক স্ত্রীলোককে কুঠিতে আনিয়া জাতি মারিতেও রেয়াত হইত না।

টমাস-আই-কেনী একজন বড় রকমের কুঠিয়াল ছিলেন। তাঁহার অধীনে বহু কুঠি ছিল। চাপিয়াধননগর প্রভৃতি স্থানে কুঠির তত্বাবধান সাহেব করিতেন। ধোকড়াকোলের ষ্টিফেন সাহেবও কম অত্যাচারী ছিলেন না। মহিষবাথানের দুর্দ্ধর্ষ জমিদার রামকুমার সাহা তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। এই সকল সাহেবরা যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট-গুলি ইঁহাদের করতলগত বন্ধু থাকায় ইঁহাদের প্রতাপের অবধি ছিল না। ধোকড়াকোল কুঠির সাহেবের সহিত আড়ুদিয়ার ঘোষবাবুদের বিবাদ হইয়াছিল। কুঠিয়াল সাহেবগণ অনেক সময় জোর করিয়া নীল বুনিয়া দিতেন। অবশ্য বাঙালী জমিদারগণেরও কয়েকটি কুঠি ছিল। পাটিকা-বাড়ীর কুঠি পাংশার বাবুদের। দোগাছিয়ার জমিদার প্রাণনাথ রায়েরও কুঠি ছিল। সাহেবদের সহিত সখ্যতা করিয়া জমা খরচ হিসাব করিতে না পারিলে জমিদারগণের সহিত লাঠালাঠি আরম্ভ হইত।

কেনী সাহেবের নীলকুঠি বড় ধরণের ছিল। সে ঘরবাড়ীর কোন নমুনা নাই। আছে কেবল সেই আমলের একটি বড় প্রাচীন আমগাছ। যাহাহউক কুঠির অনতিদূরে বাগনারের সিংহবাড়ীর ঈশানচন্দ্রের সহিত সাহেবের সখ্যতা ছিল। প্রজাগণের সহিত সাহেবের বিবাদ বাধিয়া উঠিলে সাহেব এই সিংহবাড়ীর সহায়তা পাইতেন।

মধ্যে সদরপুরের পরীসুন্দরীর সহিত বিবাদ বাধিয়াছিল। সাহেব সদরপুরের জমিদারী ইজারা লইয়াছিলেন। ইজারা পূর্ণ হইলে, সদর-পুরের দেওয়ান রামলোচন তখন আদায় তশীলের কাগজ বুঝিয়া লইতে গিয়াছিলেন। সাহেব পুনঃ ইজারা লইবেন বলিয়া রামলোচনকে বলিলে রামলোচন বলিলেন, যদি অভয় দেন তো বলিতে পারি। কেন আমরা ইজারা দিতে নারাজ, শুনুন। আমরা অন্যের নিকট ইজারা দিলে কান ধরিয়া খাজনা আদায় করিতে পারি, কিন্তু হুজুরের নিকট খাজনার জন্ত হাতজোড় করিয়া থাকিতে হয়। সাহেব এ সময় নাকি বলেন, টাকা দিলে

না হইতে পারে এমন কি কাজ আছে? এই বলিয়া কি একটি অশ্লীল কথা বলেন।

এই কথায় রামলোচন ক্রুদ্ধ হন। দেওয়ান রামলোচন পরীসুন্দরীর হুকুম লইয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বহুসংখ্যক লাঠিয়ালের সেনাপতি সাজিয়া কাশপুর মঙ্গুরার কুঠি আক্রমণ করিলেন। সেদিন সাহেব কুঠিতে ছিলেন না। বিবি খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি টাকাভর্তি বাক্স আনিয়া তাহা খুলিয়া উপর হইতে টাকা ছড়াইতে থাকিলে লাঠিয়ালগণ উহা কুড়াইতে লাগিল। ইতিমধ্যে সাহেবের লাঠিয়ালরা আসিয়া পড়ায় সেদিন আর লড়াই হইল না।

পরে আবার আক্রমণ হইবে বুঝিয়া সাহেব কাছেই পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নিজের কুঠিতে আনিয়া রাখিয়া দিলেন। কুঠির প্রাঙ্গণে বহু লাঠিয়াল জমায়েৎ হইল। মেমসাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্য-ভিক্ষাকাঙ্খিনী হইলে সাহেব তাঁহাকে সাহস দিলেন। অনেককেই গ্রেপ্তার করা হইল। এবং এক দারোগা খুন হইয়া গেল। পরে মোকদ্দমা উঠিলে পরীসুন্দরীকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল এবং সম্পত্তি পত্তনী দিয়া টাকার জোগাড় করিতে হইয়াছিল। এদিকে স্থানীয় প্রজাগণ জোট বাঁধিয়া সাহেবের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। সাহেবের লোক এক মুহুরীকে খুন করে। মুহুরীকে সিংহদের বাড়ীর মধ্যে লইয়া গুম করিয়া রাখে। পরে স্থানীয় প্রজাগণ মুহুরীর আত্মীয় দ্বারা সাহেবের বিরুদ্ধে কেস করে। সাহেব মোকদ্দমায় কোন ফল পান নাই।

এইসব প্রজারা পরে চক্রান্ত করিয়া জকির খানসামাকে বাধ্য করিয়া সাহেবকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার চেষ্টা করে। জকির খাবার ডিশ রাখিবার সময় একটু শব্দ হয়। তাহাতে ঠাকুরটি সাহেবকে বলে, ঢাকা ডিসে কে যেন নাড়া দিয়াছে, শব্দ হইয়াছে। সাহেব সন্দেহ করিয়া উহা না খাইয়া কুকুরকে দেয়। উহা খাইয়া কুকুরটি মারা যায়। জকির পরে মোকদ্দমায় সোপর্দ হইয়া দণ্ডিত হয়।

কিছুদিন পর দেশের লোক নীলকুঠিয়ালদের অত্যাচারে তিষ্ঠিতে না পারায় দেশে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। হিন্দু পেট্রিয়ট এ বিষয়ে উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধাদি লেখেন। দীনবন্ধু মিত্র ইহারই কিছুদিন আগে 'নীলদর্পণ' নাটকটি লেখেন।

দেশের লোক নীলকুঠিয়াল সাহেবদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া যায় এবং সেজন্য ছোট লাটসাহেব তদন্তে আসেন। তিনি প্রজাদের স্বাধীনতা দেন এবং ইচ্ছা না করিলে নীল না বুনিতে পারেন ইত্যাদি সাহস দেন। ইহাতে প্রজারা শান্ত হয়।

দীনপালিনী শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ীকে 'মহারাণী' উপাধি দান

আমরা পরম আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি গত ১৩ই অক্টোবর (১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ) শুক্রবার, আমাদের শিরোনামাঙ্কিত দীনপালিনী রাণী মহোদয়াকে, মান্যবর শ্রীযুত গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের প্রদত্ত 'মহারাণী' উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত কার্যনির্বাহ নিমিত্ত কাশীমবাজারের রাজপ্রাসাদে একটি সভা হয়। উক্ত সভায় বহরমপুর জেলার যাবতীয় গভর্ণমেণ্ট কর্মচারী, অনেকগুলি নীল এবং রেশম কুঠির সাহেব, নিকটবর্ত্তী রাজা, জমিদার, তালুকদার, মহাজন প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। ইহা ব্যতীত কলিকাতা হইতে অনেকগুলি পরিদর্শকও সভার শোভা আরও বৃদ্ধি করেন।

কমিশনার সাহেব রাণীর দানশীলতার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, রাণী স্বর্ণময়ী প্রতি বৎসর ৫০,০০০ সহস্র টাকারও অধিক সাধারণের হিতার্থে দান করিতেন। তাঁহার এই দানশীলতায় গভর্ণমেণ্ট অতি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং কর্তৃপক্ষীয়দিগের ইচ্ছা, তাঁহাকে 'মহারাণী' উপাধি প্রদান করেন। তিনি আরও বলিলেন, এরূপ স্থলে গভর্ণমেণ্ট হইতে একটি সম্মানসূচক পোশাক দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু রাণী অন্তঃপুরবাসিনী বলিয়া তাঁহাকে তাহা প্রদত্ত হয় নাই। সনদখানি পারস্য ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার অর্থ রাণীকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

কমিশনার সাহেব সনদ প্রদান করিলে রাণী অন্তরাল হইতে অদৃশ্য থাকিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন।

এই সময় একটি বাংলা বক্তৃতার দ্বারা কমিশনার বাহাদুর রাণীর গুণরাশি আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন। রাণী তদোত্তরে অতি স্পষ্ট এবং মিষ্টস্বরে বলিলেন, 'আমি আমার দানের নিমিত্ত প্রশংসা বা খ্যাতি চাহি না, কারণ আমি পুরস্কার লইবার আশায় দান করি না। তবে দেশবাসী নারায়ণ, আমাকে উক্ত কার্যে মতি প্রদান করেন, তজ্জন্যই আমি তাহা করিয়া থাকি।' রাণীর এই কথাগুলি সভাস্থ সমস্ত লোকই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

বোধকরি পাঠকগণের মনে আছে দীনপালিনী রাণীর উপাধি দানের বিষয়ে 'গ্রামবার্ত্তা' বলিয়াছিল—'দীনপালিনী রাণী মহোদয়া প্রশংসা বা খ্যাতির লালসায় দান করেন না; কেবল সাধারণের হিত ও দীনের দুঃখ মোচনার্থে দান করিয়া থাকেন। এখানে রাণীও তাহা আপন মুখে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সুবিবেচক ও গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'মহারাণী' উপাধি প্রদান করিয়া সাধারণের সন্তোষ সাধন করিয়াছেন, ইহাতে কিছু মাত্রও সন্দেহ নাই।'

'গ্রামবার্ত্তা' কার্ত্তিক, ১২৭৮ খ্রীঃ, তৃতীয় সপ্তাহ থেকে উদ্ধৃত।

পদ্মানদী

সেনগ্রামের প্রাকৃতিক বিবরণে পদ্মার কীর্তি আমরা কতকটা বর্ণনা করিয়াছি। এখন বিশেষভাবে সেনগ্রাম সংশ্রবে ইহার সম্বন্ধে আরো কিছু বলা কর্তব্য বোধ হইতেছে।

সেনগ্রামের বহু পশ্চিমে কুষ্টিয়া ও পূর্বদিকে হাবাসপুর এই দূরত্ব মধ্যে বিগত ৩০০ বৎসর কালের পদ্মার লীলা খেলা অতীব আশ্চর্যজনক ঘটনা সন্দেহ নাই। কুষ্টিয়ার প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে দোগাছির নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া শিলাইদহের নিকট স্বীয় কন্যা গৌরীর মুখ চুম্বন-করতঃ জগন্নাথপুর দক্ষিণে ফেলিয়া কিয়দ্দূরে সুজানগর সাতবেড়িয়া উত্তরে এবং হাবাসপুর দক্ষিণে রাখিয়া পূর্ব বাহিনী হইয়াছে। ভেণ্ডাবাড়ির নিকট নস্কদিয়ার পার্শ্বে চন্দনা শাখার মুখ এখন বন্ধ।

উল্লিখিত অবস্থায় সেনগ্রামের পশ্চিম-উত্তর ও পূর্ব-উত্তর দিকে অর্থাৎ দয়ারামপুর হইতে হাবাসপুর পর্যন্ত পদ্মার দক্ষিণ তীরে প্রায় তিন ক্রোশ দীর্ঘ ক্রোশাধিক প্রস্থ উত্তরে যে বৃহৎ চরভূমি দেখিতেছি, উহারই উপর ১৮৫৫ সালের পূর্বে আজুদিয়া, কিশামতপাড়া, জালিয়াপাড়া, মাঝপাড়া, আজুদিয়া, জোলাপাড়া, পূর্বপাড়া, দুর্গাপুর আতসর্খাদিয়া, ১৪ পাড়া, দ্বারাটকান্দি, যত্রেরডাঙ্গী, কল্যাণপুর, লক্ষ্মীপুর, ভৈরবডাঙ্গী, আনন্দপাড়া, একবারডাঙ্গী, কীর্তিবাসদিয়া, ভোলাডাঙ্গী, বালিয়াডাঙ্গী, শ্রীকৃষ্ণপুর, নন্দলালপুর, শ্রীকৃষ্ণপুরমলা প্রভৃতি গ্রামগুলি অবস্থিত ছিল। এখন তাহাদের চিহ্নও নাই।

এই তো গেল বর্তমান অবস্থা। এখন দেখা যাউক ১৮৬৭ সালের দিয়াড়া সার্ভের সময় পদ্মানদীর গতি কিরূপ ছিল। তখন পশ্চিমে চরদাদাপুর হইতে পূর্বদিকে খাঁপুর পর্যন্ত পদ্মানদীর উত্তর ও দক্ষিণদিকের গ্রামগুলির অবস্থিতি নিরূপিত হইলেই পদ্মার গতি স্থিরীকৃত হইবে এবং তজ্জন্য পদ্মার উত্তর পার্শ্বের গ্রামগুলির নাম লিখিত হইল।

উত্তরে—দাদাপুর, জঙ্গলীপাড়া, কমলপুর, নীলকুঠিডাঙ্গা, চরনিয়ামতপুর, প্রতাপপুর, অক্রুপুর, রতনপুর, ভবানীপুর, চররঘুনাথপুর, ভৈরব

পাড়া, সাদীপুর, গোবিন্দপুর, সোদীরাজপুর, শ্রীরামপুর, ভাজুরাহাট, ভাজুরা, ভাউভাঙ্গা, খোরদচাঁদপুর, জোতক'কুরিয়া, শ্রীকৃষ্ণপুর, চরমানিকদিয়া, সুজানগর, বিশ্বনাথপুর, মোজাহেতপুর মোমরেজপুর, নিশ্চিন্দপুর, জনকোলা, তাড়াবাড়িয়া, সিন্দুরপুর, কন্দর্পপুর, সাতবাড়িয়া, রামনগর, কমরপুর, চরসামিড়পুর, চররামনগর, চরখাঁপুর।

তাড়াবাড়িয়া হইতে পূর্বদিকে—

দক্ষিণে—কুলচারা, হুকুমা, চরসিমনচাড়া, চরকুভরিয়া, চুয়াপাড়া, মোহীনগর, শুকদেবপুর, দিয়মকানন, কুষ্টিয়া, আরাজিসালদা (গৌরীমুখ), চরবানিয়াপাড়া, লক্ষীকোল, বাড়াদি, সুলতানপুর, শ্রীকোল, ভৈরবপাড়া, হামিরহাট, কসধা, হাজীপুর (বর্তমান শিলাইদহ হইতে উত্তরে), ইব্রাহিমপুর, রাধাকান্তপুর, রামকৃষ্ণপুর, রাণানগর, গোপীনগর, চরপীরপুর, খাসচর, বাসুদেবপুর, চরভবানীপুর, গঙ্গাধরদিয়া, কিসামতপাড়া, খাস চরধোকরাকোল, সাজপাড়া, সিকদারখালি, খয়েরডাঙ্গী, সেনগ্রাম, কল্যাণপুর, কীর্তিবাসদিয়া, শ্রীকৃষ্ণপুর, কেশবপুর, তেজপাড়া, হাবাসপুর, নীলকুঠি, গঙ্গানন্দদিয়া, চরগুড়গুড়ি, চরগোপালপুর।

১৮৫৫ সালের প্রাক্কালে পদ্মানদীর অবস্থিতি—

উত্তরে—বোয়াইলদহ, (এই বোয়াইলদহের দক্ষিণে পদ্মার গাত্র দিয়া দক্ষিণে কুষ্টিয়ার মজমপুর রাখিয়া গৌরী প্রবাহিত হইয়াছিল।) চরকোলিয়া, রামচন্দ্রপুর, (পাবনা), বলরামপুর, কুলনিয়া, দোগাছিভাড়রা, ভাউভাঙ্গা, চরতারাপুর, কাকুড়া, সুজানগর, সাতবেড়িয়া, যাত্রাপুর নাজীরপুর।

দক্ষিণে—মজমপুর (কুষ্টিয়া), গষ্টীয়া, বানিয়াপাড়া, লক্ষীকোল, মটপাড়া, শ্রীকোল, ঘোষপুর, সাদীপুর, ইব্রাহিমপুর, সাদিরাজপুর, চিনিরগোলা, (সাহেবের চিনির কুঠি ছিল) খাস চরবাসদেবপুর, রাণীনগর, গোপীনাথপুর, পীরপুর, চরপাড়া, গঙ্গাধরদিয়া, খাস চরধোকড়াকোল, মাঝপাড়া, আতসখাঁদিয়া, শ্রীরামপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর, নন্দলালপুর, মলা।

১৮০৪ সালের প্রাক্কালে পদ্মানদীর অবস্থিতি—

গৌরী নদীর মুখ ১৮৫৫ সালে কুষ্টিয়ার পার্শ্বে যেখানে ছিল, ১৮৩৪ সালেও ঠিক সেইস্থানে থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তরে—রামচন্দ্রপুর দোগাছীর ধার দিয়া বর্তমান শিলাইদহ দক্ষিণে রাখিয়া

স্রোতস্বতী পদ্মা নদী চাঁদপুর জগন্নাথপুর, আমলাবাড়ী, ধোকড়াকোল, দক্ষিণতীরে ফেলিয়া কতকটা উত্তরবাহিনী হয় ও ভাউড'ঙ্গার নিকট দিয়া সুলতানগর, নাজীরপুর, উত্তর প্রাপ্তস্থ করিয়া ভেললাবাদিয়ায় চন্দনাশাখা ছাড়িয়া পুর্বমুখে প্রবাহিত ছিল। তৎকালে ধোকড়াকোলের বর্তমান কোল নদীর গর্ভস্থ ছিল ও সেনগ্রামের উত্তর আতসর্খাদিয়া পর্যন্ত পুর্ববর্ণিত সমস্ত গ্রামগুলিই বর্তমান ছিল। এই সময়ের কোন শীট-নক্সা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রেনল্ড সাহেবকৃত নক্সাদি দৃষ্টে এসময় ধোকড়াকোলের বর্তমান কোলের স্থানে পদ্মার কলেবর দেখা গিয়াছে।

১৭৯৪ সালের প্রাক্কালে পদ্মা নদীর অবস্থিতি—

১৭৩৪ সালে অর্থাৎ প্রায় ৫০ বৎসর পুর্বে পদ্মা নদীর গতি অতীব আশ্চর্যজনক ছিল। তখন দাদাপুরের অনেক পশ্চিমে বিল আমলার নিকট পদ্মা হইতে গৌরী শাখা উদ্ভুত হইয়া কুষ্টিয়ার কেনী বিল্ডিংস-এর উত্তরের বর্তমান মরগাং দিয়া প্রবাহিত ছিল। বিল আমলা কিয়দ্দূরে পুর্বদিকে পদ্মার অন্যতর শাখা চন্দনা বাহির হইয়া গৌরী সহোদরার উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাবুইডাঙ্গা, এদাকপুর, হোগলাগোপ গ্রামের নিকট দিয়া ধোকড়াকোলের পার্শ্বত ও আমবাদিয়ার পার্শ্বে কোদালিয়া বটগাছের নিকট পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া মাতৃবক্ষে স্তন পান করিতে করিতে স্ফীতোদর হইয়া প্রবল বেগে ভেললাবাড়িয়ার নিকট আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখনও সেনগ্রাম বর্ণিত কোদালিয়া বটগাছের কিয়দ্দূরে উত্তর-পুর্ব কোণে অবস্থিত ছিল।

হাবাসপুর নিবাসী বদনচন্দ্র সরকারের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার বয়স যখন ২০ বৎসর তখন তিনি ঐ কোদালিয়ার বটগাছের নিকট পদ্মার ধারে বিশ্রাম করিয়া পদব্রজে কাশীমবাজার জমিদার বাড়ীতে গিয়াছিলেন। কোদালিয়ার বটগাছ এখনও বর্তমান আছে। বদন সরকারের বয়স হিসাবে সে আজ প্রায় ১২৫ বৎসরের কথা। কোদালিয়া বটগাছের শিখর দেশস্থ উত্তর-দক্ষিণ বাহিনী সোতা এখনও পদ্মা গর্ভের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐ বটগাছের নিকট হাট বসিত। ইহারই দক্ষিণ-পশ্চিমে ধোকড়াকোলের কুঠি এবং উত্তর-পুর্ব দিকে আমবাড়িয়া কুঠি বিদ্যমান ছিল। ধোকড়াকোলের কুঠি এখনও আছে। আমবাড়িয়া কুঠির চিহ্নও নাই। উল্লিখিত বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এখন আমরা

এম্রাকপুরের নিম্ন দিয়া খোকড়াকোল পর্যন্ত শ্যামগঞ্জের পার্শ্ব দিয়া যে সোতা দেখিতেছি কোন সময়ে তাহা চন্দনার কলেবর ছিল।

আমরা পদ্মার গৌরী ও চন্দনা কন্যাদ্বয়ের জন্ম বিবরণ সংক্ষেপে যাহা বর্ণনা করিলাম, পাঠকবর্গ বোধহয় তাহাতে পরিতৃপ্ত হয়েন নাই। সেকালের ঘটনার সহিত অলৌকিক ব্যাপার কিছু সংমিশ্রিত না থাকিলে, মনে তৃপ্তিকর হয় না। আমরা চন্দনা সম্বন্ধে কিছু জানি না। গৌরীর জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে একটি উপকথা আছে, তাহা এখানে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভরসা করি পাঠকগণ সেকালের কাহিনী মনে করিয়া অপ্রাসঙ্গিকতা দোষ মার্জনাপূর্বক ধৈর্যরক্ষা করিবেন।

জগতীর নিকট হইতে নওপাড়া পর্যন্ত স্থানসমূহের অন্যতর স্থানে গোরাই নদীতটে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। গৌরী নামে তাঁহার এক দাসী ছিল। ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নানে গমনকালে ঐ দাসী গঙ্গাদেবীকে দিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে একছড়া ফুলের মালা প্রদান করে। ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে গমন করিয়া মালা গঙ্গায় সমর্পণ করিতে গিয়া দেখিলেন যে ফুলগুলি কিছুমাত্র মলিন হয় নাই। ইহাতে অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং গঙ্গাকে সম্বোধ-পূর্বক 'গৌরী তোমাকে এই মালা প্রদান করিয়াছে' বলিয়া তাহা গঙ্গায় দিলেন। ভাগীরথী শঙ্খযুক্ত হস্ত উত্তোলন করিয়া ঐ মালা গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিতে পাইয়া মনেমনে ভাবিতে লাগিলেন, গৌরী সামান্য দাসী নহে, অবশ্যই দেবকন্যা হইবেন। তিনি সত্বর গৃহে পৌঁছিয়া গৌরীকে ডাকিতে লাগিলেন। গৌরী তখন গৃহকার্য শেষ করিয়া গোড়াই নদীতে হাতের গোলা প্রক্ষালন করিতে গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ দূর হইতে বলিলেন, 'তুমি কে মা, আমাকে বঞ্চনা করিও না, পরিচয় দাও।' গৌরী ঝুড়ি গোলা লইয়া নদীর জলে নিমগ্ন হইল, আর উঠিল না। নদীতে বান ডাকিয়া উভয় তট ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রের দিকে চলিয়া গেল।

গৌরী যেখানে গোলা ঝুড়ি ত্যাগ করিয়াছিল, তাহার নাম 'ঝুড়িদহ' এবং ব্রাহ্মণ যেখানে দাঁড়াইয়া ডাকিয়াছিল, তাহার নাম 'ডাকদহ'। কুষ্টিয়াকে এখনও ডাকদহের মোহানা বলে। ব্রাহ্মণ যেখানে মাথা ভাঙ্গিয়া গৌরীর উদ্দেশ্যে কাঁদিয়াছিল, তাহার নাম 'মাথাভাঙ্গা' হইয়াছে।

গৌরী বড়ই আদরের মেয়ে। ইহার বেগ সংবরণ করে কার সাধ্য। কয়ার (বাঘা যতীনের মামাবাড়ী) নিকট উহার উপর দিয়া রেলওয়ে সেতু

করিতে অনেক টাকার শ্রাদ্ধ ও অনেক মাথা ঘুরাইতে হইয়াছে। কত নৌকা মাল বোঝাই করিয়া, কত নৌকা নরনারীসহ ইহার গর্ভে জন্মের মত নিমগ্ন হইয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ? গৌরী পদ্মার ন্যায় দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস ছিল। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারগণ কয়ার অনতিদূরে ইহার বাঁধে অজস্র প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াও ইহার জীবন নাশ করিতে সক্ষম হয় নাই। গৌরী এই প্রদেশের গরীবজনের প্রাণ ছিল। জলদান ও সর্বপ্রকার অন্নদান করিয়া ও বাণিজ্যের উন্নতি সোপানে দেশকে উন্নত করিয়াছিল। হায়, কি পরিতাপের বিষয়, গৌরীমাতা হঠাৎ প্রাণ-ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছিলেন। তবে জননী পদ্মা স্বীয় কন্যাকে অমৃতধারা দিয়া পুনঃজীবিত করিয়াছেন, এখন ইহার অবস্থা ভাল।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রাক্কালে গৌরী ও চন্দনার অস্তিত্বের কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পদ্মাই তখন এ প্রদেশের একমাত্র নদী ছিল। পদ্মা তখন কুষ্টিয়া অঞ্চলের বহু উত্তর দিয়া দোগাছির পার্শ্ব দিয়া, দক্ষিণ পূর্ব রোকে দয়ারামপুরের নিকট এগ্রারপুরের সোতাস্থান দিয়া অথবা তাহার কিঞ্চিৎ উত্তর দিয়া কেদালিয়ার বটগাছ পার্শ্বে ফেলিয়া আমবেড়িয়া মহিষবাথান ডাহিনে রাখিয়া প্রাচীন মেঘনা গ্রামখানিকে দক্ষিণ তীরস্থ করিয়া হাবাসপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত ছিল। তখন সেনগ্রামের অস্তিত্ব নদীগর্ভে ছিল।

জনশ্রুতি আছে, পূর্বকালে পদ্মা নদীর দক্ষিণ সীমা কুমারখালির আট ক্রোশ দক্ষিণে শৌলকুপা গ্রাম এবং উত্তর পাবনার নিকটবর্তী বুড়িগাছা নির্দিষ্ট ছিল। এই সীমার মধ্যে জল ব্যতীত স্থল দৃষ্ট হইত না। সময় সময় পদ্মার গর্ভে চড়া পড়িত বটে কিন্তু পূর্বে মনুষ্যের বাসপোযোগী হয় নাই। চড়া একস্থানে পড়িয়া অধিকদিন থাকিত না। পদ্মার প্রবল স্রোতে ভগ্ন হইয়া যাইত। এই কথা নিতান্ত অপ্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয় না। কেন না, ঐ সীমান্তরে এক্ষণে যে সকল স্থান দেখা যাইতেছে, তথায় পুষ্করিণী খনন করিতে কোন কোন স্থানে বৃহৎ বৃহৎ নৌকার মাস্তুল ও কোনস্থানে ভগ্ন নৌকার তক্তা বাহির হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতে পারে ঐ সকল স্থান পূর্বে পদ্মার গর্ভে ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ ও উত্তর দেশবাসীরা পদ্মার নাম শুনিলে এখনও কম্পিত-কলেবর হয়।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের (বর্গী) দৌরাত্ম্যে দক্ষিণ দেশবাসীদিগের অনেকেই যে পদ্মার পারে বাস করিতেছে তাহারও কারণ এই, তৎকালে পদ্মা পার হওয়ার সাহস ছিল না। সুতরাং মহারাষ্ট্রীয়েরা পদ্মার উত্তর পারে গিয়া কাহারও অর্থ অপহরণ করিতে সমর্থ হইত না। পরে পদ্মার বেগ ক্রমশ হ্রাস হইয়া আসিলে তাহার গর্ভে অনেক চড়া পড়িল। তাহাতেই ক্রমে লোকের বসতি হইয়াছে।

পদ্মার প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা সমালোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে পূর্বকালে পদ্মার গর্ভস্থ চড়া যত শীঘ্র শীঘ্র ভগ্ন হইত, এক্ষণে তদ্রূপ হইতেছে না। পদ্মার গর্ভস্থ চড়া বুড়রিয়া প্রায় ১৫০ বৎসর পর উহারই গর্ভে লীন হইয়াছে। বস্তুত: উল্লিখিত সীমা মধ্যে পদ্মার চড়ায় যে সকল গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে তাহা দুইশত বৎসর মধ্যে একবার তাহার গর্ভে অবশ্যই লীন হইবে এবং পুনর্বার অন্য চড়ায় অন্য গ্রামের পত্তন হইবে, অনুমান করা যাইতে পারে। পদ্মার গর্ভস্থ চড়া সমূহে স্থাপিত গ্রামগুলির বৃক্ষাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমাদিগের এই বাক্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৫০ বৎসরের অধিক কালের বৃক্ষ ও প্রাচীন কীর্তি ওই সমুদয় স্থানে দৃষ্ট হয় না।

এ দেশীয় প্রাচীন নাবিকেরা বলে এবং কোন কোন ইঞ্জিনীয়ার সাহেবও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পদ্মার স্রোত তাহার নিম্নদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়। সুতরাং তাহার গর্ভে যেসব বসতি হইয়াছে তাহারও নিম্নে পদ্মার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কালে এই স্রোত প্রবল হইলে গ্রাম সকল সহজেই নদী গর্ভস্থ হইবে। যাঁহারা পদ্মার গর্ভে এক রাত্রিতে দু'চারখানি গ্রাম বসিয়া যাইতে দেখিয়াছেন তাঁহারা প্রাচীন নাবিকদিগের বাক্য সহজেই বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। উল্লিখিত কারণে পদ্মা সময় সময় অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হওয়ায় তথা হইতে অনেক শাখা নদী উৎপন্ন হইয়া পুনর্বার তাহাতেই মিলিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে উৎপন্ন কয়েকটি নদী চন্দনা নাম ধারণ করে, কভুও তাহা শাখা নদী নহে। ঐ সকল সোতা বা শাখা নদী ৩০/৪০ বৎসর অধিক কখনই প্রবাহিত হয় নাই। গৌরী এ প্রকার শাখা নদী নহে। ইহার প্রকৃতি অন্য প্রকার। সুতরাং ইহাকে অন্য নদী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমরা প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি, আমলার বিল পদ্মার গর্ভ। বর্তমান গৌরী ঐ স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া সুন্দরবনের খালের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। এই সীমার মধ্যে গৌরী অনেক স্থলে অনেক নামে পরিচিত। আমলার বিলের উৎপত্তির স্থান হইতেই পদ্মা ইহাকে স্তন্য দিয়া পুষ্টি সাধন করিয়াছে। পদ্মা আপন স্বভাবানুসারে স্থানান্তরিত হইলে, গৌরী মাতৃহীনা বালিকার ন্যায় নিরাশ্রয়া হয়। পরে হাউলিয়া নদী ইহাকে প্রতিপালন করে। শ্যামপুরের খাল নামে এখনও বর্ষাকালে যে এক-মুখ হইয়া থাকে, গৌরী মাতৃহারা হইয়া ঐ মুখদ্বারা হাউলিয়া নদীর স্তন্য পানে জীবিত থাকে। জগতীর কোল-বাহিনী পুরাতন গোড়াই-এর ন্যায় এই সময় নদীর পরিসর অতি অল্প ছিল। একপারের লোক অপর পারের লোকের সহিত অনায়াসে কথাবার্তা বলিতে পারিত। কিন্তু গৌরী চিরকালই অতিশয় গভীরা। ইহার অনেক স্থানে ৫০/৬০ হাত এবং কোন স্থানে ৭০/৮০ হাত জল থাকিত।

গৌরীর এই অবস্থায় পশ্চিম দেশীয় কাইয়া (মাড়োয়ারী) মহাজনগণ হাউলিয়া নদী বাহিয়া গৌরী নদীতে আসিত এবং তীরবর্তী গ্রামে বাণিজ্য করিত। উক্ত মহাজনগণই কুমারখালিতে প্রথমে এক রেশমের কুঠি প্রস্তুত করে। ঐ কুঠিতে গুটিপোকার (পতঙ্গ) সুতা প্রস্তুত হইত। ইহাদের বাণিজ্য ও কুঠি প্রস্তুতের কথা উল্লেখ করিয়া কোন কোন প্রাচীন লোক বঙ্গদেশের নবাব আলিবর্দী খাঁর কথাও বলিয়া থাকেন। এই সকল বিষয়ে আলোচনা করিয়া গৌরীর উৎপন্নকাল ২০০ বৎসরের অধিক হইবে অনুমান হয়।

গৌরীর সেতু বন্ধনের সময় গৌরীর বক্ষে অনেক প্রস্তর নিক্ষেপকালে ইহার কলেবর ক্ষীণ হওয়ায় গৌরী প্রায় মৃত্যুমুখে পড়িয়াছিল। গত চার বৎসরের পূর্বে কুষ্টিয়ার নিকট গৌরী শুষ্ক হওয়ায় এ প্রদেশে হাহাকার উঠিয়াছিল। তবে লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য পদ্মা প্রবল জলস্রোত প্রবাহ করিয়া স্বীয় কন্যা গৌরীকে পুনঃজীবিত করিয়াছে। শিলাইদহের নিকট গৌরীর মুখ শুষ্ক হইয়া বৃহৎ চর পড়িয়া সামান্য একটি স্রোত গৌরীকে রক্ষা করিতেছে। এখন গৌরীর বর্তমান অবস্থা দেখিলে পূর্বাবস্থা অনেকেই স্থির করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ।

পদ্মার পরিসর সম্বন্ধে যে বিস্তীর্ণ বিবরণ বলা হইল তাহাতে উত্তরে

সুজানগর দক্ষিণে মেঘনা ৮ মাইল প্রস্থ বিশিষ্ট পদ্মার গর্ভস্থ জরায়ুর মধ্যে সেনগ্রাম অবস্থিত থাকিয়া পরে চর আকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কালক্রমে নদীর গতি পরিবর্ত্তনে মেঘনার নিকট বর্তমান মেঘনা-কৃষ্ণপুর ও দিঘলীর বিল সৃষ্ট হয় এবং চড়া পড়িয়া সেনগ্রাম ডাঙ্গিপাড়া প্রভৃতি গ্রামের উদ্ভব হইয়াছে। এবং তদনুসারে সেনগ্রামের আয়ুকাল প্রায় ৩০০ বৎসর বটে। পদ্মার তীরে মেঘনা বালিয়া প্রভৃতি গ্রাম ছিল এবং মেঘনার কেদারনাথ নাগদিগের বাড়ির কিয়দ্দূরে নবাবের ফৌজালয় ও তাহার চতুর্দিকে গড় কাটা ছিল।

এখনও প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন, পদ্মা এখন অনেক উত্তরে আছে বটে কিন্তু নিশ্চয়ই সাবেক তীরস্থ মেঘনার ছিন্নমস্তার সহিত পুনঃ দেখা হইবে। সেনগ্রামের পশ্চিম ও পুর্ব দিকে দুইটি বিল ও মধ্যস্থলে উত্তর-দক্ষিণ দীর্ঘ এক জলা আছে। এই বিল জলায় বারোমাস জল থাকিত। পুর্বদিকের বিল, মাতুরার মাঠের বিল নামে অবিহিত। এখন ঐ সকল পদ্মার গর্ভে।

পাঠকবর্গের বিশ্বাসের জন্য উৎকৃষ্ট নমুনা মেঘনার বিল ব্যতীত আর কিছুই উপস্থিত করিতে পারিতেছি না। যাহাহউক পদ্মা আমাদের জন্মভুমি সেনগ্রাম প্রসবের পর ১৭৯২ সালের পুর্বে গৌরী ও চন্দনা শাখা নদী প্রসব করিয়া বৃদ্ধ বয়সে দক্ষিণ রাজ্যের নরনারীর সান্ত্বনার ভার কন্যাদ্বয়ের উপর অর্পন করিয়া নিজে ক্রমে উত্তরে সরিয়া পড়িয়াছেন।

১৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৫ সাল পর্যন্ত আড়াইশত বৎসর মধ্যে উত্তরে পাবনা সুজানগর ভাউডাঙা, দক্ষিণে ইদ্রাকপুর আমবাড়িয়া মেঘনা, ইহার মধ্যে একবার দক্ষিণে একবার উত্তরে গাত্রাপসরণ করিয়া শতশত গ্রাম ধ্বংস করিয়া কখনও বা সৃজন করিয়া অসীম লীলা খেলা করিয়া ১৮৬৭ সালে দিয়াড়া সার্ভের সময় কিঞ্চিৎ দক্ষিণে গর্ভজাত সেনগ্রামের দিকে একটুকু অগ্রসর হয়েন। পরে অপত্যস্নেহে পয়োস্বিনী প্রায়-বিহ্বলা হইয়া ২।১ রশি বিস্তীর্ণ তীরস্থ মৃত্তিকা-চাপ ধরিয়া শস্যক্ষেত্র, কত ঘরবাড়ি ও গ্রাম ও সেনগ্রামের পুরাতন কালিবাড়ি ও বটগাছ ভাঙিয়া সেনগ্রামকে নিজ অংকে লইতেছিলেন। হঠাৎ পরে হয়তো মনের গতি পরিবর্তনে স্রোতের গতি পরিবর্তিত হওয়ায় আবার স্বস্থানে সুজানগরে প্রস্থান করিয়া এখন সেই স্থানের কিছু তফাৎ দিয়া সাতবাড়িয়া পার্শ্ববর্তিনী হইয়া সাগরে পড়িয়াছেন।

তরঙ্গিনী স্রোতস্বতি। তোমার গতিবিধি দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। যদি সেনগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া এইভাবেই চলিয়া যাইবে মনে ছিল, তবে পশ্চিমে শিলাইদহের মহর্ষির সুন্দর পাকা বাড়ি, গঙ্গাধরদি-র নীলকুঠি ও সেনগ্রামের প্রাচীন কীর্তি পাকা টালির বাড়িটি ভাঙ্গিবার কি প্রয়োজন ছিল? তোমার প্রবল প্রতাপ পুর্ববঙ্গের অনেকেই জ্ঞাত আছে। তোমার ভাঙন দেখিলে প্রলয়ের আরম্ভ বলিয়া ভয় হয়। কয়েক বৎসর পুর্বে আমরা স্বচক্ষে তোমার যে ঘুর্ণ-জলস্রোত ও ভাঙন দেখিয়াছি অদ্যাপিও ভুলিতে পারি নাই। প্রায় ৩ রশি প্রশস্থ এক-এক মৃত্তিকা-চাপ দেখিতে দেখিতে ঘর বাড়ি বৃক্ষাদিসহ বসিয়া গিয়াছে। গৃহস্থ জিনিসপত্র লইয়া পলাইতে অবসর পায় নাই। রাত্রিকালে আজুদিয়ার এক গোয়ালের গরুগুলিসহ গোয়াইল ঘরখানি তুমি এককালীন জলসই করিয়া ফেলিয়াছিলে। তুমিই আজুদিয়ার বিখ্যাত ঘোষবাবুদের ঘর বাড়ি, দালান কোঠা দু'তিনবার ভাঙিয়া ছিন্নভিন্ন, স্থানান্তরিত ও তাঁহাদের দরিদ্র করিয়া ফেলিয়াছ। তোমার বিখ্যাত ভাঙনের কাহিনী যাহা শুনিয়াছি তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

বর্ষাকালে তোমাকে দেখিলে একটি ক্ষুদ্র সাগর বলিয়া ভ্রম জন্মে। সেনগ্রামের কিয়দ্দূরে পশ্চিমে দোগাছির কিয়দ্দূরে অনেকদিন হইল কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তোমার বিশাল তরঙ্গায়িত বক্ষের ঘুর্ণজলক্রীড়া দেখিতে গিয়া আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় চাঁদমোহন মৈত্রের পুত্র বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম-এ মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর তৎকালীন স্কুল-ডেপুটি-ইন্সপেক্টর বাবু রাধাগোবিন্দ মৈত্র বি-এ জন্মের মত তোমার সুগভীর উদরে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। অদ্যাপিও এই ঘটনার কবিতা শুনিতে পাওয়া যায়।

'রাধাগোবিন্দবাবু কয়
জলের পাক দেখতে হয়......'

কত মহাজনের মহামূল্য জিনিসপত্র সম্বলিত নৌকা, কত বিদেশাগত স্বদেশগামী যাত্রীর নরদেহ, কত পশুপক্ষী তোমার করাল কবলে গ্রাসিত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? তোমার এই ভয়াবহ ভাব ও সংহারিণী মূর্তি দেখিলে মনে অশেষ ভাবের উদয় হয়। কখনও মনে হয়, বঙ্গের নরনারীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি খণ্ড লইয়া বিবাদ ও তৎপ্রসঙ্গে নানাবিধ পাপানুষ্ঠান ও কলহ করিতে দেখিয়া তুমি ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাদের জমিজমা

ভাঙিয়া কাড়িয়া লইয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া চিহ্নহীন করিয়া ফেলিয়াছ। তাহাদের কেহবা প্রাণ দিয়া কেহবা পলাইয়া তোমার শাস্তির হাত হইতে ত্রাণ পাইয়াছে। আবার তোমার প্রজাপালিনী শক্তি ভাবিলে তোমার উত্তাল তরঙ্গমালা দেখিয়া কিছুমাত্র ভয় হয় না। বিশ্বপ্রেমিকের সাক্ষাৎ বিশ্বজনীন প্রেমতরঙ্গ বলিয়া প্রত্যক্ষীভূত জ্ঞানের উদ্রেক হয়।

বস্তুত, স্রোতস্বতি, তুমিই আমাদের জীবন। তোমার স্বাদু সলিল পান করিয়া সুস্থ শরীরে জীবন ধারণ করি। তোমার বক্ষের প্রমুক্ত বায়ু হিল্লোলে দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তোমার জলপ্লাবনে দেশের ম্যালেরিয়া নাশ, ভূমি উর্বরা ও শস্যশালিনী হয়।

বণিকেরা তোমারই বক্ষে নৌচালনা করিয়া আমাদের অভাব মোচন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করে। যেদেশে নদী নাই সে দেশ বৃথা। বঙ্গের এই অংশে সকলেই কাঙাল। না আছে বিদ্যা, না না আছে ধন, না আছে সহায় সম্বল। তাই তুমি দয়াবতী স্রোতস্বতি, একাই তুমি তাহাদের পানীয় জল, উদরের অন্ন জোগাইয়া প্রতিপালন করিতেছ। বিগত ৩০০ বৎসরের মধ্যে তোমার যে ব্যতিব্যস্ততার কাহিনী বলিলাম, সে কেবল তোমার প্রেমের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুদূর-বাসী নরনারীদিগকে তুমি ভালবাসিয়া প্রেমানুরাগে দেখা দিতে ও সেদেশকে রক্ষা করিতে গিয়া পুরাতন অনুর্বরা অকর্মণ্য অনেক দেশ ভাঙিয়া নুতন ও উর্বরা করিয়া দিয়াছ ও কখনওবা উর্বরা মৃত্তিকা লেপন দ্বারা ওই সকল দেশকে মহাউর্বরা করিয়াছ। দেখা দিয়া আবার সে দেশ ছাড়িয়া আসিবার সময় প্রেমের চিহ্ন স্বরূপ বিল, খাল, নালা, সোতা রাখিয়া সেদেশের পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছ। কখন কখন বহুতর হস্ত (শাখা নদী) সুদূর দেশে প্রসারিত করিয়া মধুর পানীয় জল বিতরণ করিয়া দেশের সহিত স্বীয় পবিত্র সম্বন্ধ রক্ষা করিতেছ।

তোমার কলেবর ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ দেখিতে পাই না। যখন মানচিত্রের প্রশস্ত ভূপৃষ্ঠে তোমার অবয়ব দেখিতে পাই তখন করুণাময় পরমেশ্বরের অপার মহিমার আনন্দরসে প্রাণ আপ্লুত হইয়া যায়। করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার দয়ার স্রোত হিমাদ্রি হইতে এ দেশে প্রবাহিত করিয়া শাখা প্রসারণে সমস্ত দেশকে রক্ষা করিতেছেন। এ কখনই সংহারিণী শক্তি নহে, এ

তাঁহার অপার বিশ্বপালিনী শক্তির পরিচয় মাত্র। পূর্ববঙ্গের বর্ষাকালের জলপ্লাবন দেখিলে এক চক্ষে অসুবিধাজনক অভাব ও অন্য চক্ষে প্রেমের লহরী দেখিতে পাওয়া যায়।

তুমি জাতি বর্ণ নির্বিশেষে স্থান-অস্থান ভাল-মন্দ ভেদাভেদ পরিত্যাগ করিয়া বৎসর অন্তর একবার সারা বৎসর অস্নাত বঙ্গের মলিন বক্ষ ধৌত করিয়া সুন্দর ও পবিত্র করিয়া দাও। বঙ্গে জাতিভেদ ও সংকীর্ণতা বড়ই প্রবল। একে অন্যের জলস্পর্শ করিতে চাহে না। তাই তুমি প্রকৃত তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য পুকুর, নালা, খাদ, কূপ, বিল, খাল, সব একাকার করিয়া এক অখণ্ড জলরাশির দ্বারা অভেদ তত্ত্ব ও অনন্ত প্রেমের নমুনা দেখাও। একি কম আনন্দের কথা!

ধন্য সেনগ্রাম! তুমি প্রেমময়ী স্রোতস্বতী পদ্মার নিকটে রহিয়া স্বর্গসুখের অধিকারী হইয়াছ!

ভূস্বামী

১৬শ শতাব্দীর প্রাক্কালে পদ্মার গর্ভে সেনগ্রামের উদ্ভবকাল নিরূপিত হইল। এখন সেই সময় হইতে একাল পর্যন্ত সেনগ্রামের ভূস্বামীদের পরিচয় সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। পাঠকবর্গের মনে স্বভাবতঃই এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, সেনগ্রাম চর আকারে উদ্ভব হওয়ার সময় কে ইহার জমিদার হইলেন, নায়েব তহশীলদারই বা কে ছিলেন? এবং কাহারাই বা কি প্রকারে সর্বাগ্রে ইহার দখলে প্রবৃত্ত হইলেন? পাঠকবর্গ এস্থলে মনের মত উত্তর পাইতে পারেন না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, তখন জমিদার বলিয়া কেহ ছিলেন না।

১৭১৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর সময় ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বিভক্ত চাকলার অধিকাংশ লইয়া এক একটি জমিদারী সৃষ্টি হয়। এবং জমিদার-খ্যাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সেনগ্রামের ভূস্বামীর ব্যতীত কর-সংগ্রাহক নিযুক্ত হইতেন। ১৭৯০ সালের পূর্বে নায়েব তহশীলদার দূরে থাকুক, জমিদারী ও জমিদার পদেরও সৃষ্টি হয় নাই। আকবর বাদশাহ দিল্লীশ্বর ও বঙ্গে আজিম খাঁ নবাব ছিলেন এবং সেনগ্রাম আজিম খাঁ নবাবেরই কর্তৃত্বাধীনে ছিল।

চরাভূমিতে সেনগ্রাম উদ্ভব হইবামাত্র কাহারা কি প্রকারে সর্বপ্রথমে ইহার দখলে প্রবৃত্ত হইলেন, বর্তমান সময়ে এ একটি প্রধান ও আবশ্যকীয় প্রশ্ন বটে। কারণ তখন বঙ্গের অনেক জমিদার। পদ্মার ঘোলা জল যে স্থান দিয়া যায়, জমী পয়স্তী (উঠিবার) হইবার পূর্বেই তাহার নক্সা এবং জমি পয়স্তী হইতে না হইতেই কৃষকগণ চতুর্পার্শ্ব হইতে আসিয়া বন্দোবস্তের অপেক্ষা না করিয়া অগ্রে কলাই বুনিয়া দখল করিতে প্রবৃত্ত হয়। বন্দোবস্তের কথা পরে। সেকালে জমি লইয়া মারামারি ছিল না। অনেক জমি বিনা কর্ষণে অনেককাল পড়িয়া থাকিত। অনেক গ্রাম উদ্ভবের পর বনজঙ্গল নিজ নিজ উর্বরা শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া বনজঙ্গলেই পরিণত থাকিত অথবা পুনঃ নদীগর্ভে আয়ুকাল অতিবাহিত করিত। তখন কৃষক কোথায়? তখন উচ্চ জমিও জনমানবশূন্য, হিংস্র জন্তুর

আবাসভুমি হইয়া পড়িয়া থাকিত। সেনগ্রামের চরের জমির তত্ব তখন কেহ না লওয়াই সম্ভব।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, দাস বংশীয়দের পূর্বপুরুষদিগের পূর্বে সেনগ্রামে স্থায়ী অধিবাসী অন্য কাহারও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং দাস বংশীয় বলরাম দাস হইতে প্রথম বসতি ও তদবধি ছয় পুরুষ গণনা করিয়া এবং মোটামুটি গড়ে ৪০ বৎসর এক-এক পুরুষের স্থায়িত্বকাল গণনায় ২৪০ বৎসর সেনগ্রামের বসতি অনুমান করিয়া ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে সেনগ্রামের প্রথম বসত অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ১৬শ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে একটি চরা নিম্নভূমি ৩০।৪০ বৎসর পড়িয়া থাকিয়া পরে বসতির উপযোগী হওয়া সেকালের পক্ষে অসম্ভব নহে। আজকাল অবশ্য কাঁচি-চরেই জলপ্লাবনের ভয় না করিয়াও কৃষকগণ কুটীর তুলিয়া বসবাস করে দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, সেনগ্রামের সেকালের ভুস্বামীর নাম ও ধারাবাহিক ঘটনা পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করা দুরূহ ব্যাপার। মুসলমান রাজত্বের সময় বঙ্গে নবাবী আমলে যাহা উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল, তাহারই কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, গণ্ডগ্রাম সেনগ্রামের তো কথাই নাই। এখনও সেনগ্রামকে এই কুষ্টিয়া মহকুমার অনেকে চিনেন না। সেনগ্রামের বসতি কাল ১৬৫৫ হইতে নবাবী আমলের বৃত্তান্ত সেনগ্রাম সংশ্রবে বলিবার কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেনগ্রামের অনতিদুরে কোন কোন গ্রামে সা-আলম বাদশা প্রদত্ত সৈনিক বিভাগে কর্মচারীর ভুসম্পত্তি লাখেরাজ সম্বন্ধীয় পার্শ্বে সাক্ষর ও মোহরযুক্ত সনদাদি দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায় সেনগ্রামের অনতিদুরে মহেন্দ্রপুরের কেদারনাথ রায়ের পুর্বপুরুষ নীলমণি সিংহ বাদশাহের সৈনিক বিভাগে কার্য করিত। সেকালের নবাবী আমলে সেনগ্রাম সম্বন্ধীয় কোন দলিলাদি পাইলে পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারিতাম। যাহা হইক, তখনকার বঙ্গদেশের ইতিহাসই সেনগ্রামের সেকাল কাহিনী মনে করা যাইতে পারে এবং ১৬শ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যিনি বাংলার নবাব, সেনগ্রাম তাঁহারই কর্তৃত্বাধীন ছিল। সুতরাং নিম্নে ঐ সময়ের বঙ্গদেশের নবাবগুলির নাম ও তৎকালীন দুই-একটি স্থূল ঘটনার উল্লেখ করিলে আশাকরি সহৃদয় পাঠকবর্গ বঙ্গের ইতিহাস লিখনজনিত অপ্রাসঙ্গিকতা দোষ মনে করিবেন না।

খৃঃ ১৫৫৬ হইতে ১৬৩৫ পর্যন্ত দিল্লীশ্বর আকবরের আমলে বঙ্গে আজিম খাঁ নবাব ছিলেন। এই সময় দেওয়ান রাজা টোডরমল বঙ্গের ওয়াশীল হিসাব জমা অবধারণে এক কোটি ৭ লক্ষ টাকা বঙ্গের আয় সাব্যস্ত করেন। সেন-গ্রামের করও তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

আজিম খাঁর পর ১৫৫৯ হইতে ১৬০৫ পর্যন্ত রাজা মানসিংহ বঙ্গাধিপ ছিলেন। তাঁহার আমলে কুচবিহার করদ হয়। ইঁহার ভগ্নির সহিত আকবর বাদশাহের পুত্র জাহাঙ্গীরের বিবাহ হয়। সেকালে হিন্দু-মুসলমানের বিবাহ সম্বন্ধের আরও অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আজকাল ইংরাজ রাজত্বের সময় কিন্তু এরূপ সম্বন্ধের বিরল প্রচার দেখা যায়।

১৬০৫ হইতে ১৬২৭ পর্যন্ত দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের কর্তৃত্বাধীনে যথাক্রমে জাহাঙ্গীর কুলী খাঁ, ইসলাম খাঁ, কাসিম খাঁ, ইব্রাহিম খাঁ, খাঁনজাত খাঁ ও কেদে খাঁ বাংলার নবাব ছিলেন। ইসলাম খাঁর সময় পর্তুগীজদিগের আধিপত্য বৃদ্ধি হইয়া আরাকানের রাজা কর্তৃক খর্ব হয়। তখন সুন্দরবন সন্দীপ লোকালয় ছিল। আরাকানের রাজা ঐ সকল স্থান লুঠ করেন। লুঠ সেকালের নিত্যকর্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। নবাব ইব্রাহিমের সময় দিল্লীর বাদশাহ জোর-জুলুম করিয়া বঙ্গদেশ হইতে এককালীন ৪০ লক্ষ টাকা লইয়া যান। সেনগ্রামের গরীবদিগকে তাহার অংশ দিতে হইয়াছিল না, কে বলিতে পারে? খানজাত খাঁ ১৬২৬ হইতে এক বৎসরের জন্য বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে বঙ্গে কোন গোলযোগ ছিল না। তিনি প্রতি বৎসর দিল্লীতে ২২ লক্ষ টাকা কর দিতেন। এখনকার তুলনায় এ অতি সামান্য কর সন্দেহ নাই। সেকালে সেনগ্রামেও জমি জলের মত সস্তা ছিল। ১৬২৭ সালে কেদে খাঁ বঙ্গের নবাব হইয়া অতি অল্পদিন নবাবী করিয়াছিলেন। তিনি অতি চতুর ছিলেন। বার্ষিক দেয় কর ১০ লক্ষের, ৫ লক্ষ সম্রাটকে ও বক্রী ৫ লক্ষ সম্রাজ্ঞীকে তুল্যাংশে ইরসাম্ করিতেন।

১৬২৭ হইতে ১৬৫৭ পর্যন্ত সাহজাহানের আমলে কাশিম আজিম খাঁ, ইসলাম খাঁ, সা-সুজা পরপর বঙ্গের নবাব ছিলেন। কাশিমের সময় পর্তুগীজদিগের প্রতি এই নবাব বাহাদুর বিশেষ অত্যাচার করিয়াছিলেন। হুগলীতে তাহাদের জাহাজগুলি পোড়াইয়া দেন ও বহুতর পর্তুগীজ রমণীকে আবদ্ধ করিয়া দিল্লীতে পাঠান। পর্তুগীজদিগের দুর্দশার পরিসীমা ছিল না। আজিম খাঁ নবাবের সময় ১৬৩৪ সালে ইংরেজ ডাক্তার

ব্রাউটন সম্রাটের কন্যার পীড়া চিকিৎসা করিয়া পুরস্কার স্বরূপ অর্থের পরিবর্তে বিনা শুল্কে ইংরেজ বণিকের বাণিজ্যাধিকার গ্রহণ করেন। ধন্য ব্রাউটনের স্বদেশানুরাগ ও ভ্রাতৃভাব। এই সময় বঙ্গে মগের অত্যাচার হয়। আমাদের প্রাচীনদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, পদ্মার ধারে এ অঞ্চলেও মগের উৎপীড়ন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মগেরা যাহার যাহা পাইত জোর করিয়া লইত। কোন বিচার আচার ছিল না। তাই এখনও পর্যন্ত কোন অবিচার জোর জবরদস্তি দৃষ্টান্ত স্থলে লোকে বলিয়া থাকে—'একি মগের মুলুক পাইয়াছ।'

নবাব সা-সুজার আমলে ডাক্তার ব্রাউটন ইংরাজদিগের আর একটি মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন। ইনি সম্রাটের কোন আত্মীয়ের চিকিৎসা করিয়া বালেশ্বর ও হুগলীতে ইংরেজদিগের কুঠি নির্মানের অনুমতি লইয়া দেন।

এই নবাবের আমল হইতে প্রজার করবৃদ্ধি প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ইনি বঙ্গে করবৃদ্ধি করিয়া ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা আদায় করেন। রাজ-মহল তাঁহার সদর ছিল।

১৬৫৮ হইতে ১৭০৭ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। এই সময় ১৬৬০ হইতে ১৬৬২ পর্যন্ত মীরজুমলা ও তৎপর ১৭৬৭ পর্যন্ত সায়েস্তা খাঁ ও শেষ অল্পদিনের জন্য আজিমুদ্দি বঙ্গেশ্বর ছিলেন। মীর-জুমলা ভয়ানক হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। ইনি কুচবিহারে নারায়ণ দেবের মন্দির ভঙ্গ করিয়া মহম্মদ ঘোরীর ন্যায় কীর্তিস্থাপন করেন। সায়েস্তা খাঁর আমলে ফরাসীগণ চন্দননগরে সংস্থাপিত হয়েন। কাশিমবাজারে ইংরেজদের কুঠি নির্মিত হয়। মার্শেল সাহেব ঐ কুঠির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি সংস্কৃত জানিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতের কিয়দংশ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। কাশিমবাজারের একজন ফৌজদার (শাসনকর্ত্তা) ছিলেন। ফৌজদারী আদালত কথাটি এই ফৌজদার হইতে হইয়াছে। তখন টাকায় আট মন চাউল বিক্রয় হইত। তথাপিও লোকের অর্থাভাবের অভাব ছিল না। তখন টাকার মুখ কম লোকেই দেখিত। বিনিময় প্রথাটির বড়ই প্রচলন ছিল। সায়েস্তা খাঁ হিন্দুর নিকট প্রত্যেক মানুষ গণনায় জিজিয়া নামক কর আদায় করিয়াছিলেন। সেনগ্রামের দরিদ্র হিন্দুগণকেও সে কর দিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইনি ইংরেজদের প্রতি অত্যাচার করিতে

পারেন নাই। কাশিমবাজারের ফৌজদার জব চার্ণকের নিকট অতিরিক্ত কর ও বাণিজ্য দ্রব্যের প্রতি শত মণে ৩৷৷০ হিসাবে ট্যাক্স তলব করিয়াছিলেন। ইংরেজগণ দ্বিতীয় জেমসের নিকট অনুমতি লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। শেষে একটা সন্ধি হয়।

১৬৮৯ সালে আলীমদ্দীন খাঁ বঙ্গের নবাব হয়েন। ইঁহার আমলে শিবজী নিজনামে টাকা প্রচলন করেন। তৎপর আজিম ওসমান অল্প-দিনের জন্য নবাবী করেন। তৎপর মুর্শীদকুলীখাঁ ১৬৯০ হইতে ১৭০৬ সাল পর্যন্ত বঙ্গের নবাব ছিলেন। ইঁহার আমলে পুনঃ বাংলার করবৃদ্ধি হয়। ইনি মুর্শীদাবাদে আসিয়া অবস্থিতি করেন এবং মুর্শীদাবাদ নাম রাখেন। জাহান্দারশাহ বাদশাহের আমলে ১৭০৬ হইতে ১৭০৭ এক বৎসরের জন্য কেয়োক শেখ বঙ্গের নবাব ছিলেন। মুর্শীদকুলী খাঁ ১৭০৭ হইতে ১৭১৮ পর্যন্ত পুনঃ নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জমিদারীর সৃষ্টি করেন। ইনি বঙ্গদেশকে ১২টি চাকলায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেককে জমিদার নাম দেন ও জমিদারগণকে তাহার কর-সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। ইঁহার আমলে ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা করাদায় হয় এবং ব্যয় ৩০ লক্ষ বাদে বক্রী আয়ের সংস্থান করেন। ইনি বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম জরিপ দেন। ইনি বহুতর জমি জায়গীর ও খালাসা দিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় জায়গীরদার-গণকে সৈন্য দিয়া ও খালাসাদারগণকে নিজে উপস্থিত হইয়া সাহায্য করিতে হইত। ইনি জমিদারীর চূড়ান্ত নমুনা দেখাইয়া গিয়াছেন। খাজানা বাকী পড়িলে রক্ষা থাকিত না। ইঁহার কর্মচারী নাজীম আহম্মদ বড়ই নিষ্ঠুর ছিলেন। এবং নবাবের নাতিনী-জামাতা মহম্মদ রেজা খাঁ মূত্রকুণ্ড করিয়া তাহাকে 'বৈকুণ্ঠ' বলিতেন ও বাকী আদায়ের জন্য বাকীদারগণকে তন্মধ্যে নামাইয়া দিতেন। নবাব নিজে কিছু নিরপেক্ষ সুবিচারক ছিলেন। ইনি বিচারে নিজ পুত্রের অপরাধ দৃষ্টে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ইহা একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। ইঁহার পরবর্ত্তী নবাব সুজাউদ্দীনের সময় ১৭২৭ সালে কলকাতায় মেয়র্স কোর্ট সংস্থাপিত হয়।

১৭৪০ সালে নাদির শা বাদশাহের আমলে সরফরাজ খাঁ কিছুদিনের নিমিত্ত বাংলার নবাব হয়েন। জগৎশেঠ ইঁহার অমাত্য ছিলেন। তাঁহার ধনলাভের একটি প্রধান কারণ ছিল। বাদশাহের নিকট নবাবকে যে হিসাব

দিতে হইত তাহার কর্তৃত্বভার জগৎশেঠের উপর ছিল। লোকে এখনও বলিয়া থাকে, জগৎশেঠ মাতা লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন।

১৭৪১ সালে আলিবর্দী খাঁ নবাব হয়েন। ইনি ভ্রাতা জৈনদ্দীনের পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে দত্তক রাখেন। এই সময় বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা হয়। সেনগ্রামের প্রাচীনদিগের মুখে বর্গীর হাঙ্গামের কথা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা দেশ লুঠন করিত। অনেককেই দেশ ছাড়িতে হইয়াছিল। অনেক ধনী পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া এই সময় কুমারখালি অঞ্চলে বসত করেন। কলিকাতার মারহাট্টা গড এই সময় নির্মিত হয়। ধনীরা নিজেদের বাড়ির চতুর্দিকে বর্গীর হাঙ্গামের ভয়ে গড় করিয়া লইয়া বাস করিতেন। এরূপ গড়-কাটা বাড়ি সেনগ্রামের নিকট কোন কোন পল্লীতে দেখা যায়। মেয়েরা শিশুকে ঘুম পাড়াইবার সময় বর্গীর ভয় দেখাইয়া যে শ্লোক বলিতেন, অদ্যাপিও কোন কোন স্থানে ওই শ্লোক শুনিতে পাওয়া যায়—'ঘুম আয় ঘুম আয়, বর্গী আয় দেশে, সবসুদ্ধ ধরে নেবে কেঁদে মরব শেষে।'

আলিবর্দী খাঁ বঙ্গের কৃষকদিগকে কৃষির উন্নতির জন্য সময় সময় টাকা কর্জ দিতেন। বোধ হয় 'তগাবি' প্রথা এই সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আমরাও ছোটকালে বর্গাদারগণকে তগাবি (গরু লাঙ্গল খরিদ ও কৃষকের আহারের জন্য অগ্রিম কর্জ দাদন) দেওয়া দেখিয়াছি। এখন এ-কথাটি নূতন বলিয়া বোধ হইবে। কারণ কৃষককেই এখন জমিদারী সেরেস্তায় নজর ও উৎকোচ দিয়া জমি লইতে হয়।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিয়া বঙ্গদেশ তোলপাড় করিয়া তোলেন। ইংরাজ ইতিহাসে তাঁহার সম্বন্ধে যে পশুবৎ আচরণ-কাহিনী পাঠ করা যায় তাহাতে তাঁহাকে মনুষ্য চর্মাবৃত পশু বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃত তথ্য ঈশ্বর জানেন। বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সিরাজের যে কাহিনী লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র মানুষ বলিয়া বোধ হয়। সুকুমারমতি সিরাজের অতি অল্প দোষের চিত্রই তাহাতে অংকিত আছে। ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইভের রণ-কৌশলে, বিশেষত ঈশ্বর ইচ্ছায় বঙ্গদেশ ইংরাজাধিকৃত হইল। ইহারই কয়েক বৎসর পর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১১৭৬) সালে বঙ্গদেশে মহা মন্বন্তর উপস্থিত হইয়া মহা বিপ্লব হইয়াছিল। ইহাই বঙ্গে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে অভিহিত।

অধিকাংশ লোককে কচুসিদ্ধ খাইয়া জীবনধারণ করিতে হইয়াছিল এবং অসংখ্য লোক অনাহারে কাল-কবলে আশ্রয় লইয়াছিল। সেনগ্রামের দরিদ্র পল্লীবাসীগণ মাটির দরে জমিজমা জিনিসপত্র বাঁধা দিয়া ও বিক্রয় করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

সেনগ্রামের ইতিহাস

প্রথম গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেস্টিংসের সময় ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরাজী ১৭৮০ সালের প্রাক্কালে রাজা কৃষ্ণকান্তচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জমিদারী আরম্ভ হইয়া বাংলা ১২০০ সালের প্রাক্কালে শেষ হয়। ইং ১৭৮৮ সালে তদীয় পুত্র রাজা লোকনাথ বাহাদুর রাজত্ব লাভ করেন। ইঁহার আমলে বাংলা ১২০৮ সালে সেনগ্রাম ও অন্যান্য মৌজা প্রথমে জরিপ হয়। সেকালে জরিপ হইত নল ও রশিতে। রাজা লোকনাথ বাহাদুর বাংলা ১২১২ সালে মীর মজীজল হোসেন, মনুমিঞা, জিনুমিঞাদিগের নিকট সেনগ্রামকে ছয় বৎসরের জন্য ইজারা দেন। কাজেই সেনগ্রাম কয়েক বৎসরের জন্য মুসলমান ইজারাদারের শাসনাধীন ছিল। এই সময় ইজারাদারগণের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে কোন অত্যাচার কাহিনী শুনা যায় না। রাজা লোকনাথ বাহাদুর বাংলা ১২১৩ সালে এক বর্ষ বয়স্ক শিশুকুমার হরনাথ বাহাদুরকে রাখিয়া পরলোকগত হয়েন এবং সেনগ্রাম অনেকদিন কোর্ট অফ ওয়ার্ডস-এর অধীনে থাকে। রাজা বাহাদুরের মাতুল ব্রজানন্দ-বাবু ম্যানেজার ছিলেন এবং জগমোহন মজুমদার ও মেহেরপুরের পদ্মলোচন মল্লিক পেসকার ছিলেন।

১৮১৫ সালে কুমার হরনাথ বাহাদুর বয়ঃপ্রাপ্ত হন। তিনি অতি চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন। কলিকাতা হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের জন্য তিনি বহুল অর্থ সাহায্য করেন। লর্ড আমহার্স্ট আমলে তিনি উপাধি পান। কিন্তু সেনগ্রামের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেনগ্রাম বাংলা ১২২২ সাল হইতে ১২২৫ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও জয়গ্রামের রাধাকৃষ্ণ সরকারের নিকট

পুনঃ ইজারা দেওয়া হইল এবং এই ইজারা ছুট না হইতেই চর চামিরপুর লইয়া বিবাদ উপলক্ষে আজি আহম্মদ, আলি আছরফ তাঁহাদের অনেক আত্মীয়ের প্রবর্তনায় মোকর্দমায় রাজসরকারের পক্ষে জয়লাভ প্রদর্শনপূর্বক বাংলা ১২২৭ হইতে ১২৩০ সাল পর্যন্ত সেনগ্রামের ইজারা লইলেন। তৎপর বাংলা ১২৩১ হইতে ১২৩৪ সাল পর্যন্ত শিবনাথ নন্দী ৮০০০ টাকা জামীন দিয়া সেনগ্রাম ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। তখন শশীশেখর রায় হাবাসপুরের নায়েব ও রামকুমার মজুমদার সেনগ্রামের তহশীলদার ছিলেন। বাংলা ১২৩৪ হইতে ১২৩৭ সাল পর্যন্ত সেনগ্রাম রাজাবাহাদুরের খাস ছিল। তখন হাবাসপুর কাছারীতে নবকৃষ্ণ সেন নায়েব ছিলেন।

বাংলা ১২৩৭ হইতে ১২৩৯ সাল পর্যন্ত ধোকড়াকোলের নীলকর সাহেবের হস্তে সেনগ্রাম ইজারা সূত্রে আবদ্ধ হয়। নব জোয়াদ্দার তখন নায়েব ও জয়ন্তী-হাজরায় কাশীনাথ সরকার তখন কুঠির দেওয়ান ছিলেন। কাশীনাথ দেওয়ানী করিয়া বিপুল সম্পত্তি লাভ করেন। জয়ন্তী-হাজরা গ্রামে পাকা বাড়ী ও পুষ্করিণী তাঁহারই কীর্তি। তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত সতীশচন্দ্রের আমলে এখন তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত বিকৃত ও নষ্ট হইতেছে।

কাশীনাথের দেওয়ানী আমলের শেষকালে তাঁহাকে বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। রোহিনী নাম্নী একটি অপূর্ব রূপলাবণ্যসম্পন্না গৃহস্থ রমনীকে ধোকড়াকোলের নীলকর সাহেব কোন প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে বিবি করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছিলেন। দেওয়ানজী কাশীনাথ ওই বিবির অবৈধ ভালবাসায় লিপ্ত হইয়া সাহেবের বিষ নজরে পড়িয়া গেলেন। সাহেব সরকার মহাশয়ের গোঁফের এক ডগা ও মাথার চুল ক্ষৌরকার্য করাইয়া কোয়াড়ে (গাধা বা কোন পশু বিশেষ) চড়াইয়া কুৎসিত সজ্জায় সকলের সমক্ষে গ্রামে গ্রামে লইয়া লজ্জার এক শেষ করিয়াছিলেন। সাহেব বিবিকেও পরিত্যাগ করিলেন। অগত্যা রোহিনী কাশীনাথের আশ্রয়ে থাকিয়া শেষকাল পর্যন্ত জীবনযাপন করিয়াছিল।

ইং ১৮৩৬/১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে রাজা হরনাথ তদীয় পত্নী হরসুন্দরী কন্যা গোবিন্দসুন্দরী ও পুত্র কৃষ্ণনাথকে রাখিয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইলে, কুমার কৃষ্ণনাথ বাহাদুর নাবালক অবস্থায় রাজত্ব লাভ করেন। ১৮২৮ সালে স্বর্ণকুমারী (পরে মহারাণী)-র সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডস-এর হাতে থাকে। তখন মেহেরপুরে শ্রীনাথ মল্লিক নায়েব ছিলেন।

কুমারবাহাদুর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সেনগ্রামের প্রজাগণের এক বৎসরের দেয় খাজানা রিয়াত করেন। তিনি বয়োপ্রাপ্ত হইয়া ১৮৪১ সালে স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত ধোকড়াকোলের নীলকর মিস্টার ক্রফোর্ড সাহেবের নিকট সেনগ্রাম ইজারা দেন। তিনকড়ি দত্ত তখন নায়েব ছিলেন এবং ধোকড়াকোলের কুঠিতে মহিষবাথানের দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি রামকুমার সাহা দেওয়ান ছিলেন। এই দেওয়ানজীর ভয়ে চারিদিক ব্যতিব্যস্ত ও সেনগ্রাম শশব্যস্ত ছিল। তাঁহার অনেক অত্যাচার কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। এ স্থানে তাহা বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তিনি বিপুল ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা লাভ করিয়া মহিষবাথানকে তৎকালে বিশেষ সমুন্নত করিয়াছিলেন।

তাঁহার বাড়িতে খুব ধুমধামের সহিত নহবত বসাইয়া দুর্গোৎসব ও রাসযাত্রা হইত। রাসযাত্রায় পুতুলনাচ, যাত্রা ও বহুদলের কবিগান হইত। কৃষকগণের মনোস্তুষ্টির জন্য অশ্লীল অশ্রাব্য খেউড় কবিও প্রতি বৎসর হইত। তাহাতেই অসংখ্য কৃষকগণের চিত্ত আকৃষ্ট থাকিত এবং তাহারা প্রতি বৎসর ধরিয়া, রাসের এই গান ও নানাবিধ জিনিষপত্র খরিদ ও পুতুলনাচ দেখিবার জন্য আশাপথে থাকিয়া দিনকে বৎসর মনে করিয়া কাটাইত। সে সকল আমোদ প্রমোদ এখন নাই। মহিষবাথানের সে শ্রীবৃদ্ধিও আর নাই। এখন শেষ বংশধর বাবু হেরম্বচন্দ্র কুণ্ডু যথাসাধ্য এই সকল কীর্তি কতক কতক বজায় রাখিয়াছেন।

এই সময় সেনগ্রামবাসীগণকে নীল-সাট্টা লইয়া নীল বুনিয়া দিতে হইত। সে নীলের কাহিনী মনে হইলে প্রাচীনেরা এখনও চমকিয়া উঠেন। অল্পাধিক পরিমাণে সকল নীলকরই অত্যাচারী ছিলেন। তখন কুঠিতে কুঠিতে দেশ নীলক্ষেত্র ও নীলকরের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। দীনবন্ধু-বাবুর (মিত্রের) 'নীলদর্পণ'-এ এবং কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ার মীর মোশারফ হোসেনের 'কেনী কাহিনী'তে পাঠকবর্গ অনেক চিত্র দেখিতে পাইবেন। সেনগ্রামেও ঐ সকল অত্যাচারের লীলাখেলার অভিনয় হইত সন্দেহ নাই।

ধোকড়াকোলের ক্রফোড, স্টিফেন সাহেব এ দেশের লর্ড বা হর্তা-কর্তা-বিধাতা ছিলেন। তাঁহাদের কথা সংক্ষেপে কিছু বলা যাইবে।

বাংলা ১২৪৪ সালে কুঠির ইজারা শেষ হইলে আমাদের রাজা-বাহাদুর (কৃষ্ণনাথ) স্বহস্তে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। সেনগ্রামের

সুখের দিনের মধ্যে যে নীলকর ইজারাদারের দুর্দিন মেঘকুয়াশা দেখা গিয়াছিল তাহা খোলসা হইয়া আমাদের ভাগ্য চিরকালের জন্ম সুপ্রসন্ন হইয়াও এক বিষম বিষাদময়ী যবনিকা সমক্ষে উপনীত হইলাম। মহারাজা বাহাদুর কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া কলিকাতার জোড়াসাঁকো ভবনে ১৮৪৫ সালে আত্মহত্যা করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজা যুবা বয়সে বিপুল ঐশ্বর্য ধনসম্পত্তি ও দীন দুঃখী প্রজাগণকে কেন যে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন তিনিই জানেন। শোনা যায় তিনি অতীব শিকার-প্রিয় ছিলেন, বহু সংখ্যক মূল্যবান শিকারী কুকুর ও অশ্ব ও বহুতর লোকজনসহ প্রায়ই শিকারে ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি এমন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন যে তৎকালীন অনেক ধনী মানী ও বড় বড় গভর্ণমেণ্ট কর্মচারীরাও তাঁহার সমক্ষে সভয়ে কথা বলিতেন। তিনি শিকারে বহির্গত হইলে কি প্রকারে হঠাৎ তাঁহার শিকারী দলস্থ গোপাল নামে জনৈক ভৃত্য আহত হয় ও পরে তাহার মৃত্যু হয়। মহারাজা এই ক্ষুদ্র ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া কিছুদিন আদালতের লাঞ্ছনার ভয়ে অজ্ঞাত অবস্থায় জোড়াসাঁকো রাজভবনে থাকিয়া একদিন হঠাৎ দ্বিতল গৃহে রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া হস্তস্থিত পিস্তলের গুলিতে দেহত্যাগ করেন। চারিদিকে হাহাকার উত্থিত হইল। মহারাজা কৃষ্ণনাথ বাহাদুরের খ্যাতি প্রতিপত্তির ও ধন ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। ঈদৃশ ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাঁহার ভীত হওয়ার কোনই কারণ ছিল না। কিন্তু বিধির বিধান ঘটিবেই ঘটিবে।

মহারাজা বাহাদুরের সহধর্মিণী লক্ষ্মীস্বরূপা প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা আমাদের চিরস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীকে বঙ্গের প্রজাপুঞ্জের মাতৃত্বভার লইয়া নিজে অগ্রসর হইলেন। আমরা সেনগ্রামবাসীরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে পিতৃহারা হইয়া জননীর স্বর্গীয় অনুপম স্নেহে আপ্লুত হইয়া ক্রমে সে শোক-সন্তাপ ভুলিতে লাগিলাম। পিতৃহীন বালকের জননী থাকিলে আর কি অভাব থাকে?

পাঠক, এখন সেনগ্রামের এই পুণ্যবতীর রাজত্ব-সময়ে উপনীত হইলাম। বাংলা ১২৫৩ সাল হইতে ইনি রাজ্যভার লইয়া প্রথমে রাজ্যের অনেক বিশৃংখলতা ও মামলা মোকদ্দমায় জড়ীভূত হয়েন। ঈশ্বর ইচ্ছায় দেওয়ান রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুরের অসাধারণ ধীশক্তি ও মহারাণীর ধর্মবলে সমস্ত গোলযোগই অচিরে তিরোহিত হইল। আমরা সুদূর সেনগ্রামে থাকিয়াও

রাইচরণ দাসের হস্তলিপি ।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

তাঁহার দয়া ও কৃপা সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। রাধাকান্ত মজুমদার, জগৎচন্দ্র মজুমদার, জীবনকৃষ্ণ সেন, পরপর তরফ হাবাসপুর নায়েবী করিয়া যাওয়ার পর এই সময় বাংলা ১২৫৯ সালে বিখ্যাত জগবন্ধু রায় তরফ হাবাসপুরে নায়েব নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। নায়েব রাধাকান্ত মজুমদারের আমলেই ইজারা ছুট হইয়াছিল, অতএব আমরা এখন পরের হাতে নাই।

নায়েব জগবন্ধু শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ অবস্থায় মহাবলীয়ান ছিলেন। তিনি একটি পাঁঠা এককাঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া তাজা রক্ত পান করিতেন। সঙ্গে একটি বৃহৎ রামদাও রাখিতেন। শত্রুগণ তাঁহার ভয়ে পশ্চাৎপদ হইত। প্রজাগণ ভয়ে ভীত হইলেও তিনি তাহাদের কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতেন না। দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন তাঁহার নিয়ম ছিল। তাঁহার সময় এদেশের অবস্থা বিশেষ আলোচনার বিষয় বটে। তিনি রাজপ্রতিনিধি—আমাদের ছোটলাট হর্তাকর্তা বিধাতা ছিলেন। এদেশে তখন সেনগ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম মধ্যে আড়ুদিয়ার বিখ্যাত ধনাঢ্য পরিবার ঘোষবংশ। ইঁহাদের ঐশ্বর্য ও গৃহ বিচ্ছেদ-কাহিনী উল্লেখযোগ্য।

দহপাড়ার জমিদারের কর্মচারী মোক্তার জগবন্ধু ঘোষ, রূপটের দত্তবংশ ও মহিষবাথানের রামকুমার সাহা, মহেন্দ্রপুরের ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার, আড়ুদিয়ার কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বিশেষ প্রতিপত্তিশালী মানুষ ছিলেন। ইঁহাদের সকলেই কোন না কোন প্রকারে নীলকুঠির সংশ্লিষ্ট অথবা আশ্রিত ছিলেন।

চতুর্দিকেই নীলকুঠি, মলাজেললাবাড়িয়া, পাটিকাবাড়ি, মাহিজপাড়া, নাজিরগঞ্জ, আমবাড়িয়া, হোগলা, জগন্নাথপুর, সানঘর-মাজুরা, এগ্রাকপুর, খোকড়াকোল, কানাইকান্দি, কুলবাড়ি, দয়ারামপুর, শিলাইদহ, গঙ্গাধরদি প্রভৃতি প্রায় পঞ্চাশ বর্গমাইলের মধ্যে অন্যূন কুড়িটি কুঠি ছিল। অধিকাংশ কুঠিই সাহেবদের। পাংশার জমিদার ভৈরববাবু ও গঙ্গাধরদির জমিদার ধরনীধরবাবুরও নীলকুঠি ছিল। দয়ারাম পুরের নিকট একটি চিনির কুঠি ও সদকীতে বানকের (রেশমের) কুঠি ছিল। সদকীর বানকের বা রেশমের কুঠি কুমারখালি বৃহৎ রেশমের কারবারের অধীন ছিল। এইসকল কুঠি ও কুঠিয়ালেই দেশ পূর্ণ হইয়াছিল। শস্য বলিতে নীল ও রেশম,

জমিদার বলিতে নীলকর সাহেব এবং চাকুরীয়া বড়মানুষ বলিতে নীলকুঠির দেওয়ান হইতে তাগাদগিরি পর্যন্ত বোঝাইত।

তখন সেনগ্রামের দুর্দশার অবধি ছিল না। সেনগ্রামবাসীদিগকে খোকডাকোলের কুঠির অধীনে নীলসাট্টা লইয়া নীল বুনিয়া দিতে হইত। একবার দাদন লইলে আর তাহা কোনমতেই পরিশোধ হইত না। ভাল জমি দেখিলেই তাগাদগিরি নীলের বেছন বুনিয়া দিত। আড়ুদিয়ার ঘোষ বাবুরা তখন জাহাঙ্গীরাবাদের এ প্রদেশের পাঁচ আনা রকম মালিকী সত্ব হরিপালের বাবুদের নিকট হইতে ইজারা লইয়া প্রভুত্ব করিতেছিলেন। গঙ্গাধরদি অঞ্চলে কুলনীয়ার ক্ষত্রিয়বংশীয় ধরণীবাবু নীলকুঠিয়াল ও জমিদার ছিলেন।

আরও কেনী কাহিনী ও ষ্টিফেন কাহিনী

তরফ দয়ারামপুরের জমিদার মানিকদহের বাবু মহিমচন্দ্র রায় ও সদরপুরের বিখ্যাত জমিদার প্যারীসুন্দরী* প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন। পাংশার ভৈরববাবু প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। সর্বোপরি মহারাণীর জমিদারি ও নায়েব জগবন্ধুর প্রতাপ খোকসাকোলের নীলকর সাহেবের যথেচ্ছাচার অত্যাচারের প্রতিবন্ধকতা সাধনে সমুন্নত দেখিয়া সাহেবদের চিত্ত কিঞ্চিৎ বিচলিত হইল। ইহার কিছুকাল অগ্রে বিখ্যাত কুঠিয়াল কেনীসাহেব অনেক জমিদারীকেই হস্তগত করিয়া তাঁহাদের জমিদারী নীলক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহেব ভৈরববাবু ও সদরপুরের প্যারীসুন্দরীর নিকট তাঁহার বাহাদুরী এককালে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ভৈরববাবুকে করতলগত করিতে না পারিয়া তাঁহার জমিদারী বাকি রাজস্বে নীলাম-খরিদ করিবার একটি পন্থা বহু চিন্তার ফলে কেনীর মানসপটে উদিত হইয়াও কোন ফল হইল না। কেনী মনে করিলেন ভৈরববাবুর বাকি রাজস্ব যশোহর কালেক্টরীতে লাটের দিন দাখিল যাহাতে না হয় তাহা করিলেই তো নির্বিবাদে নীলাম-খরিদ করিতে পারিবেন। এইজন্য রাজস্বের টাকা লাটের দিন যশোহর পৌঁছাইবার গন্তব্য পথে কেনী লাঠিয়াল নিযুক্ত রাখিয়া টাকা লুঠের সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিলেন। ওদিকে ঐ মন্ত্রনা ভৈরবের কানে অগ্রেই গিয়াছিল। তিনি যথাসময়ে অন্য পথ দিয়া টাকা নিরাপদে যশোহর রওনা করিয়া সম্পত্তি রক্ষা করিলেন এবং কেনীর প্লট বিফল করিবার জন্য টাকার থালিয়ায় খাপরা পুরিয়া কেনীর নির্দিষ্ট পথে পাঠাইয়া দিলেন। কেনীর লাঠিয়াল তাহাই লুঠ করিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। খুলিয়া কেনীর পরিতাপের

---

*এখানে পুর্বে-উল্লিখিত পরীসুন্দরীর বদলে প্যারীসুন্দরী নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সীমা রহিল না। কাজেই আর তিনি ভৈরবের প্রতি বৃথা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ক্ষান্ত হইলেন।

পশ্চিমে প্যারীসুন্দরী ও পূর্বদিকে মহারাণী স্বর্ণময়ী এই দুই প্রবল জমিদারের মধ্যে পূর্বদিকে মহারাণীর সহিত খোকছাকোলের স্টিফেন ও পশ্চিমে প্যারীসুন্দরীর সহিত সালঘর-মধুরার কেনী সাহেব সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। তখন এ দেশের জেলা পাবনা, থানা পাংসা ছিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কর্তৃপক্ষীয়গণ কেনীর সহায়তা করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না, অদূরদর্শী কেনী কি কুক্ষণেই প্যারীসুন্দরীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

কেনী ইংরেজ, সুতরাং কৌশল অতি সূক্ষ্ম। পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রায়ই কেনীর কুঠিতে কাছারি করিতেন। নির্ভীকা প্যারীসুন্দরী তাহাতে ভীতা হইলেন না। প্রজার রক্ষার্থে নীলকর-যমের হাত হইতে ক্ষীণবল নিঃসহায় দরিদ্র প্রজার রক্ষার্থে তিনি ভবিষ্যৎ চিন্তা ছাড়িয়া দিলেন। মান, জীবনও সম্পত্তি পণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে নিবিষ্ট হইলেন।

মহারাণীর জগবন্ধুর ন্যায় তাঁহারও একটি উপযুক্ত দেওয়ান ছিলেন। প্যারীসুন্দরী তাঁহাকে ষোলআনা ক্ষমতা দিয়া কেনীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। একদিন হঠাৎ প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়াল কুঠি আক্রমণ করিল। কেনী সেদিন কুঠিতে ছিলেন না। তাঁহার বিবি বুদ্ধি করিয়া নিজ প্রাসাদ হইতে টাকা ছড়াইতে লাগিলেন। লাঠিয়ালগণ তাহা কুড়াইতে কুড়াইতে সেদিনের রণ শেষ করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিল।

ইহাতে প্যারীসুন্দরী সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি দেওয়ানকে ডাকিয়া বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। এবার কেনী বুঝিতে পারিয়া নিজে যশোহর যাত্রা করিলেন এবং (যদি প্রহার হয়) পরমবন্ধু পাবনায় ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া স্বীয় কুঠিতে রাখিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট কিন্তু তাহা জানিতে পারেন নাই। তাঁহার নিকট দলবল বেশী ছিল না। এদিকে প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়াল কালীগঙ্গা পার হইয়া পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় দল বাঁধিয়া আসিতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট দারগাকে 'পাকড় লো' বলিয়া গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন। হতভাগা দারগা পাকড় লইতে গিয়া জীবনটি লাঠিয়ালের হাতে জন্মের মত দিতে

বাধা হইল। লাঠিয়ালগণ দারগার দেহ শত খণ্ডে ভাগ করিয়া আলমপুরের বিলের জলে মিশাইয়া দিল। কোন চিহ্নও পাওয়া গেল না।

আজুদিয়ার বাবু প্রাণনাথ ঘোষের সহিত এই সময় ধোকড়াকোলের স্টিফেন সাহেব একটি ক্ষুদ্র সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। সেকালের কোন ইংরেজ নীলকরের সহিত সংগ্রাম করিয়া কাহাকেও জয়লাভ করিতে দেখা যায় নাই। ইঁহারা দেশের লোককে হাত করিয়া দেশের লোকের সর্বনাশ করিতেন। দেশীয় দেওয়ান ও দেশীয় লোকজনকে হাত করিয়া ও কোন কোন দেশীয় জমিদারের আশ্রয় লইয়া অপরকে নির্যাতন করিতে কৃতকার্য হইতেন।

প্রাণনাথের সহিত বিবাদ করিয়া স্টিফেন মহা বিপদে পড়িলেন। লাভের মধ্যে বিলক্ষণ 'গাত্র-সেবা' প্রাপ্ত হইয়া আহত অশ্ব ও ভগ্ন পদ ও ভগ্ন হৃদয় লইয়া কুঠিতে ফিরিয়া গেলেন।

মাণিকদহের জমিদার মহিমবাবুর পত্নী ধনমণি দাসীর নিকট তরফ দয়ারামপুরের অনেক মৌজা ইজারা লইয়া ও ঘোষবাবুদের পাঁচআনা ইজারা লইয়া এক মহারাণী ও গঙ্গাধরদির জমিদারি ছাড়া এ অঞ্চলে ধোকড়াকোলের কুঠি একছত্র জমিদার হইয়া উঠিয়াছিল। স্টিফেন সাহেব না বুঝিয়া আবার ক্ষত্রিয়-তনয় গঙ্গাধরদির ধরনীবাবুর সহিত সীমানার দখল-বেদখল লইয়া বিবাদ করিতে গিয়া বিলক্ষণ উত্তম-মধ্যম প্রাপ্ত হইয়া এদেশ ছাড়িয়া তরফ হাবাসপুরের দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

ঘোষবাবুদের পাঁচআনা অংশ স্টিফেন দায় ঠেকাইয়া ইজারা লয়েন। বাবু প্রাণনাথ ঘোষ আজুদিয়ার মজুমদারদিগের বাড়ি লুঠ করার মোকর্দমায় আসামী ছিলেন। বিচারক পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট ক্রফোর্ড সাহেব ছিলেন। বলা বাহুল্য, ইনি স্টিফেনের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। স্টিফেন মজুমদারের পক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন, কাজেই আসামীদের দুর্ভোগ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একদিন প্রকাশ্যে বলিলেন, পাঁচআনা ইজারা দাও, মোকর্দমা এখনই ডিসমিস হইবে। ফলেও তাহাই হইল। স্টিফেন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহায়তা ও নিজ বাহুবল স্মরণ করিয়া কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। নীলকরদিগের অত্যাচার শেষসীমায়

উঠিয়াছিল। ইহার উপর দস্যুভয় এইসময় এতই প্রবল হইয়াছিল যে লোকের কিছুতেই শান্তি ছিল না।

সেনগ্রামের দক্ষিণপাড়ার পুকুরের ধারে একদল দস্যু বাস করিত। তাহারা গ্রামে কোন উৎপাত করিত না। অন্যত্র ডাকাইতি করিয়া সেনগ্রামে আনিয়া মালপত্রাদি বাটীর নিকট পুকুর ও জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিত। তবে বিশেষ লুকাইবারও প্রয়োজন ছিল না। তখন পুলিশের গতিবিধি কম ছিল। হাবাসপুরের উত্তরপাড়ার কুনি-বৈষ্ণবী একজন বিখ্যাত ডাকাইতের সর্দার ছিল। তাহার একটি আখড়া ছিল ও তাহাতে ১১ খানা ঘর ছিল। জয়রাম দাস বৈরাগী ঐ কুনি-বৈষ্ণবীর বংশধর। এই জয়রামের বস্তাকে আমরা তরফ হাবাসপুরের জমানবিশ ঈশ্বরচন্দ্র ভাদুড়ীর আশ্রয়ে বাস করিতে দেখিয়াছি। সদারাম মাল, নিয়ামৎ কল, সেনগ্রামেরও কেহকেহ এই ডাকাইতির সংস্রবে থাকিত। তাহাদের বংশধর এখনও সেনগ্রামে বাস করিতেছে। কুনি নিজেই অগ্রণী হইয়া হুকুম দিয়া ডাকাইতি করিত। আশ্চর্য সাহস। লুঠের মালাদি বাটীর পার্শ্বস্থ পুকুরে লুকান থাকিত। কুনি-ডাকাইতি লব্ধ অর্থ দ্বারা মহোৎসব, বৈষ্ণব ভোজন করাইয়া সদ্ব্যয় প্রদর্শন করিত। এরূপ সদ্ব্যয় বর্তমান সময়েও অনেক মহাপুরুষকে করিতে দেখা যায়। মাসিক দশটি মুদ্রা মাহিয়ানার অছিলায় অন্য উপায়ে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করতঃ পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধে দানসাগর, দুর্গোৎসবে যাত্রা গান ও বহু ব্যয় করিয়া নামগান করিয়া থাকেন, এরূপ লোক না দেখিয়াছি এমন নহে।

এই দুঃসময়ে সেনগ্রামবাসীর সুখ ছিল না। দিনরাত আতংকে তাহাদের নিদ্রা হইত না। একদিকে চোর ডাকাইতের ভয়, অন্যদিকে সাহেবের অত্যাচার। আবার যখন লড়াই উপস্থিত হইত তখন ইহাদিগকেই লাঠিয়াল সাজিয়া জাউলীর কচা ও লাঠি লইয়া বাহির হইয়া নিজ পক্ষ অথবা পক্ষাবলম্বী জমিদার পক্ষ অবলম্বন করিয়া গ্রাম ও আত্মরক্ষা করিতে হইত। সকল সময়েই ঈশ্বর সহায়।

নীল সাট্টা লইয়া সাহেবদের জোর জবরদস্তির বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল। প্রজাগণ তিষ্টিতে না পারিয়া জোটবদ্ধ হইয়া কলিকাতা মুজাপুর ভবনে মহারাণী স্বর্ণময়ী সমীপে উপস্থিত হইল। প্রজার আর্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি নায়েব জগবন্ধুকে ডাকাইয়া প্রজা-রক্ষার জন্য

উপযুক্ত হুকুম প্রচার করিলেন এবং নিজ এলাকা হাবাসপুরের নীলকুঠি স্থাপন করতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধনে সাহেবের কুঠি ফেল করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই সময়ে নীলকরের অত্যাচারের তদন্তের জন্ত কলিকাতায় 'হিন্দু-পেট্রিয়ট'-এর বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যত্নে গভর্ণমেন্ট একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। সেনগ্রামের প্রাণনাথবাবু, মহিষবাথানের দ্বারকানাথ সাহা, মহেন্দ্রপুরের ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি তাহাতে অত্যাচারের কাহিনী সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন।

বাংলা ১২৬২ সালে হাবাসপুর নীলকুঠি স্থাপিত হইয়া নীল আবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। দুরন্ত জগবন্ধুর প্রকোপে পড়িয়া খোকসা-কোলের কুঠির নীলাবাদ রসাতলে গেল। ঘোরতর বিবাদ অল্পদিন মধ্যে নির্বাপিত হইল। এই বিবাদে মহারাণীর পক্ষে সুবল নামক এক ব্যক্তি কুঠিয়াল-পক্ষীয় লোক কর্তৃক খুন হয়। জগবন্ধু প্রকৃত নিমকের চাকর ছিলেন। অর্থলোভে প্রতিপক্ষের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহাদের স্বার্থ-সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়ার দুর্ণাম অনেক কর্মচারীর বিরুদ্ধে শুনিতে পাওয়া যায়। জগবন্ধু সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি উৎকোচ লইলে কুঠিয়ালের নিকট অনেক উৎকোচ লইতে পারিতেন। তিনি নিজে আদালতে কেসে পড়িয়াও শতশত বাধাবিঘ্ন ও বিপদ তুচ্ছ করিয়া প্রজাগণকে রক্ষা করিয়া স্টিফেনকে জন্মের মত সেনগ্রাম অঞ্চল হইতে তাড়াইয়া দিয়া মহারাণীর অক্ষয় কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

ইহার প্রাক্কালে বাংলা ১২৫৯ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে এদেশে প্রবল ঝটিকা হয়। ইহা 'জষ্টিয়া ঝড়' নামে খ্যাত। ঐ ঝড়ে কত ঘর বাড়ি গাছপালা ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহার দশ বৎসর পর বাংলা ১২৬৯ সালে আরেকটি প্রবল ঝটিকা হয়। তাহার পর সনেই এদেশে আজকালকার তুলনায় ক্ষুদ্র, তৎকালীন পক্ষে এক বৃহৎ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেনগ্রামের কয়েকটি দরিদ্র পরিবারকে ওই সময় কচু ও শ্যামা ঘাসের বীজ ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতে দেখা গিয়াছে। তখন টাকায় ৮ মন চাউল বিক্রয় হইয়াও অন্নকষ্ট হইয়াছিল। এখন আমাদের অনেকেই টাকায় ৩ সের চাউল খরিদ করিয়া উদর পুরণ করিতেছেন।

এই কাল দুর্যোগ তিরোহিত হইয়া গেল। নায়েব জগবন্ধু জমিদারীর সুশৃংখলতা সাধন করিতে গিয়া হোসেনডাঙার শিরোমণি বিশ্বাস ও

সেনগ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাসের বিদ্রোহীতা দমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজসরকারের তৎকালীন আমমোক্তার নিতাইচাঁদ নন্দীর বুদ্ধিকৌশল ও সাহায্যে জগবন্ধু অচিরে শিরোমণিকে দমন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

নায়েব কৃষ্ণকান্তের আমল হইতে বাংলা ১২৫৮ সালে ঈশ্বরের পিতার আমল হইতে বিদ্রোহীতা আরম্ভ হয়। জগবন্ধুর আমলে বাংলা ১২৬৫ সালে বৈদ্যনাথ বিশ্বাস কবুলিয়াৎ দিয়া কিয়ৎকাল বাধ্যতা স্বীকার করে কিন্তু পরে তাহা স্থায়ী হয় না। যাহা হউক, জগবন্ধু নায়েবের পর সেনগ্রাম চিরকাল শান্তিতে কাটাইতেছে।

জগবন্ধুর পরবর্তী নায়েব তহশীলদার ও সদরের রাজীবলোচনের পর কর্তৃপক্ষীয়গণের রাজ্যশাসন প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই এই জমিদারী সংক্রান্ত নীরস শুষ্ক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব।

জগবন্ধুর পর তিলকচন্দ্র দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী, চন্দ্রনাথ মুন্সী, ঈশ্বরচন্দ্র ভাদুড়ী, কুঞ্জবিহারী সেন, দ্বিজপদ মল্লিক, শ্রীশচন্দ্র বসাই বাংলা ১৩০৪ সাল পর্যন্ত ও তৎপর লোহারাম চট্টোপাধ্যায় নায়েবী এবং বহুপূর্বে বদনচন্দ্র সরকার, হাবু বিশ্বাস, গোলকচন্দ্র নাগ, ঈশানচন্দ্র নাগ, দ্বারকানাথ বিশ্বাস, হরিমোহন বিশ্বাস, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, শ্রীনাথ মিত্র, মন্মথনাথ দত্ত সেনগ্রামের তহশীলদারী করিয়াছেন। মহারাণীর আমলেই সদরে রাজকার্য পরিচালনার জন্য বাবু শ্রীনাথ পাল বি, এল, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য, বীরচন্দ্র সরকার, শ্যামাদাস রায়, গোবিন্দচন্দ্র মিত্র, এই কয়জন দ্বারা একটি কমিটি সৃষ্টি হয়। বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকিলবাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন লিগ্যাল অ্যাডভাইসার নিযুক্ত ছিলেন। পরিশেষে মহারাণীর আমলেই কমিটি ভঙ্গ হইয়া যায়, শ্রীনাথ পাল বাহাদুর ম্যানেজার ও মৃত্যুঞ্জয়বাবু সহকারী ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েন। ইঁহাদের আমলে জমিদারী সেরেস্তার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট নিয়মাবলী ও নিয়মানুসরণে সেরেস্তার উৎকর্ষ সাধন হয়। মফঃস্বলেও তরফ হাবাসপুরের অধীন সেনগ্রাম প্রভৃতি কয়েকটি ডিহি সংস্থাপিত হয়।

ম্যানেজার রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর অতি দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছেন। নায়েব ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাসের আনুগত্য ছিল। বাংলা ১২৮১ সালে সেনগ্রাম একলাখী জরিপের প্রস্তাব

হইলে গ্রামস্থ প্রজাগণ নায়েব ঈশ্বরকে বাধ্য করিয়া প্রথমত জরিপ স্থগিত করিয়া দেন। কিন্তু অমানবিশ ঈশ্বর ভাদুড়ী বাধ্য হইলেন না। তিনি রাজধানীর আদেশ লইয়া সেনগ্রাম জরিপ করিতে আসিলেন। ঈশ্বর বিশ্বাসের বাটীতে প্রজাগণ সমবেত হইয়া জরিপ বন্ধ করিবার জন্য ধর্মঘট করে। কিন্তু বাঙ্গালীর জোট চিরকালই একরূপ। ঈশ্বর ভাদুড়ী যখন জরিপ করিতে আসিয়া লবণ ফকিরকে জরিপের জন্য জমি নিশানদিহী করিতে ধরিয়া লইল তখন গরীব লবণ দলের কথামত দলস্থ লোকের সাক্ষাতে অবাধ্যতা প্রদর্শন করিয়া বিলক্ষণ উত্তমমধ্যম প্রাপ্ত হইল। দলস্থ লোক ভয়ে একটি কথাও বলিল না। দল ভাঙিয়া গেল, জরিপ শেষ হইল।

আবার জমাবন্দীর সময় জোট হইল। সুযোগ্য মেম্বার বীরচন্দ্রবাবুর অপরিসীম যত্ন ও অধ্যবসায়ে সে জোট ভঙ্গ হইয়া নির্বিবাদে জমাবন্দী হইল। সকল প্রজা জোট ভাঙিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস একাকীই রহিলেন, কিছুতেই জমাবন্দী করিলে না। কত জমি অন্যের স্বত্বাধিকারে চাপাইয়া দখলকার্য লইতে বলিলেন রাজসরকারের পক্ষ হইতে তাহা দখলোদ্ধারের চেষ্টা হইতে লাগিল। ঈশ্বরকে অনেক বুঝান হইল, কিছুতেই বাধ্য হইল না। এই জমির দখিলকার প্রজা কুঞ্জ সাহাকে ডাকাইয়া মেম্বার বীরচন্দ্র কবুলিয়ৎ দিতে বলেন। ইহাতে তাঁহার নামে একটি ফৌজদারী মোকর্দমা হয়। আমি ইহার কিছুদিন আগে আমমোক্তার নিযুক্ত হই।

মোকর্দমায় জয়লাভ হয় ও মহারাণী আমাকে উপযুক্ত অর্থ ও কাশ্মীরী শাল পুরস্কার দেন। বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ নিঃস্বার্থভাবে মহারাণীর আমলে এ অঞ্চলে জমিদারী কার্য নির্বাহের প্রধান সহায় ছিলেন। অনেক গোলযোগ তিনি অতি কৌশলে ও সহজে মিটাইয়া দেন।

মহারাণীর আমলে সেনগ্রামের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। তিনি হাবাসপুরে যে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন, সেনগ্রাম ও এঅঞ্চলে অনেক দরিদ্র বালক তাহাতেই বিদ্যালাভ করিয়াছে। আমিও হাবাসপুর অবৈতনিক বিদ্যালয়ে অনেকদিন অধ্যয়ন করিয়াছি। সেনগ্রামের উত্তর-দক্ষিণ দীর্ঘ যে রাস্তাটি আছে উহা মহারাণীর প্রসাদাৎ। এতদঞ্চলে বড়ইচারা, ধুসন্ডু, কুমারখালি সকল স্থানের বিদ্যালয়েই মহারাণীর সাহায্য

ছিল। সেনগ্রামে আমার বাসস্থানের পুষ্করিণী খননে তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার দানের কত বর্ণন করিব।

কুমারখালির 'গ্রামবার্তা' পত্রিকা মহারাণীর দানভাণ্ডার হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য পাইয়া বহুদিন জীবিত ছিল। মহারাণীর দান জগদ্বিখ্যাত। তিনি ইং ১৮৭৮ সালে গভর্ণমেণ্ট হইতে M.I.O. C.I. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সর্বসাধারণের হিতকর কার্যে তাঁহার রাজকোষ সর্বদা উন্মুক্ত থাকিত।

আমাদের পুণ্যবতী মহারাণী বাংলা ১৩০৪।১০ই ভাদ্র বুধবার মানব-লীলা সম্বরণ করিলে মহারাজা কৃষ্ণনাথ বাহাদুরের ভাগিনেয় বর্তমান মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর রাজাসন অধিকার করিয়াছেন। আমরা এই মহাত্মার আমলে প্রজাপুঞ্জের সুখ সমৃদ্ধির ও সেনগ্রামের উন্নতির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণন করিব।

কাশিমবাজারের মহারাজা
মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

জন্মান্ধ বালক জননী-ক্রোড়ে শায়িত হইয়া পীযূষ পান করতঃ ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে জননীর অপার মহিমা অনুভব করিয়া পরমানন্দে আপ্লুত হয়। কে এতদিন আহারীয় দ্রব্য প্রদান করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছে, কে তাহার প্রাণের প্রার্থনা না বলিতে নিজেই বুঝিয়া তাহা পুরণ করিয়া দিয়াছে, কে কাছে-কাছে থাকিয়া দিবারজনী সর্বপ্রকার বিপদ-আপদের' হাত হইতে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নিরাশ্রয় 'অক্ষম বালককে রক্ষা করিয়াছে, পরমপিতা অন্তর্যামী পরম দয়ালু বিশ্বজননীর প্রতিনিধিস্বে কে সাক্ষাৎ মূর্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া বালকের সকল অভাব দুর করিতেছে,—বালক তাহাকে দেখিবার জন্য মহা ব্যাকুল হইয়া সাধ্যাতীত অবস্থায় প্রাণের আকাংখা প্রাণেই পর্যবসিত করে।

আমরাও সেনগ্রামবাসীগণ বিদ্যাবুদ্ধি ধন-সম্পত্তি সর্বপ্রকারে দীনহীন প্রজা-সন্তানগণ প্রায় ৬০ বৎসরাধিক অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরবাসিনী দীন-জননী মহারাণী স্বর্ণময়ীর সুদুর প্রবাহিত কৃপা প্রেম-বারি বহন করিয়া জীবন ধারণ করিয়া হৃদয়ে আনন্দ আকাংখা সত্ত্বেও জননীকে দেখিতে পাই নাই। প্রাণের গভীর আকাংখা এতকাল অপুর্ণই ছিল। অন্তর্যামী পরমেশ গরীবদিগের প্রাণের অন্তঃস্থলীয় গভীর আকাংখা পুর্ণ করিবার জন্য মহারাণী স্বর্ণময়ী-তুল্য দেবপ্রকৃতির একটি মহাপুরুষকে তাঁহার স্থলে স্থাপন করিয়া সর্বতোভাবে সে অভাব পুরণ করিয়াছেন।

মহারাজা বাল্যকাল হইতেই জগতে অলীক অসার আমোদ-প্রমোদ, বিলাসিতা ও পাপের প্রলোভন হইতে ভগবানের ইচ্ছায় ও কৃপায় আপনাকে দুরে রাখিয়া প্রায় ৪০ বর্ষাধিক বয়সে রাজ্যভার লইয়া এই গরীবদিগের কল্যাণের ভার, ও ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়া জীবনের মহাপরীক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিভাগীয় বিচারকগণ এদেশের বিচারাসনে বসিবার পুর্বে যেরূপ এদেশের লোকের ভাষা সকল কতক শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন, অপরিসীম ধনাধিকারী মহারাজাকে তদ্রূপ এই দরিদ্র প্রজাপুঞ্জের দরিদ্র

জীবনের হৃদয়ের ব্যথা বুঝিবার জন্ত ঈশ্বরের আদেশে দানশীলা মাতুলানীর দানক্ষেত্রের মধ্যে বাস করিয়াও দরিদ্র-তত্ত্বের প্রথমভাগে কয়েক পৃষ্ঠা উদঘাটন করিতে হইয়াছে। মহাকবি মিলটন ও হিন্দু শাস্ত্রকারগণের মতে এই তত্ত্বজ্ঞান জগতের বিলাস রাজ্যের অহংকার, দম্ভ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি রাক্ষসী প্রলোভন হইতে রক্ষা পাইবার প্রধান উপায়। তজ্জন্তই জগৎপিতা জগদীশ্বর মহারাজকে জীবনের এই প্রথমভাগে দরিদ্রতত্ত্বপাঠে ব্যাপৃত রাখিয়া তাঁহাকে জীবন-সংগ্রামের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সুযোগ করিয়া দিয়া তাঁহাকে এই দরিদ্র প্রজাপুঞ্জ ও স্বদেশবাসী সকলের সর্বপ্রকার হিতার্থে ধনরাশি ও ক্ষমতা হস্তে দিয়া মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়াছেন।

রাজ্যলাভ করিবার পূর্বেও যেরূপ পরেও সেইরূপ। ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা তাঁহার সিদ্ধ চরিত্রে বৈকল্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। ধন্ত পরীক্ষা! ধন্ত সেনগ্রামবাসী! তোমার পরম সৌভাগ্য! ধনসম্পদের মধ্যে নির্লিপ্ত থাকিয়া আদর্শ চরিত্রবান হওয়া মানবজীবনে সম্ভব, ইহা শাস্ত্রেই লিখিত আছে। মহর্ষি জনকের কথাও শুনিয়াছি। কিন্তু বর্তমান মানবচরিত্র পাঠ করিয়া ঐসব ঐতিহাসিক ঘটনা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি জন্মে নাই। এই মহাত্মার সহিত যাঁহাদের আলাপ পরিচয় হইয়াছে তাঁহারা তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া উহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে কিছুমাত্র কষ্টপ্রাপ্ত হয়েন না। শুধু অহমিকাশূন্ত, দম্ভশূন্ত, নিষ্কলঙ্ক, বলিলে তাঁহার চরিত্রের ব্যাখ্যা পরিসমাপ্তি হয় না। স্বার্থত্যাগ ও ক্ষমাশীলতা শিক্ষা করিতে হইলে তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিতে হয়।

রাজ্যলাভের সময় পূর্বতন ম্যানেজার মহোদয়ের সহিত বিবাদ নিষ্পত্তিকালে তাঁহার স্বার্থত্যাগ ও ক্ষমাশীলতার সাধু দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছেন। মিতব্যয়িতা তাঁহার চরিত্রে অন্ততর সদগুণ। শত্রু ও অপরাধী মিষ্টভাষা ব্যবহারের উপযুক্ত পাত্র না হইলেও পাত্রাপাত্র নির্বিশেষে তাঁহার মিষ্ট ভাষায় কেহই কোন সময় বঞ্চিত হয়েন না। ধূমপান হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের যাঁহার যাহা ইচ্ছা করিয়া থাকেন, এই মহাত্মা সে সর্বপ্রকারের বিরোধী।

পোষাক-পরিচ্ছদে কথাবার্তায় মহারাজাকে দেখিয়া অনেকেরই ভ্রমোৎপত্তি হইয়া থাকে। এতদঞ্চলের অনেক ভদ্রলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়া প্রথমে তাঁহাকে মহারাজা বাহাদুর বলিয়া চিনিতে

পারেন নাই। অধীন ও অমাত্যবর্গ-মুখে প্রশংসাদি শুনিয়া অনেক সময় প্রকৃত তত্ত্ব লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। কী প্রজাবর্গ, কী জনসাধারণ সকলেই তাঁহার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াছে।

সেদিন দূরদেশে যশোহর অঞ্চলে গিয়াও একজন গরীব লোকের মুখে শুনিলাম আপনাদের মহারাজার সহিত নাকি যে কেহ দেখা করিতে পারে? তাঁহার নাকি অহংকার বলিতে কিছু নাই? শুনিয়া হৃদয়ের আনন্দ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। সত্যসত্যই, ঈশ্বর দরিদ্র সেনগ্রামবাসীর চির-অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন। প্রজাপুঞ্জের জন্য দরবারের দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত। তাহারা শুধু মহারাজের দর্শনে নহে, তাঁহার মিষ্টভাষা শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত লাভ করিতেছে। কোন কারণে যাহার স্বার্থ ও প্রার্থনা পূর্ণ হয় না, সেও মিষ্ট-কথা ও সদ্ব্যবহারে প্রীত হইয়াই গৃহে সমাগত হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইলাম না। অতি প্রত্যূষে উঠা আমার অভ্যাস দোষে সুকঠিন হইয়াছে। দিবানিদ্রা কার্যানুরোধে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি। দেশহিতকর সমাজহিতকর কার্যে তাঁহার অপরিসীম উৎসাহ দেখিয়া নিজের অসারত্ব স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইয়াছি। এই দেশের শিল্পোন্নতি সাধনে তিনিই অগ্রণী।

প্রজাপুঞ্জের সুখ-সমৃদ্ধির প্রতি মহারাজা বিশেষ দৃষ্টি লইয়াছেন। ইহাদের ভূ-সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বিসম্বাদ ও সর্বপ্রকার আবেদনাদি সূক্ষ্মতার সহিত মীমাংসা করিয়া দেন।

কী কর্মচারী, কী প্রজাপুঞ্জ, সর্বসাধারণের যাহার যাহা আবশ্যক, তাঁহার সমীপবর্তী হইয়া সাক্ষাৎভাবে জানাইবার কোনই বাধা বিঘ্ন নাই। তিনি সমাদরে সকলের কথাতেই কর্ণপাত করিয়া যথাসাধ্য তাহার প্রতিকারের জন্য যত্নবান হয়েন।

সেনগ্রাম! তোমার অভাবের অভাব নাই। সর্বাগ্রে জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহার সাহায্য চাহিয়া একটি মধ্যশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রাপ্ত হইয়াছ। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ মহারাজার স্বর্গীয়া জননীর নামানুসারে বিদ্যালয়ের নাম 'গোবিন্দসুন্দরী' হইয়াছে। এই মহাকীর্তির দ্বারা দেশ-বিদেশে সকলের মুখে প্রতিনিয়ত তাঁহার পবিত্র নাম প্রচারিত হইতেছে। এই অক্ষয় কীর্তি দরিদ্র প্রজাবর্গের জ্ঞানমার্গের পথ প্রসারিত করিয়া দিয়া যে মহপোকার সাধন করিতেছে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ব্যতীত কোন প্রকারে

প্রজাগণের তাহার প্রতিকার করিবার সামর্থ নাই। তিনি স্কুল পরিদর্শনে উপস্থিত হইয়া এই অধমের কুটীরে পদার্পণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

রাস্তাঘাট সম্বন্ধে অভাব গুরুতর। স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী মহাশয়া গ্রামের যে রাস্তাটির ভিত্তি স্থাপন করিয়া দিয়া স্থানীয় বোর্ডের হস্তে তাহার প্রতিপালনের ভার দিয়াছেন, তাহার শাখা প্রশাখাগুলি যত্নাভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। গ্রামের পশ্চিম ও পুর্বদিকে আদৌ রাস্তা নাই।

সেনগ্রামবাসী। এই অভাবটি মহারাজ সমীপে নিবেদন করিতে উদাসীন হইও না। তোমরা ডাকঘর প্রাপ্ত হইয়াছ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা একটি মহা অভাবজনিত কষ্টে তোমরা সকলেই কষ্ট পাইতেছ। তাহার কোন প্রতিকার হইতে পারে না বলিয়া তোমাদের বিশ্বাস। আশ্চর্য, তোমাদের বিশ্বাস। তোমাদের প্রজা-প্রতিপালক ভু-স্বামীকে জানাইলেই তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের শেষ হইল। প্রতিবিধান তাঁহার হস্তে। গ্রামে একটিও সুচিকিৎসক নাই। কলেরা হইলে বাতাস-লাগা বলিয়া জলপড়া, প্লীহা হইলে গোমূত্র সেবন, হিষ্টিরিয়া হইলে ভুতের মন্ত্র প্রয়োগ, জ্বর হইলে হরির নামে তেঁতুল গোলা সেবন—এ সকল ব্যবস্থার আর দিন নাই। সেকাল চলিয়া গিয়াছে। এখন গ্রামে পেটের দায়ে তোমাদের মধ্যে কয়েকজন কুইনাইন লইয়া তোমাদের চিকিৎসা-বিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে বটে, তাহাতে সামান্য জ্বরে কিছুকিছু প্রতিকার হইতে পারে, কিন্তু অবিরাম জ্বর ও নানা প্রকার উৎকট ব্যাধি ও অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধে তোমরা সম্পূর্ণ নিরুপায়। দশ ক্রোশ দূর হইতে চিকিৎসক আনিতে তোমাদের সাধ্য কোথায়? গ্রাম্য কুইনাইন-ব্যবসায়ী চিকিৎসকগণ চার পয়সার কুইনাইন দিয়া তোমাদিগের নিকট তাহার একশত গুণ আদায় করিয়া লইয়াও তাঁহাদের দাবী শোধ হয় না। কী পরিতাপের বিষয়। ইহার কী সদুপায় নাই?

ঐ দেখ ঠাকুর-জমিদারেরর জমিদারী শিলাইদহ কাছারির পাশেই প্রজাপুঞ্জের জন্য একটি সুচিকিৎসকসহ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়া কী উপকার করা হইতেছে। অন্যের কথা কী বলিব, তোমাদের মত নিরন্ন ব্যক্তিকেও ধার করিয়া কুইনাইনের দেনা শোধ করিতে বৎসরে গড়ে দুইটি টাকা দিতে হয়। ইহার কি সুব্যবস্থা হইতে পারে না? কল্যানপুর,

সেনগ্রাম, জয়কৃষ্ণপুর, হাবাসপুর, বানিয়াখানপুর, ধুসর, বড়ইচারা, লক্ষ্মণদিয়া, মহারাজার এই কয়েকটি জমিদারী মৌজার কেন্দ্রস্থল সেনগ্রাম। এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় সহজেই স্থাপিত হইতে পারে। যদি তোমরা জমার উপর প্রতি টাকায় এক পয়সা হিসাবে বার্ষিক চাঁদা মহারাজের রাজকোষে প্রদান কর তাহা হইলে সংগৃহীত অর্থ ও মহারাজের সাহায্যে অনায়াসে একটি উপযুক্ত ডাক্তারসহ দাতব্য চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইতে পারে। ঔষধালয় নির্মাণের ব্যয় ৫০০ টাকার অধিক নহে। তজ্জন্য তোমাদিগকে ভাবিতে হইবে না। তোমরা নিতান্তই দয়ার পাত্র। নিজের পীড়া নিজে চিকিৎসা করাইতে সমর্থ নহ। শিশু কাঁদিয়া হৃদয়ের ক্ষুধা জানায়, বোবা কাঁদিতে পারে না, তথাপি তাহার অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে।

পরমেশ্বর তোমাদের উপর সদয় হইবেন। মহারাজার কৃপাদৃষ্টি তোমাদের উপর শীঘ্রই আকৃষ্ট হইবে। আমরা রামরাজ্যে পরম সুখে বাস করিতেছি। বহুদিনের পর পরম পবিত্র আদর্শ ভু-স্বামীর দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আমরা মহারাজের দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি।

শিক্ষা ও উপদেশের আবশ্যক

শিক্ষা কথাটি শুনিলেই আমরা স্কুলের লেখাপড়া এবং শিক্ষিত লোক বলিলেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তিগণকে বুঝিয়া থাকি।

শিক্ষার এই সংকীর্ণ একদশাভাব হৃদয়ে পোষন করিয়া আমরা জনসমাজের অনেক অনিষ্ট সাধন করিয়াছি। শিক্ষার এই ব্যাখ্যা লোককে শিক্ষা দিয়া ভুল পথে চালিত করিয়াছে। অথচ আগে আমরা পূর্বপুরুষদিগের নিকট কত না শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহারাই আমাদের শিক্ষকের শিক্ষক। মানুষের স্মরণশক্তিতে জীবনের বহিস্থ ব্যাপার ও লেখাপড়া কৌশলে আমাদের শিক্ষার সীমান্তর্গত হইতে পারে। এই লেখাপড়া শিখিয়া আমরা বহু উল্লেখযোগ্য পূর্ব ঘটনা যাহা জীবনে বা স্মরণশক্তিতে উপস্থিত করা অসম্ভব, তাহা জাজ্জল্যমান জানিতে পারিতেছি। সুতরাং লেখাপড়া আমাদের সর্বোপরি কর্তব্য হইলেও লেখাপড়াকে শিক্ষা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

প্রকৃত শিক্ষার বিষয় পরমেশ্বরের সত্য নিয়ম ও জগতের কার্য প্রণালী। প্রকৃত শিক্ষক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ এবং বিশ্বের আবালবৃদ্ধ নরনারী সকলেই জাতি নির্বিশেষে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বি-এ, এম-এ-র ন্যায় এই শিক্ষার পরিসমাপ্তি নাই, কখনও শিক্ষার শেষ হয় না। এই বিশ্বের নিয়ম শিক্ষা না করিয়া কেহই এ জগতে বাস করিবার অধিকারী নহে। মাতার নিকট আমাদের প্রথম শিক্ষা, তাহার পর পৃথিবীর সমস্ত পদার্থের নিকট, অধিক কি, সামান্য পিপীলিকার নিকটও আমরা শিক্ষা লাভ করিতেছি।

ভাই সকল, তোমরা শিক্ষা করিতেছ কি না তাহার পরীক্ষা প্রতিনিয়ত হইতেছে। যিনি যেরূপ শিক্ষা করিতেছেন, শারীরিক মানসিক, তিনি তাহার তদনুরূপ ফল পাইতেছেন। শরীরতত্ত্ব শিক্ষা করিতে যাহার অভিরুচি আছে তাহার তাহা পূর্ণ হওয়া সুকঠিন। তোমাদের মধ্যে অনেকে স্ত্রী-শিক্ষার নাম শুনিলে চমকিয়া উঠিবে। কিন্তু দেখিবে স্ত্রীলোকদিগের

নিকটও তোমরা শিক্ষা করিতেছ। পরস্পরের নিকট পরস্পরে শিক্ষা ব্যতীত এই মানব সমাজ রক্ষা হইতে পারে না।

যেরূপ বিদেশে ভ্রমণকালে পথ-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে পথ-শিক্ষা করিতে হয়, এই সংসারেই আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত আমাদিগকে অনেক শিক্ষা করিতে হয়, অনেক উপদেশ লইতে হয়। শিক্ষা ও উপদেশ ব্যতীত আমরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। আমাদের সুখ সমৃদ্ধির জন্য যেসকল জিনিস আবশ্যক, শিক্ষার সাহায্যে তাহার উৎকর্ষ সাধন করাও আবশ্যক। এই শিক্ষা মুখেও হইতে পারে। কৃষি-শিক্ষা ও শিল্প-শিক্ষার উপর মানব সমাজের উন্নতি ও জীবনধারণ নির্ভর করিতেছে।

ভাই কৃষক ও শিল্পকারগণ, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমাদের কার্য বিনাশিক্ষাতে হয় কিনা? তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা কি বিনা শিক্ষায় হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, তবে দেখ দেখি শিক্ষা কত আবশ্যকীয়। এই শিক্ষাকে তাচ্ছিল্য করা কর্তব্য নহে। তোমরা যাহা শিক্ষা করিয়াছ তাহাতেই সন্তুষ্ট। তোমরা অধিক শিক্ষা করিতে চাও না। এই একটি প্রধান দোষ। ইহা অপেক্ষা আরও একটি দোষ আছে, তাহা এই—তোমরা আত্মচিন্তা ও আবিষ্কারের দিকে এক পদও অগ্রসর হইতে নারাজ। শিক্ষাভিমানী যুবকগণ যাহা শিখিলেন ঠিক তাই শিক্ষা দিলেন। তোমরাও সেইরূপ লাঙ্গল প্রস্তুত করিতে যেরূপ শিখিলে, তাহার উপর এক ক্রান্তি অন্যরূপ করিতে হইলেই তোমাদের বুদ্ধি পরাস্ত হইয়া যায়। কিন্তু ইংরাজরা সেরূপ নহে। উহারা সংসারের সকল বিভাগেই অর্থাৎ কৃষি, শিল্পবিদ্যা সকল কার্যের নূতন নূতনভাবে কার্য করিতেছেন, নূতন আবিষ্কার করিতেছেন।

তোমাদিগকে মুখে আটকানো কঠিন। আবিষ্কারের কথা বলিলেই তোমরা সেকালের বিশ্বকর্মা প্রভৃতির নাম করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত, এ বিষয়ে তোমরা ইংরেজদিগের অপেক্ষা কত পশ্চাতে পড়িয়াছ। ইংরেজ মানুষ, আর তোমরা কি মানুষ নও? ঈশ্বর কি তোমাদিগকে ইংরাজদিগের ন্যায় বুদ্ধি ক্ষমতা প্রদান করেন নাই? চিরকাল কি সংসার একরূপ চলিবে? যেখানে যেরূপ সেখানে সেরূপ। শিক্ষার একই রূপ থাকিলে, আমাদের নিত্য উন্নতি এবং পরিবর্তনশীল জীবনের আকাঙ্খা পরিপূর্ণ হইবে না। আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান অনন্ত। আমরা

অনন্তকাল শিক্ষা করিয়া তাহার উন্নতি না করিলে আমাদের সুখ সমৃদ্ধির আশা নাই। আমাদের উন্নতির জন্য অন্যের মুখ চাহিতে হইবে কেন? দেখ দেখি ভাই, আমরা কিসের জন্য ইংরাজের গলগ্রহ হইয়াছি? নানাবিধ দ্রব্য ইংরেজেই এখন ভাল তৈয়ারী করিতে পারে। ছুরি, কাঁচি, চেয়ার, টেবিল, ঘর, দরজা সকলই ইংরেজের হাতে ভাল হয়। ইংরেজের গাড়ী না হইলে আমরা চলিতে পারি না। কলকারখানা বলিতে আমাদের কিছুই নাই। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, ভারতের অসংখ্য মানুষ শিক্ষা এবং উপদেশ অভাবে এ সংসারে ভাল করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াছে। নাবালক ও বিকলাঙ্গ অকর্মন্য ব্যক্তিগণ যেরূপ সবল ও উপযুক্ত ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণে থাকিয়া জীবনধারণ করে, আমরাও সেইরূপ অকর্মন্য এবং বিকলাঙ্গ হইয়া সংসারযাত্রার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়াছি। কারণ শিক্ষার অভাব।

ভাই কৃষক এবং শিল্পকারগণ, তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছ? তোমরা একই বৃক্ষের দুইটি ফুল। তোমাদের একটির অভাবে অন্যটি অকর্মন্য। উভয়েই সংসারের তুল্য উপকারী। দুইটির উপরেই সংসার চলিতেছে। তোমরা উদাসীন অকর্মণ্য হইলে চলিবে না। তোমরা অলস ও নিশ্চেষ্ট হইলে চলিবে না। কৃষি ও শিল্প শিক্ষার অভাব অনুভব কর। কৃতসঙ্কল্প হও, শিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া শিক্ষা কর। দীননাথের রাজত্বে তোমাদের সৎকার্যের পুরস্কার অবশ্যই পাইবে। আমি তোমাদের শিক্ষা কি দিব? তোমাদিগের নিকট শিক্ষা করিবার আমার অনেক আছে। তবে অনুনয়ে এই মাত্র বলিতেছি, যাহা আছো তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। পরস্পর হিংসা দ্বেষ ও ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে কৃষি ও শিল্প শিক্ষায় মনোনিবেশ করিবে। তোমাদের ব্রত ও কার্য পৃথিবীর সর্ব কার্যের শ্রেষ্ঠ।

আমরা তোমাদের প্রতি অসৎ আচার করিয়া এতদিন যে পাপ করিয়াছি, তোমাদিগকে ঘৃণা করিয়া যে মূঢ়তার পরিচয় দিয়াছি, এখন তাহার বিষময় ফলভোগ করিবার সময় উপস্থিত। বর্তমান কৃষি ও শিল্পের অবস্থা দেখিলে মনপ্রাণ অবসন্ন হইয়া যায়। সোনার ভারতে এখন দুর্ভিক্ষ, শিল্পকার্য বিলোপপ্রায়। শিক্ষা! শিক্ষা!

আবার সুসময় আসিবে, বঙ্গের দুরবস্থা শীঘ্রই অপনীত হইবে। ভাই শিক্ষিত যুবকগণ! ভাই ধনীমানী জনগণ! তোমাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন, তোমরা এদেশে কৃষি ও শিল্পকারদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার কর নাই, তাহাদিগকে মানুষের মধ্যে গণনা কর নাই। তাঁহাদের যত্ন ও পরিশ্রমে প্রতিপালিত হইয়া নিতান্ত অকৃতজ্ঞের ন্যায় উহাদের সহিত মিলিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছ। মসীজীবিকা-লালসে জীবন বিক্রয় করিয়াছ। দাসত্বের প্রশংসা করিতে শিখিয়াছ।

যাহা হইবার হইয়াছে। এখনও সময় আছে। কৃষি ও শিল্প শিক্ষার দিকে সকলকে একচিত্তে অগ্রসর হইতে হইবে।

দায়িত্ব

আমরা বহুসংখ্যক দায়িত্ব লইয়া সংসারে আসিয়াছি। সেই দায়িত্ব অনুসারে কার্য না করিলে মহাপাপ হয়। আপন আপন বিবেক ও সৎ বিবেচনা অনুসারে কার্য করিবার দায়িত্ব আমাদের সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ। আমাদের দায়িত্ব কি কি, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করা সুকঠিন। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, শরীরের হস্তপদ, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ দ্বারা যে শরীরটি সুন্দর গঠিত হইয়া শারীরিক প্রক্রিয়া নির্বাহ হইতেছে তাহার কোন একটির অন্তরালে শরীরের নিশ্চয়ই খাপ্ত ব্যবস্থা হয়। সুতরাং প্রত্যেক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেইরূপ জগতেও পশুপাখি নরনারী বাহ্যবস্তু সকলের সহিত সকলের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে। এ সম্বন্ধ-জ্ঞানেই মানবের দায়িত্বের অভ্যুদয় হয়। সুদূর আমেরিকাবাসীর সহিত বনের তরুলতা পশুপক্ষীর আমার সম্বন্ধ। আমি এই সম্বন্ধ অনুসারে কার্য করিতে বাধ্য।

আমি কেবল আমার জন্য সৃষ্ট হই নাই। বৃক্ষের ফল কেবল বীজের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। বিস্তীর্ণ-সংসারে দায়িত্ব ও উদ্দেশ্য বিস্তীর্ণ ও অপরিসীম। জগতে ঈশ্বরের এই নিয়ম অপ্রতিহতরূপে আবহমানকাল চলিতেছে। আমরা যতই স্বার্থপর হই না কেন, যতই আত্মম্ভরিতায় মত্ত হই না কেন, সাক্ষাৎভাবে বা পরোপকারব্রতে যতই পরাঙ্মুখ হই না কেন, পরোক্ষ-ভাবে আমরা এই বিশ্বজনীন দায়িত্বের অধীনে থাকিয়া প্রতিনিয়ত দায়িত্ব পরিশোধ করিতেছি। ঈশ্বর আমাদিগকে সহানুভূতি প্রদান করিয়াছেন, তাই আমরা পরস্পর পরস্পরের সুখদুঃখে সুখী হই ও সহানুভূতি দেখাইয়া থাকি এবং আপনানুসারে অন্যের অভাব মোচন করিতে যত্নবান হই। ইচ্ছা না থাকিলেও বিদেশী অপরিচিতের হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে কাঁদিয়া থাকি। ক্ষুধার্তকে অন্ন, তৃষ্ণার্তকে জল না দিয়া থাকিতে পারি না।

এই প্রেম ও এই ভালবাসার সূত্রে জগতের নরনারী পশুপক্ষী সকলেরই সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সূত্র ছিন্ন করিবার কাহার ও সাধ্য নাই। বিধাতা নিজহস্তে এই ভালবাসার সূত্র জগতের সৃষ্টিকালে গ্রন্থন করিয়াছেন। আমরা

আজ এই ভালবাসা ও প্রেমের খাতিরে কৃষি-প্রদর্শনী মেলায় সকলেই একত্রিত হইয়াছি। কিরূপে পরস্পরের উপকার হয় চিন্তা করিয়া সেই মত প্রতিজ্ঞা করিব।

আমরা মনে করিতে পারি, আমি জন্মাবধি যত শিক্ষা করিতেছি, যত খাটিতেছি, যত বুদ্ধি সঞ্চালন করিতেছি তাহা অন্যের জন্য নহে, সম্পূর্ণ আমার জন্য। নেহাত পক্ষে অন্যের জন্য হইলে আমারই স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়ের জন্য ব্যতীত আর কাহারও জন্য নহে। কিন্তু বিশ্বপিতার রাজত্বে তাহা হইতে পারে না। আমার শিক্ষার সঙ্গে তদ্বারা অন্যান্য জীবের শিক্ষা ও উপকার হইবে। আমার খাটনী ও বুদ্ধির ফল আমি ইচ্ছা না করিলেও সহস্রজীব সম্ভোগ করিতেছে ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার কোনই আবশ্যকতা নাই।

কোন বৃত্তাকার জলাশয়ের কেন্দ্রে ঢেউ উঠিলে যেমন পরিধিতে তাহার পরিসমাপ্তী হয়, আমাদের দায়িত্বও সেইরূপ হাজার সংকীর্ণ হইলেও নিজ হইতে পরিবারে ও পরিবার হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিসমাপ্ত। কিন্তু পরোক্ষভাবে খাটিলে এই দায়িত্বে কোন উপকার দর্শে না। অজ্ঞাতসারে মিষ্টদ্রব্য উদরস্থ হইলে যেরূপ রসাস্বাদনে তৃপ্তি হয় না, দায়িত্বও সেইরূপ পরোক্ষভাবে অজ্ঞাতসারে সাধিত হইলে আত্মপ্রসাদ লাভের অবকাশ থাকে না। মিষ্টান্ন আহার করিতেছি জানিয়া খাইলে যত সুখ, অজ্ঞতায় খাইলে তত সুখ নাই।

ভাই কৃষক ও শিল্পকারগণ। তোমাদের দায়িত্ব কি, তোমরা জান বা না-জান, ধারণা করিয়া লিখিতে পার বা না-পার, তাহাতে ক্ষতি নাই। প্রাণে উপলব্ধি করা সর্বাগ্রে কর্তব্য। বানী ও বক্তৃতায় কিছু হয় না। আমাদের দায়িত্ব সকলেরই সমান। আপন শরীর সম্পত্তি ও আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা সকলেই সমান দায়িত্ব লইয়া সংসারে আসিয়াছি। কিন্তু অন্যের সাহায্য ব্যতীত ব্যষ্টিভাবে একের জীবনে এই দায়িত্ব পালন সম্ভব হইতে পারে না। জগতে সমষ্টিভাবে তাহা সম্পাদিত হইতেছে। এইজন্যই শ্রমবিভাগ ও দায়িত্ববিভাগ নিতান্ত আবশ্যক এবং তদনুসারেই কার্য হইতেছে।

আমার শরীর রক্ষা ও সুবিধার্থে আমাকে কৃষিকার্য, বানিজ্য, শিল্পকার্য লেখাপড়া, কারুকার্য ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত ধর্মকার্য প্রভৃতি করিতে হয়।

আমরা সাধারণতঃ তাহা করিতেছি, তথাপি কার্যবিভাগের প্রণালী বর্তমানে বদলাইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য আমার পেটের ভাত, আমার পরণের কাপড়, আমার ঘর দরজার জিনিসপত্র, সেবা-শুশ্রূষার জন্য সহস্র সহস্র ব্যক্তি খাটিতেছে। আমিও একা সহস্র হইয়া সহস্র প্রকারে জগতের লোকের জন্য খাটিতেছি। সকলেই সকলের দাস, সকলেই সকলের মনিব। সকলের হাতেই সকলের প্রাণ ও সকলের সুবিধা। কি সুন্দর সম্বন্ধ!

ভাই কৃষক, দুঃখিত হইও না। মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতির দায়িত্ব ও তোমার দায়িত্ব ঈশ্বরের চক্ষে সমান, বিন্দুমাত্র ইতর বিশেষ নাই। তুমি তোমার ও আমাদের পেটের জোগাড় করিতেছ, আমরাও তোমার সাংসারিক অন্যান্য সমস্ত কার্যে সহায়তা করিতেছি। তোমাকে যদি ক্ষৌর-কর্ম, বস্ত্রবয়ন, লেখাপড়া সমস্ত কার্য করিতে হইত, তবে কি তুমি কৃষিকার্য করিবার সময় পাইতে? দেখ দেখি, তুমি কৃষিকার্য করিতেছ, সেইজন্যই তোমার এই কার্যের বিনিময়ে জগতের শত সহস্র প্রাণী তোমার জন্য খাটিতেছে কিনা?

ভাই শিল্পকার, তোমার সম্বন্ধেও এই একই কথা। তুমিও জগতের জন্য খাটিতেছ, তোমার জন্যও সকলে খাটিতেছে। এখন ভাব দেখি, এই কার্য-বিভাগের দায়িত্ব অনুসারে কার্য করা আমাদের কর্তব্য কিনা? সংসার একটি মধুচক্র। মধুকরদিগের মধ্যে যেরূপ কেহ পুষ্প-মধু চয়নে, কেহ চক্র গঠনে, আবার কেহ চক্র রক্ষায় নিযুক্ত থাকে, আমরাও সংসারে নানাকার্যে সেইরূপ নিযুক্ত থাকিয়া সংসারকার্য নির্বাহ করিতেছি।

কিন্তু ভাই, ভাবিয়া দেখ দেখি, মধুকরদিগের মধ্যে কেহ যদি নিশ্চেষ্ট হইয়া নিজ দায়িত্বরূপ কার্য না করে, তবে ঐ মধুকরদের পরিশ্রম বৃথা হয় কিনা? বাহির হইতে মধু আনিবার ভার মক্ষিকা বহন করিলে মধুচক্র নির্মাণের কার্য বন্ধ হয় না। সেইরূপ আমাদের যদি একটি প্রাণীও দায়িত্ব অনুসারে কার্য না করে তবে এতবড় মানব-সংসারে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ঘড়ির একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র অকর্মণ্য হইলে, ঘড়ির কাঁটা চলিতে পারে না, ঠিকমত সময় দিতে পারে না। হে কৃষক, তুমি আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিবে কেন? তোমার যত্নের ত্রুটী হইলে, বিস্তীর্ণ জগৎ চলিবে না। হে শিল্পকার, তোমার দায়িত্বও তদনুরূপ।

অনেকে মনে করিতে পারে, বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে একজন অলস বা উদাসীন বা নিশ্চেষ্ট হইলে ক্ষতি কি? সে-টি ভ্রম। বড় জগতের সহিত বিজ্ঞশ্রেণীর যে সম্বন্ধ, শ্রেণীর সহিত আর তাহার অন্তর্গত শ্রমশীলের সেই সম্বন্ধ। জগতে কাহাকেও নিশ্চেষ্ট থাকিবার যো নাই। মানব জগৎ সৌরজগতের ন্যায় চলিতেছে। সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে, তাহার বিরাম নাই। পৃথিবীতেও সেইরূপ মানবের চলনশীল প্রগতিশীল শরীর নিয়ত কার্যরত রহিয়া শ্রমবিভাগের সৃষ্টির মঙ্গল করিতেছে। বহুসংখ্যক শ্রমবিভাগ আবার জগৎ-সংসার-প্রবাহ রক্ষা করিতেছে।

দেখ দেখি ভাই কৃষক ও শিল্পকার! শুধু তোমাদের দায়িত্ব তোমার পুত্রকন্যা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিতে পরিসমাপ্ত নহে, ইহা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত। একদণ্ড নিশ্চেষ্ট হইলে মহাপাপ। বসিবার অবসর নাই। সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিয়া কার্য করিলে সংসার বেশ চলিবে, হৃদয়ে শান্তির অভাব হইবে না। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে দায়িত্ব পালন করে সেই সুখী, সেই প্রকৃত মনুষ্য। আত্মপ্রসাদ তাঁহারই ভাগ্যে রহিয়াছে। অন্যে সে আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে পারিবে না। আমরা চিরদিন আলস্যে দিন কাটাইয়া পরে কিছু করিতে চাহিলে আমাদিগের সর্বদায়িত্ব শেষ হয় না। আমরা ইহাতে প্রকৃত সুখ অনুভব করিতে পারি না। দায়িত্ব পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বড় ঋণ। ইহার কিস্তি প্রতিমুহূর্ত। এক মিনিটও খেলাপ করিলে সমস্ত কিস্তি খেলাপ হইয়া গুরুত্বের ঋণজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে হয়। ভাই সকল, আসুন আমরা দিনের কিস্তি, দিনের দায়িত্ব দিনে শেষ করিয়া সন্ধ্যাকালে আত্মপ্রসাদ ভোগ করিয়া সুতৃপ্তি লাভ করি।

ভাই কৃষক ও শিল্পজীবীগণ! তোমাদিগকে খাটিয়া ঋণশোধ দিতে বলিয়া বক্তৃতা দিয়া আমরা নিদ্রা গেলে আমাদের দায়িত্ব শেষ হইবে না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, সকল দায়িত্ব তোমাদের উপর, খাটিবার দায়িত্বও তোমাদের উপর, আর বক্তৃতা করিবার ও সমালোচনা করিবার দায়িত্ব আমাদের উপর, ইহা মনে করিও না। দায়িত্ব সকলেরই সমান। তোমরা দায়িত্ব অনুযায়ী কার্য করিতেছ, তাই তোমরা দরিদ্র হইলেও সুখী। আমরা তোমাদিগকে সহায়তা করা দূরে থাকুক, তোমাদিগের খাটুনিতে প্রতিপালিত হইতেছি। অথচ তোমাদিগকেই ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি।

দায়িত্বের ঘোর অপব্যবহার করিতেছি, ইহার জন্য তোমাদিগের নিকট আমাদের শিক্ষা করিবার অনেক আছে।

ভাই-রে। এ জগতে বিশ্রাম নাই। চব্বিশ ঘণ্টা খাটিতে আসিয়াছি। যখন ঘুমাইয়া থাকি তখনও অন্যান্য মানসিক ইন্দ্রিয় কার্য করে, তখনও আমরা পৃথিবীর সহিত ঘুরিতে থাকি। না খাটিলে সুখ নাই। অলস ও উদাসীন ব্যক্তি চিরঅসুখী। দায়িত্ব স্মরণ করিয়া বীরের ন্যায় পবিত্র খাটুনি খাটিয়া যাইবে। পরমেশ্বর তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

কৃষি ও শিল্প ও কারুকার্য

মনুষ্যের কার্যকে সাধারণতঃ শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে আমরা অনেক শ্রেণীর কার্য দেখিতে পাই। লোকে কোন একটা-না-একটা ব্যবসায় লইয়া আছে। অভিলাষিত ধনলাভ ও উপজীবিকার জন্য যেসকল কার্য করা যায় তাহার নাম ব্যবসা। এই ব্যবসা প্রধানতঃ ১২ প্রকার—

১। বাণিজ্য—বস্তু পরিবর্তন দ্বারা লাভকরণের নাম বাণিজ্য।

২। কৃষিকার্য—ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজ বপন, শস্যোৎপাদন, কৃষিকার্য।

৩। নৈসর্গিক পদার্থকে বুদ্ধি-কৌশলে মানবের ব্যবহার উপযোগী-করণের নিমিত্ত রূপান্তর সম্পাদনের নাম—শিল্পকার্য। কারুকার্য—মনুষ্যের নিত্য আবশ্যকীয় শিল্পকার্যই—কারুকার্য।

৪। পশুপালন—পালিত পশুর দ্বারা জীবিকা-নির্বাহের নাম পশু-পালন।

৫। চিকিৎসা—ঔষধাদি দ্বারা রোগনাশের নাম চিকিৎসা।

৬। ভূম্যাধিকার ব্যবসা—ভূমির উপস্বত্ব লাভ দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করা।

৭। বিচারকের নিকট তর্ক ও বাদানুবাদ এবং যুক্তি-প্রদর্শনপূর্বক অর্থী বা প্রত্যর্থীর পক্ষ সমর্থন করাকে ব্যবহারজীব ব্যবসা কহে।

৮। ধর্ম-ব্যবসা — কোন ব্যক্তির পারমার্থিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠানপূর্বক ধন গ্রহণের নাম ধর্ম-ব্যবসা।

৯। বেতন লইয়া অন্যের কর্মসাধনের নাম ভৃতিগ্রহণ ব্যবসা।

১০। প্রাণী বধ করিয়া জীবিকানির্বাহ করাকে হিংসা-ব্যবসা বলা যায়।

১১। ছলে, বলে বা কৌশলে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়পূর্বক গ্রহণের নাম অপহরণ ব্যবসা।

১২। অন্যের গলগ্রহ হইয়া দানস্বরূপ গ্রহণের নাম ভিক্ষা ব্যবসা।

উল্লিখিত ব্যবসায়ের মধ্যে কৃষি, শিল্প, কারুকার্য ও বাণিজ্য ব্যবসা-ই প্রধান ও আমাদের লক্ষ্য।

পৃথিবীতে কিছুরই অভাব নাই। বুদ্ধি কৌশলে উন্নতির প্রদর্শনের নিমিত্ত পৃথিবী যাবতীয় উপকরণ লইয়া সর্বদাই আমাদের নিকট প্রস্তুত রহিয়াছে। পূর্বে যখন আমাদিগের আদিম অবস্থার লোকেরা কৃষিকার্য কাহাকে বলে জানিত না, বন্য ফলমূল ও মাংস খাইয়া জীবনধারণ করিত, তখনও পৃথিবীর উদারতা ও কৃষি উৎপাদনের শক্তির অভাব ছিল না। মানুষ উন্নতি সহকারে বুদ্ধির কৌশলে ভূমি কর্ষণ করিয়া প্রাকৃতিক পদার্থ সকল বহু পরিমাণে উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করিল। ইহাতে প্রাকৃতিক পদার্থ সকলের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটিল না। অর্থাৎ কৃষক একটি ধানকে শত সহস্র করিল, একটি ফলকে বহুসংখ্যক করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

তাহার পরবর্তী ব্যক্তি বুদ্ধি মার্জনায় উক্ত কৃষিজাত পদার্থের ও অন্যান্য নৈসর্গিক পদার্থকে পরিবর্তন করিয়া আমাদের ভোগবিলাসের ও ব্যবহারের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পরিণত করিল। ইহারই নাম শিল্প বা কারুকার্য।

তৎপরবর্তী ব্যক্তি কৃষি ও শিল্পদ্রব্য বিনিময় করিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। এখন দেখুন দেখি, এক কৃষিই আমাদের যাবতীয় উন্নতির মূল কিনা? কৃষক ধান ও কোষ্টা (পাট), গুড় প্রস্তুত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেই শিল্পকার ধান্যের চাউল, কোষ্টার কাপড় ও গুড়ের চিনি প্রস্তুত করিলেন। বণিক অমনি ভিন্নভিন্ন স্থানে তাহার বিনিময়ে তৎতৎ স্থানীয় ভিন্নভিন্ন পদার্থ আনয়ন করিয়া আমাদের সমস্ত অভাব দূর করিয়া দিলেন। আমরা যাহাতে হাত দেই, তাহাতেই কৃষক, শিল্পকার ও বণিকের বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় দেখিতে পাই। এই কাগজখানিই তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। শিল্পকর্ম প্রসারিত না হইলে আমরা এমন সুন্দর কাগজে ও কালি কলমে লিখিতে পারিতাম কি?

আমাদের সুখ সুবিধার অন্তরালে কৃষক, শিল্পকার ও বণিকের যে মহৎ গুণ রহিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে, কৃতজ্ঞতায় হৃদয় বিনীত হয়। পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে একাল পর্যন্ত মহা-পরিবর্তনের পর, এখন যেসকল পদার্থ সম্ভোগ করিয়া সভ্য-সমাজের পরিচয় প্রদান করিতেছি, তাহা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসাদে। যাহাতে হাত দেই, যাহা দেখি, যাহা খাই, যাহা পরি, যাহা লইয়া ঘর-করণা, যাহা না হইলে চলে না, যাহা আমাদের জীবন-সর্বস্ব, যাহা

লইয়া আমরা মনুষ্যত্বের গৌরব করিতেছি, তৎসমুদয়ই কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য প্রসূত। এখন বলুন দেখি, মানবের উক্ত ত্রিবিধ কার্য সভ্য সমাজের কত উপকারী, কত আবশ্যকীয়। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, যাহা এত আবশ্যকীয়, যাহা এত প্রয়োজনীয়, আমরা তাহাকেই ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করিতে শিখিয়াছি। আমাদের ন্যায় হতভাগ্য, আমাদের ন্যায় নির্বোধ ও ভ্রমসঙ্কুল জীব পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই।

আমরা কৃষককে মানুষ বলিয়া গণ্য করি না। তাহাদিগের ছায়া স্পর্শ করিলেও পাপ মনে করি। তাহাদিগকে চাষা বলিয়া ঘৃণা করি। যে চাষ না হইলে আমাদের জীবনধারণ অসম্ভব, সেই চাষ-ব্যবসায়ী চাষী-দিগের প্রতি আমরা পশুবৎ আচরণ করি। আমরা লোককে গালাগালি দিতে হইলে 'চাষা' বলিয়া থাকি। চাষা কথাটি আমাদের নিকট এমনই ঘৃণার্হ হইয়াছে যে কেহই এই শব্দ চিহ্নিত হইতে ইচ্ছুক হয় না।

ভাই কৃষকগণ। তোমরা পশুবৎ ব্যবহারে মনে কষ্ট করিও না। মা কালে কিনা করে পাগলে কিনা বলে। আমরা নিশ্চয়ই প্রমত্ত হইয়াছি নতুবা তোমাদিগকে ঘৃণা করিব কেন? তোমরা পিতার ন্যায় প্রেমভরে আমাদের জন্য ঘর্মাক্ত কলেবরে রৌদ্রবৃষ্টি সহ্য করিয়া আমাদের মুখের ভাত, লজ্জা নিবারণের বস্ত্রের উপকরণ কোষ্টা প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া দিতেছ। আমরা তোমাদিগকে পিতার ন্যায় ভক্তি করা দূরে থাকুক, সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেছি। আমাদের এই অমানুষিক ব্যবহারে কুফল ফলিতে বিলম্ব নাই। মানব সমাজে দুর্দশা ক্রমেই বাড়িতেছে। যেখানে দরিদ্র কৃষকগণ পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিয়াও আমাদের একটুও সহানুভূতি পায়না, আমাদের পদদলিত হয়, আমরা তাহাদের উপকারের পরিশোধ স্বরূপ তাহাদিগের রক্ত শোষণ করিয়া থাকি, সেখানে মঙ্গল কখনই আশা করা যায় না।

ভাই কৃষকগণ। সকল কথা খুলিয়া বলিতে গিয়া হৃদয় ফাটিয়া যায়। তোমরা আর কতকাল এইরূপ অত্যাচারে শোষিত হইয়া কাল কাটাইবে? আর কতদিন ধর্ম ধরিয়া আমাদের মার্জনা করিয়া আমাদের প্রতিপালন করিবে? আমরা তোমাদের কৃপায় অন্নাদি পাইয়া তোমা-দিগকে কি নির্যাতন করিতে বাকি রাখি? তোমরা চাষা, আমাদের মত কথায় যুদ্ধ করিতে ও কাগজ চিত্র করিতে শেখ নাই। আমাদের ন্যায়

কপটতা ও শঠতা শিক্ষা কর নাই, এই অপরাধে রাজদ্বারে গিয়াও বিচার পাওনা হইলেও সেখানেও সমাদৃত হও না। হাকিমের তর্জন-গর্জন, উকিলের আরক্ত লোচন ও কুটিল জেরা তোমাদের ভাগ্যে ভোগ করিয়া থাক। দুষ্ট প্রকৃতির লোকের ত্রিসীমানায় ঐসব ঘটিতে পারে না।

মহাজনে তোমাদিগের নিকট সুদের সুদ লইতে মজবুত ও বাকি খাজনার জন্য পাদুকাঘাত তোমাদেরই ভাগ্যে হইয়া থাকে! কর্ববৃদ্ধি না দিতে চাহিলে জমিদার মহর্ষি হইলেও তোমাদিগের প্রতি সদয় হইতে পারেন না। তোমরা অপমানিত হইলে তাহার প্রতিকারের দাবি চলে না। তোমরা বিনা পয়সায় প্রাণপণে খাটিয়াও আমাদের মন যোগাইতে পার না। তোমাদের হাতের ধান মিঠে কিন্তু তোমাদিগের বহুকালীন দখলিসত্ব বিশিষ্ট জোত জমা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। আর কত কি আছে বলিতে চাই না। যেদিন আমরা তোমাদিগকে আদর করিতে শিখিব, যেদিন কৃষিকার্যকে জীবনের প্রধান ব্রত ও পবিত্র ব্রত মনে করিব ও বুঝিতে পারিব, যেদিন আমাদের এই পশুবৎ আচরণ ও ভ্রম দূর হইবে, সেইদিন আমাদের সুদিনের অভ্যুদয় হইবে। সেদিন কবে আসিবে ঈশ্বর জানেন।

শিল্পকার্য কি কম আদরের? শিল্পজাত মনোহর দ্রব্যগুলি কেমন সুন্দর। শুধু কৃষিজাত দ্রব্যে অভাব দূর হইত কি? শুধু প্রাকৃতিক দ্রব্যে সভ্য সমাজের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইত কি? ভূগর্ভে সোনা রূপা অলঙ্কার তৈয়ারী, লৌহের ছুরি কাঁচি, ক্ষেত্রের ইক্ষুকে মিষ্টান্ন প্রস্তুত, ক্ষেত্রের ধান্যে ভাত—এসকল কাহার প্রসাদাৎ ভাবিয়া দেখ কি? শিল্প জীবনোপায়। শিল্প ব্যতীত আমরা আর কিসের গৌরব করিয়া মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারি? কৃষক আমাদের পিতা, শিল্পকার ও বণিক আমাদের পিতৃব্য-স্থানীয়। ইহারা সকলেই আমাদের জন্য খাটিতেছেন। সকলেই স্বস্ব প্রধান ও সকলেই পরমেশ্বরের অধীন। কৃষক একা জগতের সমৃদ্ধি করিতে পারে না। শিল্পকারও নৈসর্গিক ও কৃষিজাত আহার্য না পাইলে কি করিতে পারে? বণিক কৃষকও শিল্পকারের মুখাপেক্ষা হইয়া থাকে। তিনই ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে জগতের মহোপকার সাধন করিতেছে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, আমরা শিল্পকার ও বনিককেও কৃষকের ন্যায় ঘৃণা করিয়া থাকি। এই তিন শ্রেণীর ব্যবসায়ীর স্বরূপ আমাদের অজানা থাকায় এই ঘৃণার কারণ।

শিল্পকর্ম সাধারণতঃ কুমার তাঁতী প্রভৃতি যেসকল লোকের হাতে হইয়া থাকে, আমাদের মতে তাহারা মানুষ নহে। বণিককেও আমরা কম ঘৃণা করি না। আমাদের যত কিছু ঘৃণা আমাদের এই পিতা ও পিতৃব্যের উপর।

ভাই মসীজীবি স্মৃতিকাজীবিগণ। বৃথা দাসত্বের গৌরব করিও না। তোমাদের পরম হিতৈষী কৃষক শিল্পকার ও বণিকগণকে ঘৃণা করিও না। লেখাপড়া শিখিয়া থাক ভালই, বিনীতভাবে কৃষক ও শিল্পজীবীদিগের প্রতি প্রত্যুপকার ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দাও। তাহাদের দুঃখে দুঃখী, তাহাদের সুখে সুখী হও। তাহাদের কার্যে ইষ্ট কামনা ও তাহাদের উন্নতির পথ অনুসন্ধান কর। তুমি চিকিৎসক হও, উকিল হও, হাকিম হও, যাহাই হও, ক্ষতি নাই। তোমাদের মুখ্য দৃষ্টি যেন ইহাদের উন্নতির দিকে অবিচলিত থাকে। নতুবা এই দেশের কল্যাণ নাই। বৃথা অভিমান পরিত্যাগ কর। অন্যের পদতলে থাকিয়া পিতা পিতৃব্যের প্রতি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়া আর লাভ কি?

কৃষি ও শিল্প-কার্যে বর্তমান বিঘ্ন ও দুরবস্থা

ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় বঙ্গদেশ কৃষি-প্রধান স্থান। শুধু ভারত কেন, পৃথিবীতে বঙ্গদেশেই কৃষির বিশেষ প্রচলন। পৃথিবীর অধিকাংশ শীতপ্রধান দেশে মাংস ভক্ষণে তত্রস্থ অধিবাসীগণ জীবনধারণ করে। কৃষিকার্য তুষারাবৃত স্থানে অসম্ভব। বঙ্গদেশের লোক কৃষিলব্ধ জিনিস খাইয়া জীবনধারণ করে।

আদিমকালে পশু শিকার করিয়া এই বঙ্গদেশেও লোকের জীবনধারণের ব্যবস্থা থাকা অসম্ভব নহে, কিন্তু সে আদিম অসভ্য অবস্থা আর নাই। বঙ্গদেশে কৃষিকার্য অনেককাল আরম্ভ হইয়াছে, অনেকদিন হইতে ইহার উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু পূর্বের তুলনায় কৃষিকার্যের অবস্থা এখন বড়ই খারাপ। এ দুরবস্থার প্রকৃত কারণ কি, তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বোঝা যাইতে পারে। কৃষিকার্যের আবশ্যকীয় বিষয় কি, ভাবিতে গেলে দেখিতে পাই—(১) ভূমি (২) কৃষিকার্যের যন্ত্রাদি (৩) হাল চালনের উপায় — গরু (৪) জলসেচন (৫) বৃষ্টি (৬) বীজ (৭) তগাবী (৮) সার (৯) কৃষি-শিক্ষা।

ভূমি ও কৃষক না হইলে কৃষিকার্য অসম্ভব। এই ভূমি পূর্বে বঙ্গদেশে অনাবাদী পড়িয়া থাকিত। তখন এদেশের লোকসংখ্যা কম ছিল। ভূমি স্বভাবতঃই উর্বরা ছিল। সুতরাং অতি অল্পায়াসেই প্রচুর শস্য জন্মিত। লোকের কষ্টের কোন কারণ ছিল না।

এতদ্ভিন্ন বহির্বাণিজ্যের পথও রুদ্ধ ছিল। দেশের শস্য দেশেই থাকিত। শিল্প পদার্থের জন্যও ভিন্নদেশে ইহার বিনিময় প্রথা ছিল না। কারণ বর্তমান সময়ের তুলনায় খারাপ হইলেও আমাদের আবশ্যকীয় শিল্পদ্রব্য আমরা এদেশ হইতেই পাইতাম। ভূমি কর্ষণ করিয়া যে শস্য জন্মিত, তাহার কতক কৃষকের ঘরে, কতক জমিদারের ঘরে এবং কতক দেশের শিল্পকারের ঘরে যাইত, বিদেশে প্রায়ই যাইত না। কৃষকের আবশ্যকীয় জিনিস— কাপড়, তৈল, লাঙ্গল, দধি-দুগ্ধ, ছুরি, কাঁচি, দাও, কুঠার, হাঁড়ি, তৈজসপত্র প্রভৃতি দ্রব্যগুলি এই দেশীয় জোলা, কলু, ছুতার, গোয়ালা,

মোদক, কুম্ভকার, কামার ও কারিগরদিগের নিকট হইতেই পাওয়া যাইত। কাপড় পরিষ্কার, ক্ষৌরকার্য, ঘরামির কার্য প্রভৃতি অনেক কার্য এদেশী লোকের হাতেই হইত। অধিকাংশ স্থানে শস্যের বিনিময়ে ঐ কার্যের ফলভোগ করিবার নিয়ম ছিল। এখন এই সকল শিল্পকার এবং কারুকার্যের অধিকাংশ স্থান বিদেশীয়গণ অধিকার করিয়া তাহাদের প্রাপ্যাংশ শস্য বিদেশে লইয়া যাইতেছে। দেশী শিল্পকারগণ ক্রমে নিঃস্ব হইয়া লোপপ্রাপ্ত হইতেছে। এদেশীয়দিগের দ্বারা আর তাহাদের স্থান পূরণ হইতেছে না। অর্ণবযান ও রেলওয়েতে মাল বিদেশে যাইতেছে। কাজেই বঙ্গদেশ হইতে রপ্তানির ভাগ যেরূপ দিনদিন বেশী হইতেছে, শস্যভাণ্ডারে তেমন আমদানী নাই। বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষ বাঙলাদেশকে গ্রাস করিবার ভয় প্রদর্শন করিতেছে। না জানি, আবার সেই মন্বন্তরের দুর্দিন ভারতে পুনরায় উপস্থিত হইবে।

এইরূপ বিদেশে রপ্তানিতে এদেশের শস্যের পরিমাণ কমিয়া গিয়া তাহা মহার্ঘ হইয়া উঠিতেছে সত্য। কিন্তু ঐ বিদেশে রপ্তানির উপর এ অভাবের সকল দোষ চাপাইলে চলিবে না। শস্যাভাবের আরও একটি কারণ, বর্তমান সময়ে শস্যের উৎপাদনের ন্যূনতা। ইহার কারণ কি? কৃষক-দিগের অমনোযোগীতা কি ইহার কারণ? না, আমরা যতদূর জানি তাহাতে প্রকৃতপক্ষে শস্য উৎপাদন বিষয়ে কৃষকদিগের সাধারণতঃ অমনোযোগীতা ও ত্রুটি থাকিলেও পূর্বের তুলনায় তাহাদের অমনো-যোগীতার দোষ সাব্যস্ত করিবার কোনই কারণ নাই। এ সম্বন্ধে, কারণ — ক্ষেত্রের অনুর্বরতা। বহুবর্ষণে বঙ্গদেশের ভূমি সকলের উর্বরতা নাকি ক্রমেই হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। পূর্বে ভূমির সংখ্যা বেশী ছিল, একই ভূমি বর্ষে বর্ষে কর্ষিত হইত না। ভূমি সকল স্বভাবতঃই উর্বর ছিল, তথাপি কৃষকগণ ভূমি কিছুদিন পতিত রাখিয়া অন্য ভূমি কর্ষণ করিত। ভূমিতে সার বেশী দিবার আবশ্যক হইত না।

এখন লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। গড়ে পাঁচকাঠা ভূমির উপর একজন লোকের জীবনধারণের উপযুক্ত খাদ্য উৎপাদন আবশ্যক। কাজেই জমি ফেলিয়া রাখিবার যো নাই। বৎসর বৎসর একই জমিতে চৈতালি ধান প্রভৃতি বিভিন্ন শস্যোৎপাদন করিতে হয়। প্রতি বৎসর এইরূপ কর্ষণে ভূমির উর্বরতা হ্রাস হইয়া যায়। সার দিবার ব্যয় সামান্য কৃষকের পক্ষে

সম্ভবপর নহে। কাজেই আশানুরূপ শস্য জন্মে না। ইহার উপর নৈসর্গিকি ব্যাপারে অনেক সময় শস্য নাশ হইয়া থাকে ও শস্য জন্মাইয়াও প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়। ইহার উপর অবশ্য মানুষের হাত নাই। ভূমি সুগভীর ভাবে কর্ষন করিবার যন্ত্র নাই, ভাল গরু নাই, কৃষকরা নিঃস্ব, সার দিতে পারে না এবং ভূমির অবস্থা উন্নতি করিতে পারে না।

ভূমির অবস্থা উন্নতি হইবার একটি বিশেষ বাধা আছে। তাহা এই—কৃষকদিগের সহিত অনেক স্থানে পাকা বন্দোবস্ত নাই। গরীব কৃষকরা প্রায়ই চাউল-ভাগে জমি চাষ করিয়া খায়। এ বন্দোবস্ত একবৎসর বা এক শস্যকাল স্থায়ী হয়। ইহাতে কৃষক কেন মনোযোগ দিবে? মনের মত খাটিয়া সার দিয়া জমি উর্বরা করিল, জোতদার পর বৎসরেই জমি ছাড়াইয়া লইলেন! সুতরাং কৃষকদিগের মনোযোগ ও যত্ন আশা করা যায় না। বর্তমান খাজনার আইনে গভর্ণমেণ্ট কৃষকদিগের জন্য দখলিস্বত্ব সম্বন্ধে ভাল বিধান দিয়াছেন। গ্রামের স্থিতিবান প্রজা (Settled Ryot) এক বৎসর খাজনার জমি চাষ আবাদ করিলে তাহারও দখলিস্বত্ব হয়। এইরূপ দখলিস্বত্বের বিধান থাকিলেও আইনে পর্যবসিত হইতে আমরা দেখি না! অলসস্বভাব জোতদার ও জমিদার প্রজার উৎপন্ন শস্য খাইয়া জীবনধারণ করিবেন, কিন্তু প্রজাকে জমি সমর্পণ করিতে চান না। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা নিজের উদর পুরণ করিতে চান। তাহারা জনসমাজের প্রবল শত্রু। এইরূপ জমিদার এই কুষ্টিয়া মহকুমায় নাই কি, যাহারা প্রজাকে ভালভাল জমি বহুদিন যাবৎ দখল করিতে দিতেছেন, কিন্তু মেয়াদি স্বত্বে? প্রজাগণ মিথ্যা কবুলিয়ত দিয়া নিজনিজ নামে আবদ্ধ রহিয়াছে। জমিদারের কথা না শুনিলে, করবৃদ্ধি না দিলে, নিঃশব্দে অত্যাচার সহ্য না করিলে, তাহাদিগের জমি ছাড়াইয়া লয়েন।

আমরা প্রস্তাবিত বিষয় ছাড়িয়া অনেকদূরে আসিয়াছি। জমিদার ও জমির মালিক মহাশয়েরা কিন্তু কৃষকদেরই হাতে। হে দরিদ্র কৃষকগণ, তোমরা যে কষ্ট; যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাক, তাহা তোমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। তোমাদের হৃদয় তাহার সুন্দর সাক্ষী; ঈশ্বর তোমাদের অবশ্যই মঙ্গল করিবেন। সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য অবলম্বন করিয়া তোমরা জমির উন্নতি সাধন কর! ভূমি তোমারই সম্পত্তি। মালেকগণ জ্ঞান বিস্তার প্রভাবে যখন বুঝিবেন তখন তোমার প্রতি অত্যাচারের অবসান হইবে। একদিন এমন দিন অবশ্যই আসিবে।

ভূমিকে তোমরা নিজের শরীর মনে করিয়া সর্বদা ইহার উন্নতি সাধনে যত্নবান হইবে। জমি সময়মত কর্ষন করিয়া বীজ বপন করিবে, ঈশ্বর তোমাদের আশা পূর্ণ করিবেন। যিনি আমাদের খাদ্যের জন্য ধান্যে শ্বেতসার, মেঘে জল, ভূমিতে ও বীজে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি কৃষি-কার্যে প্রধান সহায়, হতাশ হইও না।

দরিদ্র কৃষকগণ, তোমাদের আপীল জমির নিকট, তোমাদের আবদার জমির নিকট। জমিদারের উপর ট্যাক্স চাপিলে জমিদার তাহা তোমা-দিগের নিকট আদায় করেন। অনেক জমিদার খাজনা ওয়াশীল দিতে না পারিয়া সময়ের জন্য আপীল করেন। তোমাদের সকল আপীল জমির নিকট। জমি তোমাদের প্রচুর শস্য দিয়া সকলের হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। জমি তোমাদের সর্বস্ব, যাহাতে ইহার উন্নতি হয় তাহা সর্বাগ্রে যত্ন করিবে।

কৃষিকার্যের যন্ত্রাদির অভাব এদেশের আর একটি গুরুতর সমস্যা। আমাদের দেশে কৃষকের যে লাঙ্গল ভূমি কর্ষণ করে তাহা নিতান্ত অকর্মণ্য। তাহাতে আধ হাতের নীচের জমি চাষ হয় না। প্রতি বৎসর গভীর চাষ হইলে তন্নিম্নের জমির উর্বরতা কম হইয়া যাইবে কেন? যাহাতে গভীর চাষ হয় তাহা প্রয়োজনীয়। অতি উর্বর জমিতে বীজ ছড়াইয়া ফেলিলেও শস্য হয়। সেকালে তাহাই হইত। বহু অঞ্চলে এখনও তাহাই হয়। কিন্তু ঐরূপ শস্য হইলে ভূমির উর্বরতা নষ্ট হয় ও নিম্নে চাষের আবশ্যক হয়। তাহার পরে উর্বরতা নষ্ট হইলে সার দেওয়া ও গভীর চাষের আবশ্যকতা দেখা দেয়। গভীর চাষের জন্য জোরদার গরু ও মহিষের আবশ্যক। আমাদের দেশের এমন ভাগ্য কি হইবে যে পশুর কষ্ট না দিয়া মানুষ কলে লাঙ্গল চালাইবে?

ভাই কৃষকগণ। তোমার দোষ কি? তোমাদের নিকট কি আশা করিব? তোমাদের এবং আমাদের পেটের ভাতের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা খাটিতে খাটিতে আবিষ্কারের চিন্তার সময়, সুযোগ ও টাকা এসব কোথায়? আমাদের শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ার মহাশয়গণ বড় বড় উপাধি লইয়া কি করিতেছেন? শুধু মুখস্থ বিদ্যা ও চর্বিত-চর্বনে আমাদের আয়ু-কাল শেষ হইয়া যায়। আমাদের দ্বারা তোমাদিগের কোন সাহায্য হইবে না। আমরা পালঙ্কে শুইয়া তোমাদের ঘর্মাক্ত কলেবরে কৃষির উন্নতি বা কলা-

কৌশল দেখিবার আশা রাখি না। কারণ মুখস্থ বিদ্যায় কোন লাভ হয়না। ধিক আমাদের মুখস্থ-বিদ্যা—অভিমান। পরিবারের মধ্যে খোঁড়া অন্ন-পোষ্যগণ-বিশিষ্ট সংসারের খাইয়া গলগ্রহ হইয়া জীবনধারণ করে। আমরাও তোমাদের গলগ্রহ হইয়াছি। মুখস্থ বক্তৃতা দিতে শিখিয়াছি মাত্র।

হে কর্মী ভাইসকল, তোমরা বিশ্বকর্মা। তোমরা সকলই করিতে পার। আর নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় নাই। আর সেকালও নাই। সামান্য ধানে তোমাদের পরিবার প্রতিপালিত হইবে না। এখন তোমরা ইংরেজের সহিত প্রতিযোগীতা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছ। পরীক্ষায় সফল না হইলে সংসারে পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে না। যাহা পাইবে তাহাতে পরিবারের চলা দূরে থাকুক, তোমার নিজের গ্রাসাচ্ছাদন কঠিন হইবে। সেকালের লাঙ্গলে সেকালের যন্ত্রে এখন কুলাইবে না। বেশী যন্ত্রের আবশ্যক, ভাল যন্ত্রের আবশ্যক। দেখ দেখি, অসহায় কৃষকগণ ভাল যন্ত্রের জন্য তোমাদের মুখাপেক্ষা করিতেছে। তোমরা অকর্মণ্য হইলে চলিবে কেন? তোমাদিগকে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে কি?

অল্পদিনের মধ্যই তোমরা কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হও। নতুবা তোমাদের মুখের গ্রাস অন্যে লইবেই তো। তোমাদের অপেক্ষা ভাল ছুরি কাঁচি, ভাল জিনিসপত্র ইংরেজের হাতে হইতেছে।

ভাই সুত্রধর, তোমরা ভাল টেবিল চেয়ার ইত্যাদি কলকারখানায় প্রস্তুত করিতে পার না। দেখ, কত জিনিস ইংরেজের হাতে হইয়া তোমাদের আয় কমিয়াছে। ইংরেজের হাতে তৈয়ারী কৃষি-যন্ত্রপাতির জন্য অপেক্ষা করিতে হইতেছে, এ শুধু লজ্জার কথা নহে। তোমাদের দুর্দশা উপস্থিত। ইহার পর নিরন্ন থাকিতে হইবে। ঈশ্বরের রাজত্বে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। ঈশ্বর তোমাদিগকে মোটা লাঙ্গলের ফলা প্রস্তুত করিবার হাত দেন নাই, ভাল জিনিস করিবার বুদ্ধিও দিয়াছেন। তাহার সদ্ব্যবহার কর।

আমাদের মাননীয় সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয় আশা করিয়াছিলেন তোমরা শিল্প এবং কৃষিকার্যের জন্য প্রচলিত জিনিস প্রস্তুত করিয়া দেখাইবে। তাহা পারিয়াছ কি? যদি কেহ চেষ্টা করিয়া থাক ভাল। বঙ্গদেশে কৃষিক্ষেত্রে কৃষকগণ প্রতিমুহূর্তে ভাল যন্ত্রের অভাবে তেমন কিছু করিতে পারিতেছে না। ইহাতে কি লজ্জা ও কষ্ট হয় না? তোমরা

শিল্পজীবী, তোমরা কৃষকদিগে যন্ত্র দিবার ভার লইয়াছ, শ্রমবিভাগ করিয়া লইয়াছ। উহারা কৃষিকার্য করিতেছে, তোমরা তোমাদের কার্য সম্পাদন করিতে পারিতেছ কি? তোমাদের সমবেত পরিশ্রম ও যত্নের অভাবে কৃষিকার্য চলিবে না, সংসারের দুঃখ মোচন হইবে না। আর নিশ্চেষ্ট থাকিবার সময় নাই। তোমরা ভাল ভাল নূতন নূতন যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা কর।

গরু কৃষিকার্যের জীবন ও কৃষকের একমাত্র অবলম্বন। এই গোধনে যে কৃষক বঞ্চিত তাহার সংসারে কোনই উপায় নাই। গরু ব্যতীত এদেশে হাল চালনে আর কি অবলম্বন আছে? মহিষ দ্বারাও হাল চালন কার্য অনেক স্থানে হইয়া থাকে, কিন্তু মহিষের সংখ্যা অল্প। কৃষিকার্যের সম্বন্ধে মহিষ ও গরু উভয়েই সমান উপকারী। কলাকৌশল-বিহীন বাঙ্গালী কৃষকের গরু ও মহিষ উপযুক্ত সম্বল। অতি অল্প খরচে এই পশুপালন হইতে পারে ও অনায়াসেই ইহার দ্বারা হাল চালন করা যায়। বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর দুর্বলতা জানিয়াই পরমপিতা পরমেশ্বর বনের পশুদিগকে ইহাদের জীবনোপায়ের প্রধান সহায় করিয়া দিয়াছেন। বনের পশু মানুষের এত উপকারে আসিবে, তাহা কে জানিত? বঙ্গদেশের অবস্থা ধরিলে আমাদের সকলের প্রাণ এই পশুর উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করে, ইহার উপকারীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া কিছু বুঝাইবার আবশ্যক নাই। গ্রামে প্রায় ঘরে ঘরে গবালয় রহিয়াছে, ইহার উপকারীতা কাহারও অবিদিত নাই। প্রতি নিঃশ্বাসের সহিত, প্রতি অন্নগ্রাসের সহিত গরুর মহৎগুণের কথা স্মরণ হয়। এই গরু না থাকিলে মানুষকেই গরুর কার্য করিতে হইত। অনেক স্থলে মানুষের কার্য গরু মহিষে করিতেছে। মানুষ বহন, জিনিস বহন প্রভৃতি কার্যও গরুর দ্বারা হইতেছে। কারুকার্যে গরুর সাহায্য কত আবশ্যক তাহা তৈলকর ও গোপ জাতির ব্যবসা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। তৈল-নিষ্কাশন যন্ত্রও কলুর বলদের সাহায্যে চলিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আমরা তৈল হইতে বঞ্চিত হইতাম। ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর মাখন—গরু ও মহিষ হইতে পাইয়া থাকি। সুতরাং গরু শুধু কৃষিক্ষেত্রের সম্বল নহে। আমরা গরুর কৃপায় মুখের অন্ন, শরীররক্ষার উপকরণ, নিত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত এবং বাণিজ্যের ও সমাজের অধিকাংশ কার্য নির্বাহ হইতেছে। জনসমাজ হইতে গরু মহিষ বাদ দিলে মানুষ একদণ্ডও

জীবনধারণ করিতে পারে না।

এই পশুকে পিতা, মাতা, বন্ধু যাহা বল, তাহাতেও ইহার নানা গুণের উপযুক্ত নাম দেওয়া হয় না। শরীরের রক্তধমনী এই গরুর গুণেই চলিতেছে। গব্যরস ব্যতীত শরীর রক্ষা হয় না. ইহা স্বতঃসিদ্ধ। একদিকে গরু মানুষের পরিশ্রমে সহায়তা করিয়া জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে, অন্যদিকে বিশাল পৃথিবীর ন্যায় জীবন ধারণের উপকরণ প্রদান করিতেছে। সুতরাং গরু এবং মহিষ একাধারে বহু রকম কার্য সম্পাদন করিতেছে। বিশাল পৃথিবীর উৎপন্ন শস্যে যেমন জীবন রক্ষা হয় সেইরূপ গব্যরসের উপর নির্ভর করিয়া মানুষের জীবন রক্ষা হইতেছে।

গব্যরস ব্যতীত যেমন শুধু শস্যে শরীরের সম্পূর্ণ পোষণ হয় না, শস্যও ব্যতীত শুধু গব্যরসে সেইরূপ শরীরের সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে পোষণ অসম্ভব। উভয়টি সমবেত হইলে মানবের সকল অভাব দূর হইয়া যায়। এই মহোপকারী পশু পরমেশ্বরের প্রেমের জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষী। ইহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে এমন নরাধম কে আছে? এমন মহোপকারী পশুকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়।

মহিষ এবং গরু উভয়ে শুধু জীবিতকালেই নহে, মৃত হইলেও ইহারা আমাদের বিশেষ উপকারে আইসে। ইহার গোময় দুর্গন্ধনাশক এবং ইহাতে জ্বালানীর কার্য হইয়া থাকে। এই পশুর মৃতদেহের চর্মদ্বারা পাদুকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত হয়। ইহাদের হাড় দ্বারা লবণাদি পরিষ্কার হয়। হাড ভূমির উর্বরতার জন্য প্রয়োজনীয় সার রূপে পরিগণিত।

গরু অপেক্ষা মহিষ বলবান। বহু জায়গায় মহিষ দ্বারা কৃষিকার্য করা হয়। গরু মহিষের ন্যায় ঘোড়ার দ্বারাও এদেশে হালচালন না হইতে পারে এমন বোধ হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহা কেহই পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত নহেন। বাঙ্গালী নূতন পাইতে নারাজ, পুরাতনে সন্তুষ্ট। বঙ্গদেশে গো-কুল ধ্বংস হইতে চলিল। মহা ভাবনার কথা। বর্তমান সময়ে কৃষিকার্যের দুরবস্থার একটি কারণ গরুর অবনতি। পূর্বকালে গাভীতে পাঁচ-ছয় সের দুগ্ধ দিত, দুই-তিন বিঘা জমি চাষ করিতে পারিত, কিন্তু এখন তাহা পারে না। কাজেই শস্যোৎপাদন এবং খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু হইবার মহাঅন্তরায় উপস্থিত।

এখন গরু এত দুর্বল কেন? আমাদের গো-পালনে ত্রুটিই তাহার একমাত্র কারণ। আমরা এখন গরুকে ভালরূপ খাইতে দেই কি? স্বার্থে আমরা অন্ধ হইয়া গিয়াছি। কিন্তু স্বার্থের খাতিরেও স্বার্থের ভিত্তির দিকে ফিরিয়া চাহি না। গরুকে ভালরূপ না খাওয়াইলে স্বার্থরক্ষা হইবে কেন? মনুষ্যত্বের খাতিরে, দয়ামায়ার খাতিরে, কৃতজ্ঞতার খাতিরে, হে কৃষকগণ— তোমাদিগের গো-পালনে মনোযোগী হওয়া উচিত নহে কি? একথা ছাড়িয়া দিলেও সাংসারিক হিসাবেও গো-পালন নিতান্ত কর্তব্য। গরু না বাঁচিলে আমরাও বাঁচিতে পারি না। বনের পশু আমাদিগের নিকট আসিতে চায় না। আমরা বন হইতে তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া খাটাইব অথচ খাইতে দিব না, এ কি হয়? বন জঙ্গল ও ঘাস প্রচুর থাকিলেও আমাদের জন্য খাটিতেছে। নতুবা আমাদের বিনা সাহায্যেই আহার খুঁজিয়া লইতে পারে কিন্তু আমরা এমনই স্বার্থপর, স্বার্থের খাতিরে সে পথও রুদ্ধ করিয়াছি। বন জঙ্গল আবাদ করিয়াছি। বাগান ঘেরিয়াছি। লোক সংখ্যার আধিক্যে ও আবশ্যকতায় একতিল জমিও পড়িয়া নাই। গরুর মুখের খাবার অর্থাৎ ঘাসের জন্য সুচাগ্র জমিও রাখি নাই। শস্যক্ষেত্র ও ফল-বাগানে গরুর প্রবেশাধিকার নাই। যাহার অর্জিত ধন তাহাতে তাহার অধিকার নাই। অধিকার আমার। আমি না খাটিয়া ভোগ করিব, অধিকারী গরু খাটিয়া একটু খাইতেও পারিবে না। ক্ষেত্রে গরু গেলে, গালাগালি এবং প্রহার। ইহা হৃদয়-বিদারক। মানুষের এরূপ ব্যবহার দেখিয়া মানুষকে আর মানুষ বলিতে ইচ্ছা হয় না। মাঠে ঘাস নাই, বাড়ীতে খাদ্য নাই, গরু খাইবে কি? গরু কি লোহার শরীর লইয়া খাটিবে? তোমরা মানুষ, পরমেশ্বর তোমাদিগকে দুইটি হাত দিয়াছেন, তোমরাও ক্ষেত্রে গিয়া খাট যেমন, গরুও খাটে। গরু শস্যে মুখ দিলেই গরুকে খুন করিবে কেন? গরুকে অনেকে আবার গুরুতর প্রহার করিয়া থাকে। ইহা মহাপাপ, আর করিও না। অনেকে নিজের গরু কম মারে, পরের গরু পাইলে বেশী মারে, এ আরও নীচতা। গরু তোমাদের হইয়া খাটিয়া দিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ক্রীতদাসের ন্যায় দেখিওনা, বন্ধুর ন্যায় ইহার সৎ ব্যবস্থা করা কর্তব্য। তৃষ্ণার সময় জল, ক্ষুধার সময় আহার না দিলে গরু কোথায় পাইবে? আর পাইবার যো রাখিয়াছ কি? মাঠে ঘাস নাই, বাগানে ও শস্যক্ষেত্রে বেড়া, কাহার সাধ্য তাহা ভেদ করে। শুধু তাহাই নয়, ইহার উপর গলায় ও

পায়ে দড়ি। এই রকম করিলে তাহার খাবার বন্দোবস্তটা তোমাকেই করিতে হয়।

হয়তো বলিবে, কোথায় পাইব? যে শস্য জন্মে, তাহা আমি খাইব না গরুকে খাওয়াইব? কাঁচা ঘাস কিছুতেই দিতে পারি না। কাঁচা ঘাস দিলে, জমি পতিত রাখিতে হয়। বেশী জমি নাই, পতিত রাখিব কি? তবে খড়, ভুষি ইত্যাদি তো খাইতে দেই।

ভাই সকল, ইহাতে গরুর শরীর রক্ষা হইবে কেন? জলে তৃষ্ণা কি গুড়ে নিবারণ হয়? কাঁচা ঘাস না খাইলে গরুর স্বাস্থ্য ভাল হইবে কেন? তোমাদের এই অত্যাচারেই গরু সকল মারা যাইতেছে। সেই গোয়াল-খড়ও কি তোমরা ঠিকমত দিতে পার? তাহাও বিক্রয় করিয়া পেটে দিয়া থাক। গরুকে তোমরা শুকাইয়া 'গৌসী' কর। এই পাপের ভোগে বঙ্গদেশ হইতে গো-কুল নিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। যদি তোমাদের পেটের ভাত জোটে, তোমাদের থাকিবার ঘর হয় তবে গরুর হইবে না কেন? গরুর জন্যে ভাল গোয়াল ঘরের ব্যবস্থা কর না। আসলে তোমাদের অসার আপত্তির মূল্য নাই।

হয়তো বলিবে, শস্য জন্মিল, তাহাতে গোয়ালঘর কোথায় পাইব? গোয়ালঘরে চালের জন্য বাড়তি খড় থাকে না। উত্তরে বলি, যদি কোন পরিবারের কর্তা সমস্ত দুগ্ধ পান করিয়া বলে শিশুর জন্য কি দিব কিছুই নাই, তাহার প্রতি যেমন ঘৃণা ও রাগের উদ্রেক হয়, তোমাদের প্রতিও তেমনি হওয়া স্বাভাবিক। যাহাকে খাটাইয়া শস্য পাইলে তাহাকে শস্যের অংশ দিতে নারাজ। কি নিষ্ঠুরতা!

তোমাদিগের গোপালন সম্বন্ধে যে ত্রুটি রহিয়াছে, অস্থিচর্মসার গরু সকল তাহারই দৃষ্টান্ত। এই কৃষি-প্রদর্শনীতে তোমরা ভাল সবল কৃষি-কার্যে উপযুক্ত গরু কয়টি আনিয়াছ? যাহা হইবার হইয়াছে, এখনও সময় থাকিতে আর উদাসীন হইও না। একটি কার্য কর। শুষ্ক খড় খাইলে গরু সবল হইবে না, কাঁচা ঘাস দিতে হইবে। যাহার যে কয় বিঘা জমি আছে তাহার মধ্যে কিয়দংশ গরুর আহারের জন্য আলাদা রাখিও তাহাতে ঘাস জন্মাইবার ব্যবস্থা কর। তাহাতেই গরুর প্রতিপালন হইবে। ইহা শুধু দয়ার কথা হইল না, ইহাতে তোমাদের লাভেরও আশা আছে। গরু তাহাতে সবল হইয়া চতুর্গুণ লাভ করিয়াই

দিবে। জমিটুকুর জন্য ভাবিতে হইবে না। গরুর ঘাসের জন্য জমি রাখা ও ঘাস আবাদ করা কুষ্টিয়াবাসীদিগের নিকট নূতন ফসল বলিয়া বোধ হইবে। বিজ্ঞ কৃষকভায়া, আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে না।

ভাই কৃষক সকল! আমি ইংলণ্ডবাসী সাহেব নহি। গোপালন নিজে করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমাকে অর্বাচীন মনে করিও না। একবার আমার কথাটি কার্যে পরিণত করিয়া দেখ।

মনে কর, তোমার দশ বিঘা জমি আছে। এক বিঘাতে ঘাস আবাদ কর। এই ঘাস ও শস্যের খড় গরুকে খাইতে দাও। সবল গরুর দুগ্ধে ও বলদের কার্যে এক বিঘায় চল্লিশ বিঘার আয় হইবে।

আর একটি কথা, হে বিজ্ঞ কৃষক, তুমি মনে কর তোমার দুইটি পুত্র ও তুমি তিনজনে তিনখানি লাঙ্গল বও। তোমার বিশ বিঘা জমি আছে এবং ছয়টি গরু। তোমার দুইটি পুত্র যেকাজ করিতে পারে ও করে, একটি গরুতে তাহার চতুর্গুণ করিতেছে, ইহা তুমি অবশ্য স্বীকার করিবে। মাঠেতে গরু ব্যতীত তোমার পুত্র চাষ করিতে পারিবে না। লাঙ্গল টানিতে গাড়ী বহিতে তোমার ঐ গরু পুত্র অপেক্ষা কত কার্য করে মনে কর দেখি। সুতরাং গরুর কার্যকারিতা ধরিলে তোমার দুইটি পুত্রও একটি গরুর সমান নহে। অথচ তোমার পুত্রের জন্য কত কি করিতে হয়। ঐ ফসলে পুত্রের কাপড় পুত্রের স্ত্রীর শাড়ী পোষাক ইত্যাদি সকল হইল, উহার কিয়দংশ মজুতও হইবে অথচ গরুর জন্য কিছু থাকিবে না কেন? অদ্য হইতে প্রতিকার কর।

তোমাদিগকে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। তোমরা দুর্বল ও বুড়া গরুকে কষ্ট দাও। অশক্ত গরুকে অন্যায় প্রহার করিও না। ইহাতে মহাপাপ। গো চিকিৎসার জন্য একখানি করিয়া গো-চিকিৎসার বই কিনিয়া রাখ। পীড়া হইলে নিজে চিকিৎসা করিতে পারিবে। দরকার হইলে বইখানি পড়াইয়া লইবে। গরু অকর্মণ্য হইলে পালে রাখিয়া প্রতিপালন করিও, না হয় বনে ছাড়িয়া দাও।

মুসলমান ভ্রাতাদিগকে আর একটি বিষয়ে অনুনয় করিয়া বলিতেছি, তাঁহারা যেন ইহাদের জীবনকে মানুষের জীবনের ন্যায় মূল্যবান মনে করেন। আমি কোন শাস্ত্র বা ধর্মের কথা বলিতেছি না। নিজনিজ প্রাণে হাত দিয়া কার্য করিও। দেখিবে, গরুকে কষ্ট দিতে ঈশ্বর

তোমাদিগকে কোন প্রবৃত্তি দেন নাই। আমাদের দেশের মুচিরা অনেক সময় বিষ খাওয়াইয়া গো-হত্যা করে। অনেক স্থলে তাঁহারা শাস্তি পাইয়া থাকে। মুচিরা জানে নাকি, ইহাতে কি পাপ? এক পয়সা লাভের জন্য একটি গরু মারা ও একটি মানুষ মারা উভয়ই তুল্য অপরাধ। গরু কি মানুষ অপেক্ষা কম উপকারী?

আমরা গো-পালনের সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিব না। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নিজের মুখের ভাত এবং তৃষ্ণার জল গরুকে দিয়া পরে খাইবে। গো-পালন ব্যতীত তোমার আমার জীবন রক্ষা এবং বঙ্গে কৃষিশিল্প ও সমাজের উন্নতি অসম্ভব।

তগাবি ও বঙ্গের কৃষকগণ

'তগাবি' কাহাকে বলে বোধহয় অনেকেই জানেন না। তগাবি পূর্বে খুবই প্রচলিত ছিল। তখন জমি পতিত পড়িয়া থাকিত। কৃষকগণকে অগ্রিম কিছু দিতে হইত, নতুবা তাহারা পতিত জমি (সাধারণতঃ ইহাকে 'ঘিল' বলে) সহজে বর্গাচাষ করিতে রাজি হইত না। বৎসরান্তে কৃষক-গণ ঐ তগাবির টাকা ফেরৎ দিত। ইহাতে তাহাদের সুদ দিতে হইত না। তাহাদেরও বিস্তর লাভ। দরিদ্র কৃষকের ঘরে একমুঠি চাউল নাই, গরু নাই, লাঙ্গল নাই, কি খাইয়া কি দিয়া চাষ করিবে? তগাবির টাকায় তাহার খাওয়ার সংস্থান ও লাঙ্গল গরু হইত। ইহা ক.. সাহায্য নহে।

এখন জমি লইয়া কাড়াকাড়ি। এখন তগাবি লাগে না। কেন? জমি বেশী উর্বরা হইয়াছে কি? না। তবে কেন? কৃষকের অবস্থা কি ফিরিয়াছে? তাহাও নহে। পূর্বের অপেক্ষা কৃষকগণ নিরন্ন, সংস্থানও কিছু নাই। এখন তগাবির পরিবর্তে মহাজন আসিয়াছে। সম্বৎসরের মালেকের খাজনা, নিজের খোরাকি, গরু লাঙ্গলের ব্যয় ইত্যাদি মহাজনের নিকট হইতে আসে, এবং পরে শস্যাদি, গুড়, কোষ্টা ইত্যাদির দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। ইহাও মন্দ নহে। কিন্তু অনেক স্থলে দেখিতে পাই ইহার অপব্যবহার হইতেছে। মহাজনদের ঐ ঋণ অন্যায় সুদ সমেত বাড়িতে থাকে এবং সেই ঋণ শোধ করিতে কৃষকের গরু, লাঙ্গল, ঘর, দরজা ভিটে-মাটিও বিক্রয় হইয়া যায়। অবশ্য সবক্ষেত্রে এরূপ নহে।

ভাই কৃষকসকল। বিশ্বাসঘাতকরা তোমাদের যাহাতে না ঠকাইতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। সেইজন্য শিক্ষিত ও সৎ লোকের সাহায্য ও পরামর্শ লইবে।

বঙ্গের ধনকুবেরগণ। আপনাদের বিপুল অর্থ ভূমিকাতলে বা সিন্দুকে রাখিলে কোন উপকার নাই। কৃষিকার্যের জন্য ন্যায্য কর্জ দিন, দান করিতে বলি না। ধনী দরিদ্র সকলের সাহায্য ব্যতীত কৃষিকার্যের উন্নতি অসম্ভব।

শ্রমবিভাগ

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এক সাধারণ মহান উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত পরম-পিতা পরমেশ্বর পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, পশুপক্ষী, তরুলতা ও জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের কার্য ও শ্রমবিভাগ করিয়া দিয়াছেন।

সৌরজগতে যেমন গ্রহাদি সকলেই আপনার কক্ষে পরিভ্রমণকালে তাহাদের ভ্রাম্য-পথের মধ্যস্থ কেন্দ্র সূর্যকে পরিভ্রমণ করিতেছে, সেইরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন জীবজন্তু ও পদার্থসকল পরস্পর ভিন্ন হইলেও সমষ্টিভাবে সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা করিতেছে। এই শ্রমবিভাগ ঈশ্বরের রাজত্বে যেমন বর্তমান, মানব সমাজেও তেমনি বর্তমান রহিয়াছে।

শ্রমবিভাগ প্রণালী প্রচলিত না থাকিলে সভ্যজগতে এত উন্নতি এত শ্রীবৃদ্ধি কখনই হইত না। মানবমণ্ডলীর নরনারী সকলেই শ্রমবিভাগ করিয়া সংসারে কার্য চালাইতেছে। এই শ্রমবিভাগ সামান্য পরিবারে আরম্ভ হইয়া, সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

একজন মানুষের যাহা দরকার, একটি সভ্য জনসমাজের তাহাই আবশ্যক। পৃথিবীর জন্যও তাহারই প্রয়োজন। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে ঐ সকল কার্য নিজে করিয়া লওয়া অসম্ভব। তাই শ্রমবিভাগ ও বিনিময় প্রক্রিয়া অবলম্বনে মানুষ ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

সভ্য সমাজেই মানুষের দরকার খাদ্য, কাপড়, ঘর, তৈল, তৈজসপত্র, মৃন্ময়পাত্র, বিদ্যা, বসিবার আসন, রন্ধন, ক্ষৌরকার্য, ধর্মকর্ম, বিচার, উকিল, শাসন, আত্মরক্ষা, মলমূত্রাদি পরিষ্কার, কাপড় পরিষ্কার, সঙ্গীত, ছুরি, কাঁচি, আলো প্রভৃতি। সংসারে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এই সকল কার্য বিভাগ করিয়া লইয়া সম্পাদন করিতেছে। কৃষক, কলু, তন্তুবায়, কাঁসারি, কুমার, পণ্ডিত, ঘরামি, ছুতার, পাচক, নাপিত, ধোপা, পুরোহিত, উকিল, আদালত, রাজ্যশাসন প্রভৃতি কার্য কেমন সুন্দর শ্রমবিভাগে সুসম্পন্ন হইতেছে।

ভাই কৃষক ও শিল্পকারগণ! তোমরা শ্রমবিভাগ মত কার্য করিতেছ সত্য, কিন্তু তোমাদিগকে অনেক কাজ দারিদ্র্যবশতঃ নিজেই করিয়া লইতেছ

দেখি। ইহাতে কোন কার্যই তোমাদের ভাল হয় না।

ভাই কৃষক, তুমি কৃষিকার্য যেমন সুন্দর ও সহজে করিতে পার, মৎস্য শিকার তেমন সহজে পারিবে কেন? আবার জাল-জীবীরাও তোমাদের ন্যায় কৃষিকার্য জানে না।

শ্রমবিভাগ কৃষক ও শিল্পকারদিগের মধ্যে আশানুরূপ প্রচলিত না থাকায় সমাজের বড়ই ক্ষতি হইতেছে। সংসারে একটিমাত্র কাজে মানুষ নিবদ্ধ থাকিতে পারে না ও তাহাতে শারীরিক ও মানসিক অবস্থাও ঠিক থাকে না। সত্যই, সকল কার্যই কিছুকিছু জানা ভাল, কিন্তু তাহা বলিয়া দশটি কাজ একটু করিয়া করা অপেক্ষা একটি কাজ ভাল করিয়া করা ভাল

আমরা দেখিতে পাই, কৃষক ও কৃষকপত্নী সপরিবারে সংসারের প্রায় সমস্ত কার্যের ভার মাথায় লয়। উদ্দেশ্য, দারিদ্র নিবারণ। কিন্তু তাহাতে দারিদ্র বাড়ে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কৃষক শুধু কৃষিকার্য করে না, মৎস্য শিকার, ঘর বাঁধা, ঘর ছাওয়া, মাটি-টানা, মুটের কার্য, মাদুর প্রস্তুত, নাপিত হইলে ক্ষৌরকার্য, গোপ হইলে দুগ্ধের কার্য প্রভৃতি অনেক কার্য করিয়া থাকে। গৃহিণী পাচিকার কার্য, ধোপার কার্য, মাটির কার্য ও পুরুষের অনেক কায নিজে করিয়া থাকে। ইহাতে কৃষিকর্মের ব্যাঘাত হয় সন্দেহ নাই। কৃষক মাঠে থাকিয়া গোচারণ করিবে, গৃহিণী রন্ধন ও বাড়ির ও সন্তানপালন ইত্যাদি কার্যে সম্ভবমত সাহায্য করিলেই যথেষ্ট হইল।

শিল্পকারদিগের মধ্যেও এইরূপ অন্যের কার্যে হাত দেওয়া হইয়া থাকে।

ভাই কৃষকগণ, ভাই শিল্পকারগণ, তোমরা কাজ ভাগ করিয়া লইয়াছ, নিজনিজ কার্যে উন্নতি করিয়া দেখাও, অনেক পুরস্কার পাইবে। খাইবার পরিবার ভাবনা থাকিবে না।

ভাই তন্তুবায়, তুমি ভাল কাপড় প্রস্তুত কর, দেখিবে কৃষকের ধান পাইবে, ধোবা নাপিতের নিকট হইতে কাম পাইবে।

হতাশা ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া স্বীয় কার্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কার্যে হঠাৎ যাইও না। অধ্যাবসায়ে কিনা হয়। মনোযোগ দিয়া কাজ করিতে থাক, অভীষ্ট অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। তুমি যদি তোমার বিভাগ ছাড়িয়া দাও, তবে সে বিভাগে কে আসিবে?

ভাই কৃষক, জমিতে ফসল জন্মিল না বলিয়া তুমি ভিক্ষুক হইলে চলিবে কেন? তোমার কাজ পরিত্যাগ করিবার যোগ্য নহে। উহা :একাধারে

জগতের জীবন ও তোমার জীবন। উহা করিতে হইবে। নিজ নিজ কার্যের দায়িত্ববোধ থাকা নিতান্ত আবশ্যক এবং কার্যগুলি শ্রমজীবীদিগের মনোমত ও সন্তোষকর হওয়া চাই। বিরক্তির সহিত কোন কার্য হয় না। যে কার্য যাহার সাজে না, তাহার অন্য কার্যে যাওয়া ভাল। এই শ্রমবিভাগ কৃষি ও শিল্পের বিশেষ উন্নতিকর, সন্দেহ নাই। শ্রমবিভাগে কার্য কেমন সুন্দর হয়, এই প্রদর্শনীই তাহার প্রমাণ; কৃষি ও শিল্পকার্যে উন্নতি নূতন উপায় উদ্ভাবনও নিতান্ত আবশ্যক।

অন্য কারণ থাকিলেও বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষের ভ্রুকুটিভাব ও শস্যের অভাব দেখিয়া আমরা কৃষি ও শিল্পকার্যের বর্তমান দুরবস্থা সম্বন্ধে নিঃসন্দীহান হইয়াছি। বঙ্গে কৃষিকার্য ভাল চলিতেছে নিশ্চয়ই। সেকালের উর্বরা ভূমি নাই, সেকালও নাই এখন বহির্বাণিজ্যে রপ্তানি আছে আমদানি নাই। খুব চিন্তার কথা।

কিন্তু ভাই কৃষকগণ, তোমরা কাপুরুষ নহ, ভাবনার কোন কারণ নাই। সোনার বঙ্গদেশে কৃষির অভাব কি? এদেশে যত্ন করিলে কিনা ফলে। এদেশে নাই, এমন কিছুই পৃথিবীতে নাই। ভাণ্ডারে সকলই আছে, পরিশ্রম করিয়া লইতে হইবে।

ভাই, তোমরা অলস হইলে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা—ভয়ের কারণ অবশ্য আছে। কিন্তু তোমরা পরিশ্রমী হইলে দুর্ভিক্ষ বঙ্গের ত্রিসীমানাতেও আসিবে না বঙ্গমাতা তোমাদিগকে প্রচুর খাদ্য যোগাইবেন।

ঈশ্বরের রাজত্বে প্রতিনিয়ত জীবনপ্রবাহ রক্ষার বিধান হইতেছে। তিনি মানবের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের উর্বরতা দিয়াছেন। যতদিন মানব-প্রবাহ থাকিবে ততদিন বঙ্গের উর্বরতা কণামাত্রও ধ্বংস হইবে না। যেদেশের লোকের একমুষ্ঠি চাউল ও দুটি গাছের পাতা হইলে জীবনধারণ হয়, সেখানে দুর্ভিক্ষ—এই কথাটি অসম্ভব। বাংলার অভিধানে 'দুর্ভিক্ষ' শব্দের স্থান হওয়া উচিত নহে। অলস রাজ্যে দুর্ভিক্ষের চিরবসতি, দুর্ভিক্ষ বঙ্গদেশের জন্য নহে।

ভাই কৃষকগণ, অলস হইও না। অলস হইলে ঘরে প্রচুর খাদ্য থাকিলেও কিছু হয় না। তোমরা গোঁফ-খেজুরের গল্প শুনিয়াছ কি? কতকগুলি অলস একটি খেজুর গাছতলায় শুইয়া অনশনে মরিতেছিল, ভিক্ষা করিতেও তাহাদের আলস্য হইয়াছে। তাহাদের গোঁফের নিকট একটা

খেজুর পড়িয়াছিল। একজন পথিকের সাড়া পাইয়া, এক অলস চক্ষু মুদিয়া বলিল, 'কেহ মাত্র একটা খেজুর দিলে চাখি'। পথিকটি বলিল, 'ঐ তো একটি খেজুর তোমার গোঁফের নিকট রহিয়াছে, খাও না।' অলস বলিল, 'আমার সাধ্য নাই, তুমি পা দিয়া মুখে ফেলিয়া দাও।' —ভাই কৃষকগণ, অলস ব্যক্তির রক্ষা নাই। অলস হইলে তোমাদের মরণ, ঐ সঙ্গে আমরাও মরিব। আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধিও ঐ সঙ্গে মরিবে

আমরা পূর্বে বলিয়াছি গরুকে প্রতিপালন কর। এবং বহুবিবাহ করিওনা। সন্তান ও নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হও। ক্ষেত্র বুঝিয়া নূতন নূতন ফসল বপন কর, অবশ্যই তাহাতে সুফল দর্শিবে। কিন্তু তোমাদের যত্ন নাই। নেহাত না হইলে নয় ভাবিয়া তোমরা মাত্র দুই-এক রকম ধান্য বুনিয়া, তাহা না হইলে পরমেশ্বর ও নিজের ভাগ্যের দোষ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাক। ইহা অলস ও কাপুরুষের কার্য। বেশীজনে কয়জনের ধান ও কয়জনে বেশীজনের ধান বুনিলে হইবে কেন? জমিতে সার দাও, জমি বুঝিয়া ভালভাবে চাষ করিয়া ধান বুনিলে, দেখ ধান ভাল হয় কি না?

ইক্ষু ও কোষ্টার আবাদ বেশী হইতেছে। তাহাতে বেশী পয়সা বলিয়া তোমরা তাহাতে মনোযোগী হইয়াছ। এটি ভ্রম। মানুষে পয়সা খায় না, ধান না হইলে কি খাইবে? শ্রমের তুলনায় এখন তোমাদের ঘরে বেশী কিছু হইয়াছে কিন্তু তথাপি চলে না কেন? ধান নাই বলিয়া। তোমরা কৃষক, ধান কিনিয়া খাইবে, এ লজ্জার কথা।

ধানের আবাদে সর্বাগ্রে মনোযোগী হইবে। ধানের মত আরও শস্য আছে যাহা খাইয়া জীবনধারণ করি, তাহাও বুনিবে। কোষ্টা, ইক্ষু, আদা, হলুদ, মটর, কলাই—ইহাও দরকার, কিন্তু ধান্যের মত নহে। ধান্যের আবাদে বিশেষ মনোযোগী হইয়া তোমরা ইক্ষু, কোষ্টা, হলুদ, আলু, পটল, সরিষা প্রভৃতির চাষে সমধিক মনোযোগী হইবে। তৈলের জন্য সরিষা, তিল গেন্ডী, কুসুম ফুল, রাই, মসিনা প্রভৃতির আবাদ হওয়াও আবশ্যক।

তোমরা উহা উৎপাদন করিয়া তৈলকারের হাতে দিলেই তৈলকার তৈল প্রস্তুত করিবে। তোমরা কোষ্টা ও তুলা প্রস্তুত করিয়া দিলেই তন্তুবায়গণ কাপড় প্রস্তুত করিবে।

কৃষক ও পল্লীবাসীর স্বাস্থ্য

কৃষকের স্বাস্থ্যের উপর কৃষিকার্যের উন্নতি, সুতরাং জগতের উন্নতি নির্ভর করে। এখানে কৃষক বলিয়া তাচ্ছিল্য করিলে চলিবে না। দরিদ্র কৃষককে অসুস্থ জীবন যাপন করিতে দিলে চলিবে না। উহাদের স্বাস্থের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উহাদের পীড়ার সময় চিকিৎসার সুব্যবস্থা এবং অন্যসময় যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, তাহার উপদেশ দিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির পথ প্রদর্শন করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় বঙ্গে বাঙ্গালী সাধারণের কথা দূরে থাক, শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরই স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি নাই। যাঁহারা নিজেদের শরীরের দিকেই চাহেন না, তাঁহারা যে অন্যের শরীরের দিকে চাহিবেন, ইহা কখনও আশা করা যায় না। স্বাস্থ্যরক্ষার পুস্তক তাঁহারা পড়িয়াছেন, লোকের মুখে তাহার নিয়মও শুনিয়াছেন, ও সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ভুগিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, তথাপি তাঁহারা স্বাস্থ্যের দিকে উদাসীন।

স্বাস্থ্যরক্ষা-শিক্ষাও অবস্থার উপর নির্ভর করে। অনেক স্থলে শিক্ষার অভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না, অনেক স্থলে দুরবস্থা নিবন্ধন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিরুপায় হইয়া পড়িতে হয়। সে যাহাহউক, ঈশ্বরের রাজত্বে সকলেই এক নিয়মের অধীন। সেখানে ধনী মানী দরিদ্র বলিয়া ইতর বিশেষ নাই। সকলকেই তাঁহার নিয়মানুসারে স্বাস্থ্যের নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। না করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ-জনিত শারীরিক ব্যাধি ভোগ করিতে হয়। এ বিষয়ে কৃষক ও আমরা সকলেই সমান। তবে একটু ইতর বিশেষ থাকিতে পারে। সে যাহাহউক, মোটামুটি আমাদের স্বাস্থ্য পানীয়জল, খাদ্য, বায়ু এবং বাসস্থান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। এঅঞ্চলে পানীয় জল সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বভাবপ্রদত্ত উপাদানের উপর নির্ভর করি, তাহার উপর নিজের বুদ্ধি-কৌশল সংযোগ করিতে চাই। নদীর জল হইলে ভালই হইল। নতুবা খাল বিল পুষ্করিণীর অপরিস্কার জল পান করিয়া থাকি। অনেক স্থলে তাহার অভাব হইলে, দুরবস্থায় পড়ি। সুতরাং পানীয় জলের দোষে আমাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়। প্রধান প্রধান ডাক্তারগণ বলিয়াছেন

এদেশে যত প্রকার কঠিন পীড়া হয়, তাহার অধিকাংশ পানীয় জলের দোষে হইয়া থাকে। এবিষয়ে বঙ্গবাসীগণ বড়ই উদাসীন। জল পাইলে আমরা তাহা বিনা দ্বিধায় পান করিয়া থাকি। রোগের প্রাদুর্ভাবের ইহাই প্রধান কারণ।

জল পরিষ্কার না করিয়াই পান করা হয়। দূষিত জল উদরস্থ হইলে কেন না পীড়া হইবে? সম্প্রতি কলিকাতার নিকটস্থ কোন একটি পল্লীর এক বাড়ীতে ওলাউঠা হয়। সেই রোগীর মলমূত্রাদিসংযুক্ত কাপড় যে পুষ্করিণীতে ধোয়া হইয়াছিল, এক গোয়ালা তাহার দুধে ঐ জল দেওয়ায় ঐ দুধ যাহারা খাইত তাহারাও রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে বেশী বলিবার আবশ্যক নাই। হতভাগ্য পল্লীবাসী ভাল জল খাইবে দূরে থাকুক, পুষ্করিণী শুকাইয়া গেলে, গৃহপালিত পশ্বাদিসহ অসহ্য জলকষ্টে পড়ে। অনেক স্থলে দূষিত জল পান করা শুধু মানুষের নহে, গবাদি পশুদেরও স্বাস্থ্য-ভঙ্গের কারণ হয়।

যাহাহউক, আমরা আশাকরি পল্লীবাসী কৃষকগণ পানীয় জলটুকু একটু পরিষ্কার করিয়া পান করিয়া যেন জীবনধারণ করে। হতভাগ্যদিগের জলকষ্ট নিবারণের জন্য আমরা কিছুই করিতে পারিতেছি না। দেশের বড়লোকের দানশীলতা ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বিদ্যাভিমান বর্তমান আছে, কিন্তু ইহাদের কষ্ট অপনয়ন করিবার কেহই নাই। আমরা আশাকরি, গভর্ণমেণ্ট এদিকে দৃষ্টি দিবেন। আমরা নিজ হইতে কিছুই করিতে চাহি না। আইন করিয়া ট্যাক্স ধার্য করিলে অনেকেই এ বিষয়ে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে বাধ্য হইবেন।

দ্বিতীয় কথা, খাদ্যাখাদ্যের উপর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। যাহা-তাহা খাইলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। সুখাদ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য দরিদ্রদিগের ভাগ্যে জুটে না সত্য, তবে যাহা খাদ্য আছে তাহাও বিক্রয় করিয়া খাইলে, আর কি হইতে পারে। মাদকদ্রব্য বন্ধ করিয়া শ্বেতসারযুক্ত খাদ্যভক্ষণে শরীর রক্ষা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য কৃষকদিগের সহজপ্রাপ্য। চাউল, ডাউল, গম, কচু, আলু — ইত্যাদিতে প্রচুর শ্বেতসার আছে। এ সমস্তই কৃষকের হাতের জিনিস। দুগ্ধ, ঘৃত এত দুষ্প্রাপ্য হইলেও তাহা কৃষকেরই সম্পত্তি। পরিশ্রমী হইলে ইহারও কিছু অংশ কৃষক ভোগ করিতে পারে। পরিশ্রম করিলেই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হইতে পারে না।

কৃষকদিগের মধ্যে একটি প্রধান দোষ, তাহারা গুরুতর ভোজন করিয়া থাকে। ইহা বড় দোষ। পেটে কিঞ্চিৎ ক্ষুধা রাখিয়া আহার করা এবং আহারের পর একটু বিশ্রাম করা ভাল। পুনঃ পুনঃ আহার করাও দোষ। ইহাদের মধ্যে তিনবার আহারের নিয়ম থাকা ভাল। কৃষকদের নিয়ম নাই। ইহাও একটি দোষ।

স্বাস্থ্যরক্ষার তৃতীয় বিষয় হইল, বায়ু সেবন। ধনীর বিলাসগৃহে যেমন মুক্তবায়ুর অভাব, কৃষকের ক্ষুদ্র কুটীরেও তেমনি বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। এ বিষয়ে পল্লীর কৃষকগণ বড়ই অমনোযোগী। বিশুদ্ধ বায়ুকেও আমরা অবিশুদ্ধ করিয়াছি। কৃষকদিগের বাড়ীর নিকট বড় বড় চৌবাচ্চা, আবর্জনা এবং মলমূত্রাদি পরিত্যাগের ব্যবস্থা দেখিতে পাই। ইহাতে বায়ু দূষিত হয়। কৃষক হাজার দরিদ্র হইলেও, ইহা পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা কৃষকেরই হাতে। ইহা বহু ব্যয়সাপেক্ষ নহে। নিজের বাড়ী-ঘর ও নিজের সীমানা পরিষ্কার করিয়া রাখা অভ্যাস করিলেই হয়।

কৃষকরা সাধারণতঃ ধূলি-মলিন বসনাদি পরিয়া থাকে। ইহা স্বাস্থ্য-হানিকর। যাহাই পরিধান করুক, তাহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। তাহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে সংসার স্বর্গতুল্য মনে হইবে। পরিচ্ছন্ন বাটিতে বাস করা ও পরিষ্কার বসন পরিধান করা কত সুখের, ইহাতে মনেও আনন্দ হয়, লোকে দেখিয়াও প্রশংসা করে। অথচ ইহাতে কোন খরচ নাই। তাই কৃষকগণ, এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে কোন পীড়া তোমাদের বাসস্থানের ত্রিসীমানাতেও আসিতে পারিবে না।

শীতের সময় গরম কাপড়, ভাল জলে স্নান, ভাল জায়গায় ঘর ইত্যাদি তোমাদের সাধ্যাধীন। আর একটি কথা—তোমরা অনেক সময় কুসংস্কারের দাসত্ব করিয়া বিপদে পড়িয়া থাক, এ শুধু তোমাদের দোষ নহে। ভারতে কুসংস্কারের রাজত্ব, সকলের উপর একচ্ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তোমাদের সূতিকা-ঘর বড়ই অস্বাস্থ্যকর। তাহাতে প্রসূতি ও শিশুকে শুইতে দাও। ইহা নির্দয় অজ্ঞতার পরিচয়। প্রসূতি ও শিশুকে ভালভাবে রাখা ও তাহাদের সেবা করা উচিত, তাহা তোমরা কর না।

অঙ্গ প্রক্ষালন না করা দোষ। তোমাদের কেন, সে দোষ আমাদের ন্যায় বাবুদেরও আছে। যদি কিছু বলিতে হয়, তাহা মাংসপিণ্ড অকর্মণ্য

ধাত্রীবাহিত জড়শিশুকে বলার সামিল। তাঁহাদের নাসিকা চক্ষু, কর্ণ, হস্ত-পদাদি কার্য করিতে চাহে না। আমাদের দ্বারা সে সকল কার্য নির্বাহ হয়। তোমরা অলস নহ, পরিশ্রম করিতে পার, কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম করাও দোষ। তোমরা পরিমিত পরিশ্রম করিয়া কার্য করিবে।

ভাই পল্লীবাসী কৃষকগণ, বিশেষ করিয়া মুসলমান কৃষকগণ, তোমাদের আর একটি প্রধান দোষ, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ। কৃষি-সহায় দেশে তোমাদের দুরবস্থার ইহা একটি প্রধান কারণ। তোমরা বহুসংখ্যক নিকা করিয়া সন্তান উৎপাদন কর, তাঁহাদের ভরণপোষণ করিতে পার না। আমরা দেখিয়াছি, অনেক কৃষক তিন-চারটি বিবাহ করিয়া ১৫-১৬টি অপগণ্ড রুগ্ন সন্তান রাখিয়া মারা গিয়াছে। বিধবা দরিদ্র স্ত্রীরা সন্তানদের পালন করিতে পারিবে কেন? কাজেই অন্নাভাবে তাঁহাদের মৃত্যু হয়।

ভাই কৃষকগণ, নিন্দার জন্য বলিতেছি না, বাল্যবিবাহে কৃষক যুবকের স্বাস্থ্যের হানি হয়। এ বিষয়ে চিন্তা করা দরকার। প্রতিপালনের সামর্থ্য না হইলে বিবাহ করিও না। অর্থাভাবে ঘরে অশান্তি, কৃষিকার্য ব্যর্থ হয়।

বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ শুধু তোমাদেরই নাই, এদেশে কুলীন মহাশয়গণও উহার বিধান দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এখন অন্নাভাবে আর বেলতলা দিয়া যান না। তোমরাও এ কুসংস্কার ত্যাগ কর। তাঁহারা ছাড়িয়াছেন, তোমরাও ছাড়। শিক্ষক ছাড়িলেন, ছাত্রদেরও ছাড়া কর্তব্য।

কুষ্টিয়ার কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী মেলা স্থায়ী করার উপায়

সভ্যজগতের সকল স্থানেই কৃষি ও শিল্পের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া ইহার উন্নতির জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। কেহবা দুর্ভেদ্য জাতিভেদ পাশ ছেদন করিয়া বিলাত গিয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। ভালই। ইঁহারা সকলেই প্রকৃত হিতৈষী। অনেকে বন্যাপীড়িত স্থানের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। অনেকে কৃষি ও শিল্প বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন। সকলই সন্তোষের বিষয়। সমালোচকগণ বলিবেন, ও সব করায় কাজের কিছু হইবে না। আমরা এরূপ সমালোচনার বিরোধী। সমগ্র বঙ্গের লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। ইহার ফল অবশ্যই পাইব। এদিকের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই মনোযোগী হইয়াছেন। আর দাসত্বের দিন-যাপন করিতে হইবে না। কৃষি ও শিল্পের দিকে উন্নতি করিতে হইবে।

কৃষি ও শিল্পমেলা কি তাহা অনেকেই বুঝেন না। তাই কৃষক ও শিল্পকারগণ, তোমরা বুঝিয়াছ কি? ইহা থিয়েটার বা যাত্রা বা নানা তামাসার জন্য নহে। ইহা বাবুদের আমোদ করিবার স্থান নহে। কুষ্টিয়ায় আমোদ-প্রমোদ ও বারোয়ারী দেখিয়া মনে করিও না, ইহা আমোদের স্থান। কৃষি ও শিল্পমেলা তোমাদের পরীক্ষার স্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন শিক্ষার্থীদিগের পরীক্ষা গৃহীত হয় এবং পরীক্ষার পর বিদ্যা প্রচারিত হয়। সেখানে পরীক্ষার্থীগণের মধ্যে অনেকেই বৃত্তি পান ও অর্থ উপার্জন করিয়া নিজের ও পরিবারের উন্নতি সাধন করেন। তোমরাও সেইরূপ ভালভাল জিনিস প্রস্তুত করিয়া এখানে বৎসর বৎসর পুরস্কার পাইবে এবং কোথায় কিভাবে কিরূপ কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হইতেছে তাহারও বাস্তব নমুনা দেখিতে পাইবে ও আরও শিক্ষালাভ করিবে। এইভাবে নিজের ও পরিবার-বর্গের অভাব দূর করিয়া জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন প্রতিযোগিতা, এখানেও সেরূপ প্রতিযোগিতা রহিয়াছে। যিনি সর্বোৎকৃষ্ট হইবেন তিনি প্রকৃত মানুষ। তিনি প্রশংসা পাইবেন, উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইবেন। পাপ করিলে মনে সর্বদাই কষ্ট ও যন্ত্রনা ও গ্লানি উপস্থিত হয়, কিন্তু ভাল জিনিস প্রস্তুত করিলে বা ভাল কাজ করিলে

মেলাতে পুরস্কার পাইবে ও সমাজে প্রশংসা পাইবে। ইহাতে যে আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ লাভ হয় তাহার মূল্য পৃথিবীতে নাই।

হে কর্মিষ্ঠ কৃষকগণ, তোমাদের কৃত সবুজবর্ণের ধান্য সুশোভিত ক্ষেত্র দেখিলে ও তোমাদের হৃদয়ে সুমধুর স্বাধীন সঙ্গীত শুনিলে আমাদের এই দাসত্ব জীবন ছাড়িয়া কৃষক হইতে ইচ্ছা হয়।

এই মেলা ভারতমাতার পূজার মণ্ডপ। কৃষি ও শিল্পদ্রব্য দিয়া এই মণ্ডপ সাজানো হইয়াছে। এই মেলা প্রস্তুতের টাকা উঠিবার কোনই আশা নাই। সেকারণে অনেকেই ইহার জন্য টাকা দিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েন নাই। সেইজন্য হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। তোমরাই তোমাদের জন্য উপযোগী হও, নিজেদের বিশ্বকর্মা-পুত্র বলিয়া মনে কর, দেখি, দেশের বড়লোক টাকা দেন কিনা। মনপ্রাণ দিয়া কিছু করিলে লোকের সহানুভূতি নিশ্চয় পাওয়া যায়। পরমেশ্বর মানুষকে পাষাণ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। তোমরা ভাবিতেছ কেন? তোমরা এই কুষ্টিয়ায় সংখ্যায় কত বেশী ভাবিয়া দেখ কি? কি উপায়ে মেলা স্থায়ী হইতে পারে তদবিষয়ে ভাবিয়া দেখিয়াছি। বড় সভা করা, বড় লোকের সাহায্য লওয়া, অনেক ভাবিয়াছি। তাহাতে বড় কৃতকার্য হইবার আশা নাই। আমি দরিদ্র, আমার একটি প্রস্তাব তোমাদের নিকট রাখিতেছি। দেখিবে, মেলা প্রতি বৎসর স্থায়ী হইবে।

তোমাদের নিজবাটীতে এই নূতন বৎসরে একটি হাঁড়ি বসাও। প্রত্যেক মেয়ে রান্নার চাউল হইতে মুঠা করিয়া চাউল রাখিয়া দাও। দেশের ধনীদিগের মধ্যে যাঁহারা এককালে টাকা দিতে কাতর তাঁহারাও এই উপায় অনুসরণ করিলে আগামী বৎসর টাকা পাইতে কোন অসুবিধা হইবে না। চাউল থাকিলেই অর্থ সংগৃহীত হয়। এইরূপেই তোমরা সহৃদয় ধনীদিগের সাহায্য পাইবে, ভয় কি? প্রাণপণে খাটো, মেলা নিশ্চয়ই চিরস্থায়ী হইয়া কুষ্টিয়ার কৃষি ও শিল্পের তথা বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিবে সন্দেহ নাই।

সদুপদেশ

সদুপদেশ পুস্তকে আছে, লোকের মুখেও ইহার অভাব নাই। বক্তৃতা দেওয়া হয়ত কঠিন নহে, কিন্তু কার্যে পরিণত করা কঠিন। আমার ন্যায় লোকের মুখে সদুপদেশ শুনিয়া কাহারও কোন উপকার হইবার আশা নাই। তথাপি সত্যকথার বড় বল, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

ভাই কৃষক ও শিল্পকারগণ, তোমাদের কয়েকটি সদুপদেশ দিতেছি। প্রতিদিন ইহা স্মরণ করিয়া কার্য করিও।

১। মিথ্যা কথা বলিও না।

২। অলস হইও না।

৩। দুঃখী ও নিরাশ্রয়দিগকে সাহায্য করিও।

৪। গরুকে নিজ সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিও।

৫। কৃষিজাত ও বাণিজ্যদ্রব্যের ব্যবসাকালে কাহাকেও বঞ্চনা করিও না।

৬। যাহার যাহা প্রাপ্য যথাসময়ে মিটাইয়া দিও।

৭। নিজের শরীর ও বাটীর ও পল্লীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখিও।



ঃ লালন-জীবনী ঃ
হিতকরী পত্রিকা ঃ রাইচরণ দাস

আবুল আহসান চৌধুরী

বাংলাদেশে কুষ্টিয়ার মজমপুর নিবাসী মঃ আবুল আহসান চৌধুরী একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্। ইনি রাইচরণ দাস মহাশয়ের জীবন ও সাহিত্যের বিষয়ে অনুসন্ধান করে অনেক লুপ্ত-উদ্ধার করেছেন। এঁর লেখা 'সংক্ষিপ্ত কুষ্টিয়ার পরিচিতি' একটি প্রামাণ্য ইতিহাস। রাইচরণ দাস লিখিত 'মহাত্মা লালন ফকীর' রচনাটি ও চৌধুরীসাহেবের প্রবন্ধটির কিছু অংশ এঁরই সম্পাদিত 'লালন স্মারক গ্রন্থ' ও 'লোক সাহিত্য পত্রিকা' থেকে উদ্ধৃত।

পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকা বাংলা ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাস (ইং ১৮৯০ সালের এপ্রিল) থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন মোহিনীপাড়া-নিবাসী শ্রীদেবনাথ বিশ্বাস। 'হিতকরী' রজনীকান্ত ঘোষ কর্তৃক কুমারখালী মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্র থেকে মুদ্রিত হতো। প্রতি কপি পত্রিকার মূল্য ছিল দুই পাই; ডাকমাশুলসহ বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। হিতকরীতে সম্পাদকের নাম থাকতো না। সহকারী সম্পাদক হিসেবে কুষ্টিয়া শহরের আমলাপাড়া নিবাসী রাইচরণ দাসের নাম থাকতো। তবে বেশ বোঝা যায়, মীর মশার্‌রফ হোসেন (বিষাদ-সিন্ধু প্রণেতা)-ই এই পত্রিকার সম্পাদক ও সত্বাধিকারী ছিলেন।

লালনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ১৮৯০ সালের ৩১শে অক্টোবর (বাংলা ১২৯৭ সালের ১৫ই কার্তিক)-এর 'হিতকরী' পত্রিকার ১ম ভাগ ১৩শ সংখ্যার সম্পাদকীয়স্তম্ভে (১০০ পৃ-১০১ পৃ) 'মহাত্মা লালন ফকীর' নাম দিয়া এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হলেও তা তথ্যবহুল, প্রামানিক ও সুলিখিত।

হিতকরীতে প্রকাশিত কোনো নিবন্ধেই লেখকের নাম থাকতো না। (আমি যতগুলো সংখ্যা দেখার সুযোগ পেয়েছি অন্ততঃ তার মধ্যে নেই)। সম্ভবতঃ মীর মশার্‌রফ হোসেন এবং কুষ্টিয়ার উকিল রাইচরণ দাস (যিনি

একাধারে হিতকরীর সহ-সম্পাদক ও এজেণ্ট ছিলেন) অধিকাংশ সময় এই নিবন্ধগুলি লিখতেন।

যতদূর মনে হয়, এটি রাইচরণ দাসের রচনা। এই ধারণার সঙ্গত কারণও আছে। রাইচরণ দাস লালনের পরিচিত ছিলেন। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ও রাইচরণ দাসের সঙ্গে লালনের যোগাযোগ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, 'কুষ্টিয়ার উকিলবাবু রাইচরণ দাস, কুমারখালীর খ্যাতনামা হরিনাথ মজুমদার ও তাঁহার ফিকিরচাঁদের দলস্থ লোকেরা লালনের অনেক গান ও জীবনের অনেক ঘটনা জানেন……।' সাহিত্যরসিক রাইচরণ দাস কুষ্টিয়ার একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। তাঁর বাড়ী ছিল কুষ্টিয়া শহরের মধ্যস্থিত আমলাপাড়ায়। এই স্থানে 'রাইচরণ ব্যারাক' এখনো তাঁর স্মৃতিচিহ্ন বহন করে আছে। রাইচরণ দাসের পারিবারিক পরিবেশ ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার বিশেষ অনুকূল। তাঁরই দৌহিত্র শ্রীকুমারেশ ঘোষ বর্তমানে পশ্চিম-বাঙলার একজন বিশিষ্ট কথাশিল্পী ও সাময়িকপত্রসেবী। আমলাপাড়া থেকে ছেঁউড়িয়ার দূরত্ব খুব বেশী নয়—এক মাইল থেকে সওয়া মাইল মতো হবে। অতএব রাইচরণের সঙ্গে লালনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা এবং ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় তাঁর যাতায়াত খুবই সম্ভব ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। 'মহাত্মা লালন ফকীর' নিবন্ধ পড়ে জানা যায় লেখকের সঙ্গে লালনের ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয় ছিল। এ বিষয়ে নিবন্ধকার বলেছেন, 'ইঁহাকে (লালন) আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি ; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি।' অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র উল্লেখানুযায়ী লালনকে প্রত্যক্ষদর্শী এই বক্তা যে রাইচরণ দাস তা সহজেই অনুমান করা যায়। রাইচরণ দাসই যে নিবন্ধের রচয়িতা আমার এই মত প্রখ্যাত গবেষক ও ঐতিহাসিক জনাব সৈয়দ মুর্তাজা আলীও সমর্থন করেছেন। অপরদিকে মনে হতে পারে নিবন্ধটি মীর মশার্‌রফের রচনা কিনা। এর প্রেক্ষিতে বলা যায় সেই সময়ে অর্থাৎ ১৮৯০ সালের অক্টোবর মাসে লালনের মৃত্যুর সময় মীর সাহেব টাঙ্গাইলে ছিলেন। তাই রচনাটি মীর সাহেবের না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। লালনের মৃত্যুর পরপরই নিবন্ধকারের ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় উপস্থিতির ইঙ্গিত নিবন্ধের মধ্যে পাওয়া যায়। লালনের মৃত্যু হয় ১৭ই অক্টোবর। আর ঐ সংখ্যা হিতকরী প্রকাশিত হয় ৩১শে অক্টোবর। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে উপকরণ সংগ্রহ

করে নিবন্ধ রচনার জন্য ব্যক্তিগত উপস্থিতির প্রয়োজন সমধিক। এই সময়ের মধ্যে মীর সাহেবের কুষ্টিয়া উপস্থিতি ও নিবন্ধ রচনা সম্ভবপর নয়। 'মহাত্মা লালন ফকীরের' গন্থ ও মীর মশার্‌রফ হোসেনের গন্থ রচনাও অনুরূপ বলে মনে হয় না।

লালনের মৃত্যুতে প্রকাশিত তাঁর জীবন-পরিচিতি সম্বলিত হিতকরীর এই সংখ্যাটি বহুদিন যাবত ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় রক্ষিত ছিল। আখড়ার পরিচালকরা কাগজটি আগ্রহী পরিদর্শকদের দেখাতেন। লালন-শিষ্যরা হিতকরীর এই বিবরণীর সত্যতা সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

রাইচরণ দাস লিখিত রচনাটি নিম্নে দেওয়া হলো—

মহাত্মা লালন ফকীর

(হিতকরী : ৩১শে অক্টোবর, ১৮৯০)

লালন ফকীরের নাম এ অঞ্চলে কাহারও শুনিতে বাকী নাই। শুধু এ অঞ্চলে কেন, পূর্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রঙ্গপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেকদূর পর্যন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকীরের শিষ্য ; শুনিতে পাই ইঁহার শিষ্য দশ হাজারের উপর। ইঁহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। কুষ্টিয়ার অনতিদূরে কালীগঙ্গার ধারে সেওরিয়া গ্রামে ইঁহার একটি সুন্দর আখড়া আছে। আখড়ায় ১৫/১৬ জনের অধিক শিষ্য নাই। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল ও ভোলাই নামক দুইজনকে ইনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন ; অন্যান্য শিষ্যগণকে তিনি কম ভালবাসিতেন না। শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁহার ভালবাসার কোন বিশেষ তারতম্য থাকা সহজে প্রতীয়মান হইত না। আখড়ায় ইনি সস্ত্রীক বাস করিতেন ; সম্প্রদায়ের ধর্ম-মতানুসারে ইঁহার কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকের স্ত্রী আছে, কিন্তু সন্তান হয় নাই। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার শুধু এই মহাত্মার শিষ্যগণের মধ্যে নহে বাউল-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ স্থানে এই ব্যাপার লক্ষিত হয়। সম্প্রতি সাধুসেবা বলিয়া এই মতের এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। সাধুসেবা হইতে লালনের শিষ্যগণের না হউক নিজের মত

বিশ্বাস অনেকাংশে ভিন্ন ছিল। সাধুসেবা ও বাউলের দলে যে কলঙ্ক দেখিতে পাই, লালনের সম্প্রদায়ে সে প্রকার কিছু নাই। আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে জানিয়াছি সাধুসেবায় অনেক দুষ্ট লোক যোগ দিয়া কেবল স্ত্রীলোক-দিগের সহিত কুৎসিত কার্য্যে লিপ্ত হয় এবং তাহাই তাহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। মতে মূলে তাহার সহিত ঐক্য থাকিলেও এ সম্প্রদায়ের তাদৃশ ব্যাভিচার নাই। পরদার ইঁহাদের পক্ষে মহাপাপ। তবে প্রত্যেক সৎনিয়মের ন্যায় ইহারও অপব্যবহার থাকা অসম্ভব নহে। বাউল, সাধুসেবা ও লালনের মতে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন শ্রেণীতে যে একটি গুহ্য ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে, লালনের দলে তাহাই প্রচলিত থাকায় ইহাদের মধ্যে সন্তান-জননের পথ এককালে রুদ্ধ। 'শান্ত-রতি' শব্দের বৈষ্ণবশাস্ত্রে যে উৎকৃষ্টভাব বুঝায়, ইহারা তাহা না বুঝিয়া অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয় সেবায় রত থাকে। এই জঘন্য ব্যাপারে এ দেশ ছারেখারে যাইতেছে, তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গকে বেশী কিছু জানাইতে স্পৃহা নাই।

শিষ্যদিগের ও তাহার সম্প্রদায়ের এই মত ধরিয়া লালন ফকীরের বিচার হইতে পারে না। তিনি এ সকল নীচ কার্য্য হইতে দূরে ছিলেন ও ধর্ম-জীবনে বিলক্ষণ উন্নত ছিলেন বলিয়া বোধহয়। মিথ্যা জুয়াচুরিকে লালন ফকীর বড়ই ঘৃণা করিতেন। নিজে লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোন শাস্ত্রই পড়েন নাই; কিন্তু ধর্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্ম-সাধনে তাঁহার অর্ন্তদৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় সার-তত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন নিজে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না; অথচ সকল ধর্মের লোকই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার-ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত; বৈষ্ণবধর্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুরা তাঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু ইঁহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই; ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন। অধিক কি, ইঁহার শিষ্যগণ ইঁহার উপাসনা ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত না। সর্বদা 'সাঞ' এই কথা তাহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ইনি নোমাজ করিতেন না। সুতরাং

মুসলমান কি প্রকারে বলা যায়? তবে জাতিভেদবিহীন অভিনব বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে; বৈষ্ণবধর্মের দিকে ইঁহার অধিক টান। শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সময় সময় যে উচ্চ সাধনের কথা ইঁহার মুখে শুনা যাইত, তাহাতে তাঁহার মত ও সাধন সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত। যাহাহউক, তিনি একজন পরম ধার্মিক ও সাধু ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। লালন ফকীর নাম শুনিয়াই হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন ইনি বিষয়হীন ফকীর ছিলেন; বস্তুতঃ তাহা নহে। ইনি সংসারী ছিলেন; সামান্য জোতজমা আছে; বাটীঘরও মন্দ নহে। জিনিষপত্রও মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থের মত। নগদ টাকা প্রায় ২ হাজার রাখিয়া মরিয়া যান। ইঁহার সম্পত্তির কতক তাঁহার স্ত্রী, কতক ধর্মকন্যা, কতক শীতলকে ও কতক সৎকার্যে প্রয়োগের জন্য ইনি একখানি ফরমমাত্র করিয়া দিয়াছেন। ইনি নিজে শেষকালে কিছু উপায় করিতে পারিতেন না। শিষ্যরাই ইঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিত। বৎসর অন্তে শীতকালে একটি ভাণ্ডারা (মহোৎসব) দিতেন। তাহাতে সহস্রাধিক শিষ্যগণ ও সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হইয়া সঙ্গীত ও আলোচনা হইত। তাহাতে তাঁহার ৫/৬ শত টাকা ব্যয় হইত।

ইঁহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন না। শিষ্যরা হয়ত তাঁহার নিষেধক্রমে, না হয় অজ্ঞতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারে না। তবে সাধারণে প্রকাশ লালন ফকীর জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়ার ভৌমিক বংশীয়েরা ইঁহার জ্ঞাতি। ইঁহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই। ইনি নাকি তীর্থভ্রমণকালে পথে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গীগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় একটি মুসলমানের দয়া ও আশ্রয়ে জীবন লাভ করিয়া ফকীর হন। ইঁহার মুখে বসন্তরোগের দাগ বিদ্যমান ছিল। ইনি ১১৬ বৎসর বয়সে গত ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই বয়সেও তিনি অশ্বারোহণ করিতে দক্ষ ছিলেন এবং অশ্বারোহণে স্থানে স্থানে যাইতেন। মৃত্যুর প্রায় এক মাস পূর্ব হইতে ইঁহার পেটের ব্যারাম হয় ও হাত পায়ের গ্রন্থি জলস্ফীত হয়। দুধ ভিন্ন পীড়িত অবস্থায় অন্য কিছুই খাইতেন না। মাছ খাইতে চাহিতেন। পীড়িতকালেও পরমেশ্বরের নাম পূর্ববৎ সাধন করিতেন; মধ্যে মধ্যে গানে উন্মত্ত হইতেন। ধর্মের

আলাপ পাইলে নববলে বলীয়ান হইয়া রোগের যাতনা ভুলিয়া যাইতেন। এই সময়ের তাঁহার রচিত কয়েকটি গান আমাদের নিকট আছে। অনেক সম্প্রদায়ের লোক ইঁহার সহিত ধর্মালাপ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। মরণের পূর্ব-রাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া রাত্রি ৫টার সময় শিষ্যগণকে বলেন 'আমি চলিলাম।' ইহার কিয়ৎকাল পরে শ্বাসরোধ হয়। মৃত্যুকালে কোনো সম্প্রদায়ী মত্যানুসারে তাঁহার অন্তিমকার্য্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। গঙ্গাজল হরেনাম নামও দরকার (হয়) নাই। হরিনাম কীর্তন হইয়াছিল। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি কিছুই হইবে না। বাউল সম্প্রদায় লইয়া মহোৎসব হইবে, তাহার জন্যে শিষ্য-মণ্ডলী অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল, মহরম সা, মানিক সা ও কুধু সা প্রভৃতি কয়েকজন ভাল লোক আছেন। ভরসা করি, ইহাদের দ্বারা তাঁহার গৌরব নষ্ট হইবে না, লালন ফকীরের অসংখ্য গান সর্বত্র সর্বদাই গীত হইয়া থাকে। তাহাতেই তাঁহার নাম, ধর্ম, মত ও বিশ্বাস সুপ্রচারিত হইবে। তাঁহার রচিত একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

গান।

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন ভাবে জাতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে।

১। কেউ মালায় কেউ তছবি গলায়,
তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কার রে॥

২। যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান,
বামণ চিনি পৈতা প্রমাণ,
বামণি চিনি কিসে রে॥

৩। জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করে যথাতথা,
লালন সে জেতের ফাতা
ঘুচিয়াছে সাধ বাজারে॥

কুষ্টিয়ার স্মৃতিকথা ঃ রাইচরণ দাস

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন

১৯০৯ সালের জানুয়ারীতে নদীয়া জেলার সেনগ্রাম মাইনর স্কুল থেকে বৃত্তিসহ উচ্চ প্রাইমারী পাশ করি,—পরীক্ষা হয়েছিল তৎকালীন কুষ্টিয়া মহকুমা শহরে (বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা সহর)। ১৯১১ সালের জানুয়ারীতে সেনগ্রাম মাইনর স্কুল থেকে বৃত্তি পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়ে বৃত্তি লাভ করি—পরীক্ষা হয়েছিল চুয়াডাঙ্গা মহকুমা শহরে। মাইনর স্কুলটি ১৯০৯/১০ সাল পর্যন্ত শ্রীযুক্ত রাইচরণ দাস মহাশয়ের বাড়ীর সান্নিধ্যে ছিল। তারপর

সেনগ্রামের ঐ এলাকা সেটেলমেণ্টের মাপে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হ'য়ে যাওয়াতে, ঐ স্কুল সেখান হ'তে সরিয়ে সেনগ্রাম হাটের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য তখনও সদাশয় রাইচরণবাবুই ঐ স্কুলের সর্বময় কর্তা এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

রাইচরণবাবুর বাড়ীর স্কুল-চত্বর থেকে সেনগ্রামের হাট প্রায় এক মাইল দক্ষিণে, একই গলির উপরে। বর্ষাকালে ঐ গলির পার্শ্ববর্তী খালে পদ্মানদীর পানি ব'য়ে যেত আর স্থানে স্থানে গলিটাও পানির নীচে ডুবে যেতো। অধিক বর্ষা হ'লে গলির উপর দিয়ে নৌকা চলতো। বছর পাঁচেক আগে আমি আমার পুরাতন স্কুলের স্থানটা দেখবার জন্য রাইচরণ বাবুর বাড়ীর কাছে গিয়ে দেখি, সেই পূর্বতন স্কুলের চত্বরটার সর্বত্র জুড়ে গেছে বটের শিকড়ে। এরপর রাইচরণবাবুর দালানঘরে এসে দেখলাম, দালানের চারপাশের দেওয়ালে এবং ছাদে'ও বটপাঁকুড়ের লম্বা লম্বা চারার সমারোহ। পুকুরের পানিতে শেওলা জমেছে। বাড়ীটা বিরাট। দুই-চারটা পেয়ারা গাছ বেশ মোটা হ'য়ে গেছে। গাছের পেয়ারা এখন নির্বিঘ্নে বাদুড়ে খেয়ে যায়।

রাইচরণবাবুর কথা উল্লেখ করবার বিশেষ হেতু এই যে, স্কুলের ছাত্র-বেতনে বা গভর্ণমেণ্টের দেওয়া সাহায্যে স্কুলের শিক্ষকদের বেতন দেওয়া বা স্কুলঘরের মেরামত করার খরচপত্র পোষাত না; অতিরিক্ত খরচ যা লাগতো সব রাইচরণবাবু (স্কুলের সেক্রেটারী হিসাবে) একাই বহন করতেন। স্কুলটা সর্বদাই কুষ্টিয়া (নদীয়া) জেলার অন্তর্গত ছিল; আর রাইচরণবাবুও কুষ্টিয়াতেই ওকালতি ক'রে সেখানেই গৃহ নির্মাণ করে অবস্থান করতেন।...

রাইচরণবাবুর মাইনর স্কুলে পড়বার সময় এই দেশ-দরদীর কথা কিছু বলা হ'য়েছে—এবার কুষ্টিয়া হাইস্কুলে পড়বার সময়কার একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। কুষ্টিয়া কোর্টের দক্ষিণ দিকে যেমন অফিসারদের একটা ক্লাব ছিল, তেমনি এর উত্তর দিকেই ছিল কোর্ট ষ্টেশন। এখানে আমীনুল ইসলাম সাহেবের সময় থেকেই দিবসের মেলগাড়ীগুলো থামতো। এখানে যেমন ছিল রেলযাত্রীর ভিড়, তেমন ছিল স্কুলের ছাত্রদের একটা ভ্রমণাগার। আমি একদিন রেলষ্টেশনের স্কেল-ব্যালান্স-এর হ্যাণ্ডেল ধরে নাড়াচাড়া করছিলাম, এমন সময় কেমন করে যেন হাতের থেকে লেভার-এর ওজন কাঠিটা মাপনযন্ত্রের পেটের ভিতর ঢুকে গেল। আমি অসহায়ভাবে হতভম্ব

হয়ে ওটা তুলে আবার হাতলের সঙ্গে লাগাবার চেষ্টা করছি, এমন সময় ষ্টেশনমাষ্টার ব্যাপার দেখে, আমাকে ঐখানেই চুপ করে বসে থাকতে বললেন। আমার একবারও মনে হ'ল না,—দৌড়ে পালায়ে যাই। আমার কেবল মনে হচ্ছিল একটা অপরাধ যখন করে ফেলেছি, তখন আমাকে তার ফলভোগ করতেই হবে। তাই আমি সুবোধ বালকের মত বিষণ্ন মনে চুপ করে বসে রইলাম। ঘণ্টা খানেক পরে দেখতে পেলাম রাইচরণবাবু প্লাটফর্ম দিয়ে হেঁটে আসছেন। কাছে এসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'একি! মোতাহার তুমি এখানে বসে কি করছো?' আমি বল্লাম, 'ওমন কলের কলকব্জা নাড়াচাড়া করতে করতে এর একটা অংশ খুলে গিয়ে কলের মধ্যে ঢুকে গেছে, তাই ষ্টেশনমাষ্টারবাবু আমাকে এখানে বসে থাকতে বলেছেন। এখান থেকে চলে যেতে দেখলে হয়ত আমাকে ধরে নিয়ে জেলেই দেবেন।' এ কথা শুনে রাইচরণবাবু যেন আগুন হয়ে গেলেন। ষ্টেশনমাষ্টারকে তিরস্কার করতে করতে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বল্লেন, 'কি হ'য়েছে? তোমাদের কল, তোমরাই জান কেমন করে ঠিক করতে হয়। ছেলেমানুষ ত কলকাঠি দেখলে অমন নাড়চাড়া করেই থাকে। সেজন্য কি ওকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নজরবন্দী করে রাখবে? কল খারাপ হয়েছে তো মিস্ত্রী ডেকে কল সারানোই তোমার কাজ। বারংবার এমন করলে তোমার ষ্টেশনমাষ্টারী ঘুচিয়ে দেব।' এই বলে আমাকে সঙ্গে করে রেলের ওপারে গিয়ে নিজের গাড়ীতে করে আমাকে তাঁর নিজের বাড়ী আমলাপাড়ায় গিয়ে খুব করে চিড়ে-মুড়কী, লুচি-গজা, সন্দেশ-রসগোল্লা খাওয়ালেন। আর বললেন, 'তোমার কোনো দরকার হলেই আমার এখানে চলে এসো। তুমি যেমন করে আমার সেনগাঁ-র স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছ, এখানেও তেমন করে কুট্টে-স্কুলের নাম রাখবে। এই আমি চাই।' এর পর থেকে আমি মাঝেমাঝে তাঁর বাড়ীতে যেতাম; তিনিও খুশী হ'য়ে আমাকে নানা উপদেশ দিতেন।

রাইচরণেষু

কুমারেশ ঘোষ

দিনকাল বদলে যায়। তাই একদা আমি কুষ্টিয়ায়, সেনগ্রামে ও মহলায় রাইচরণ দাসের নাতি নামেই পরিচিত ছিলাম। এখন দাদামশায় কী ছিলেন, কেমন ছিলেন—তাঁকে পরিচয় করাতে হচ্ছে আমাকে।

তাই হোক। আমার 'স্মৃতিকথা'য় দাদামশায়ের যে ছবি এঁকেছি, তারই কিঞ্চিৎ বিবরণ থেকে বোঝা যাবে মানুষটি কেমন ছিলেন। তাঁর শ্রীচরণে আমার এই শ্রদ্ধার্ঘ—'রাইচরণেষু'।

কুষ্টিয়ায় গেটওলা বাড়িটা। গেটের পাশেই একটা কামিনীফুলের গাছ। গেটের পরেই খানিকটা খোলা জায়গা। তার পরেই দোতলা পাকা বাড়ি। বসত বাড়ি। সামনে বড় লম্বা খোলা বারান্দা। তার গায়ে চওড়া ঢাকা বারান্দা। সেখানে চৌকি পাতা। দাদামশায়ের সেরেস্তা। সকালে মক্কেলের ভীড়। তার পেছনেই বাড়িতে ঢোকবার সদর দরজা। দরজার মাথায় গোল করে লেখা: 'ওঁ, ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম। রাইচরণ দাস, উকিল, কুষ্টিয়া।' পরে জেনেছিলাম, দাদামশায় ব্রাহ্মধর্মী ছিলেন। কলকাতায় ব্রাহ্ম সমাজে মাঘোৎসবে যোগ দিতে আসতেন। কলকাতার সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা হেরম্ব চন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে 'প্রিয় ভ্রাতঃ' সম্বোধনে চিঠি লেখালেখিও হতো। কলকাতায় গড়পারে দাদামশায়ের রোগশয্যায় মৈত্রমশায় কয়েকবার দেখা করতেও এসেছিলেন দেখেছি।

দাদামশায়ের সেরেস্তার পাশের ঘরখানা ছিলো তাঁর মহুরী পূর্ণচন্দ্র পালের ঘর। তিনি খালি গায়ে পিঠ কুঁজো করে নাকের ডগায় নিকেলের চশমা লাগিয়ে বড়বড় কাগজে কম্পাস-স্কেল দিয়ে কী সব দাগ কাটতেন আর মাঝেমাঝে উঠে থেলো হুঁকোয় তামাক সেজে খেতেন। তাঁর ঘরের এক কোনে থাকতো কাঠের লম্বা ভাঁজ করা ষ্ট্যাণ্ড, জমি মাপবার শেকল ইত্যাদি জরীপের সরঞ্জাম। দাদামশায় শুধু উকিল ছিলেন না, সার্ভেয়ার ও কমিশনার ছিলেন।

এই পূর্ণবাবুর এক ভাইপো ঐ বাড়িতে এলো কুষ্টিয়ার স্কুলে পড়াশুনো করতে। নাম বিরজা। রোগা ছিপছিপে গড়ন, ফর্সা। তাকে নিয়ে একদিন এক কাণ্ড ঘটলো। দাদামশায়ের হঠাৎ কী খেয়াল হলো, তাকে ডেকে বললেন, 'দেখি, স্কুলে কী পড়াচ্চে। ইংরেজী বইটা নিয়ে এসো, রিডিং পড়ো।' বিরজা রিডিং পড়তে গিয়ে 'ভাইসরয়' কথাটায় হোঁচট খেলো। উচ্চারণ করলো, 'ভি-ভি-ভিকরি।' ব্যস, সঙ্গেসঙ্গে দাদামশায়ের চীৎকার, 'ও পুনম্নু, শীগগির এসো, শুনে যাও তোমার ভাইপোর কথা। মহামান্য ভাইসরয়-কে বলচে ভিখিরী। সর্বনাশ হলো আমার। আমার হাতে হাতকড়ি পড়বে এবার।'...আমি সেই অল্প বয়সেও কাকা-ভাইপোর করুণ অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম। দাদামশায় বাইরে দারুণ রাশভারি ছিলেন। আমি নাতি, তবু কাছে এগোতাম না ভয়ে। তবে ভেতরে তিনি রসিক ছিলেন। ফল্গুধারার মতই।

পূর্ণচন্দ্রের পাশের ঘরে থাকতেন আর এক চন্দ্র। তাঁর নাম শশধর। শশধর মিত্র। দাদামশায়ের আর এক মহুরী. গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। গায়ের রং প্রায় আলকাতরার মত। আর তাঁর হাতের লেখা ছিল পাকা, তবে পিঁপড়ের পায়ে কালি লাগিয়ে কাগজের ওপর ছেড়ে দিলে যেমন আঁকা হয়ে যায় তেমনি।

আর ছিলেন খোরজান-মামা। দাদামশায়ের তল্পিবাহক, পার্শ্বচর, পরামর্শদাতা। দাদামশায়ের মফঃস্বলযাত্রার একান্ত সঙ্গী। খোরজান-মামা তাঁর নিজের বাড়িতে কাছেই কোথাও থাকতেন, তবে নিয়মিত সকালে হাজিরা দিতেন। আর খোরজান-মামা এলে আমি আনন্দে টগবগ করে উঠতাম। টগবগে টাট্টুঘোড়ার মতই, তাঁকে দেখলেই পেছন থেকে তাঁর লুঙ্গীর কষিতে পা বাধিয়ে দিয়ে পিঠ বেয়ে কাঁধে চেপে বসতাম। বেঁটে খাটো দোহারা চেহারার মানুষটি, দাঁতের মাড়ি সামান্য বার করা। কথায় তোতলামি।

বাড়িতে প্রতি বেলায় পাত পড়তো পঁচিশ তিরিশটা। বাইরের লোকও এসে খেতেন প্রায়ই। শুনতাম, তাঁরা ঐ মফঃস্বল থেকে এসেচেন।

সকলের খাওয়ার জন্মে কাঠের পিঁড়ি পাতা হতো, কলাপাতা ধুয়ে দেওয়া হতো আর পাতে পড়তো লাল মোটা চাল, মটর ডাল, তরকারি, মাছের ঝোল। বেশির ভাগ সময়েই ইলিশ মাছ। তারপর দই। লম্বা

ভাঁড়ে দই আসতো। তার ওপরটায় হলদে রংয়ের সর, তবে পাতলা। টক দই। প্রতিদিনের ঐ যজ্ঞিবাড়ির রান্নার জন্যে ঠাকুর-টাকুরের পাট ছিলোনা, বাড়ির মেয়েরাই সব করতেন। ঐসব চালের ধান, মটর, কলাইয়ের ডাল সব আসতো নিজস্ব জমি থেকে। গোড়োই নদীর ওপারে বেনে-পাড়ার চর থেকে, নিবে-মাছপাড়ার জমি থেকে, মেঘনা বিলের জমি থেকে। কুষ্টিয়া থেকে গোয়ালন্দ যাবার পথে চড়াইকোল, কুমারখালী-র কয়েকটা ষ্টেশনের পরই ছিল মাছপাড়া ষ্টেশন। মাছপাড়ার কাছেই ছিল নিবে বা নিবাহ মৌজা। তার মাইল দেড়-তুই হাঁটা পথের পরেই পড়তো বিল মেঘনা। সেখান থেকে আরো মাইল দেড়-তুই দূরে ছিল দাদামশায়ের আদিবাড়ি সেনগ্রাম। পদ্মানদীর ধারে। সেখানেও ছোটবেলায় একবার গেছলাম। যতটা মনে পড়েছে, ঐ খোরজান-মামার কাঁধে চড়ে। দোতলা বাড়ি, বিরাট পুকুর। দুর্গাপুজো হয়েছিলো সেবার, বাড়িতেই প্রতিমা গড়া হয়েছিলো। গড়া শেষ হলে কুমোর কী যেন তেল লাগালো, চকচক করতে লাগলো প্রতিমা। ঘাম তেল।

দাদামশায়ের কাছে বেশি ঘেঁষতাম না। রীতিমত রাশভারি লোক। বাজখাঁই গলা, তাঁর মক্কেলদেরও তেড়ে ওঠেন, নিজের কাজকর্ম নিয়েই সময় কাটান, কাজের ভুল হলে পূর্ণবাবু বা শশধরমামাও রেহাই পান না, তাঁরা বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে থাকেন। শুধু নিজের দুঃখের কথা, মনের কথা, মফঃস্বলে গিয়ে কী করে এলেন, সেখানে কীভাবে গেলেন এবং কীভাবে এলেন ইত্যাদি সব কিছু বিস্তৃতভাবে বলবার এবং শোনবার একমাত্র পাত্রী ছিলেন আমার মা। তাঁর কাছেই যত কথা। এবং সে কথা তখন-তখনই শুনতে হবে, তা সে অসময়েই হোক আর হাতে কাজই থাকুক। দাদামশায়ের তো সময় হয়েছে একটু কথা বলবার। অন্যের হাতের কাজ হয়তো একটু অপেক্ষা করতে পারে।

এ হেন দাদামশায়কে কখনো 'দাত্ন' বলে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরা ছিল আমার কাছে স্বপ্নাতীত ব্যাপার। (আর তখন 'দাত্ন' বলাটা চালুও ছিল না, এখন যেমন ট্রামে বাসেও চালু)। দাদামশায় অবশ্য আমাকে আনি দুআনি সিকিটা আধুলিটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে, ঠিক কথায় ঘুস দিয়ে ভাব জমাবার চেষ্টা করতেন, তবে আমি ঘুসটাই নিতাম, ঘেঁষতাম না কাছে। দাদামশায় মায়ের কাছে নালিশ করতেন, 'ভাখো মা, তোমার ছেলে

আমার কাছে আসতেই চায় না।' মা বকতেন আমাকে। তাঁর বুড়ো ছেলেকে বোঝাতেন, 'খোকা বড় দুষ্টু হয়ে যাচ্ছে। কী করবো বাবা, কথা শোনে না।' তবে আমার বোনেরা দাদামশায়ের কাছে গিয়ে বসতো, খুস না পেলেও। তাতে হয়তো দাদামশায় কিছুটা সান্ত্বনা পেতেন।

জ্ঞান হতেই বুঝলাম তাঁর নাম ডাক খুব, জমজমাট পসার। দেখলেই ভয় করে। চেহারাটাও লম্বা চওড়া, নাকের নীচেয় ছাঁটা-গোঁফ আর বেশ বড় রকমের ভুঁড়ি। তাঁর জুতোজোড়াই বা কী বিরাট আর ওজনে ভারি ছিলো। একেবারে পুরুষ-সিংহ। অথচ নামটা তাঁর বিনয়ে অবনত—রাইচরণ দাস, রাই-চরণে দাস।

দাদামশায় ঢিলেঢালা কাজ মোটেই পছন্দ করতেন না। সব কিছু তড়িৎঘড়িৎ হওয়া চাই। 'এখুনি বেরুতে হবে, খেতে দাও'—বলেই মাথায় সরষের তেল মাখতে মাখতেই চললেন নদীতে ডুব দিতে। দিয়ে এসেই বললেন, 'কই ভাত দাও, দিলে না এখনও? কই?' শুরু হয়ে গেল তাগিদ। তাড়াতাড়ি আসন জল দেওয়া হলো, কলাপাতা পাতা হলো। আবার তাগিদ। মা হয়তো বললেন, 'বাবা, একটু বসুন, ভাত হয়ে এলো।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'যা হয়েচে তাই দাও।' অগত্যা উনুনে হাঁড়ি থেকে হাতা কেটে আধ-সেদ্ধ ভাত ঘি আলুভাতে বা বেগুনভাতে দেওয়া হলো, মাছ আগে ভাজা থাকলে মাছভাজা। এরকম তাড়াহুড়ো শুধু কোথাও যাবার তাগীদের সময় নয়, প্রায়ই সব সময়েই। আমরা উঁকি মেরে দেখতাম, উনুনে চড়ানো হাঁড়ি থেকে হাতায় করে বারেবারে ভাত আনা হচ্চে, ডাল মাছের ঝোল আনা হচ্চে, আর উনি সামান্য একটু ঠাণ্ডা করেই মুখে তুলচেন। দাদামশায় ছিলেন প্লীডার-কমিশনার। শুধু ওকালতিই করতেন না, মাঠে ঘাটে জরীপ করতে যেতেন বাইরে। জমির মামলায় ম্যাপ আঁকতে হতো। কাজেই দাদামশায়ের আসাযাওয়া বা খাওয়ার কোন সঠিক সময় ছিলো না। বড় হয়ে দেখেছি ঐ কাজে তিনি কলকাতায় আলিপুর কোর্টেও প্রায়ই আসতেন। আর আসতেন যখন তখন দূর থেকেই আমরা তাঁর আগমন-বার্তা জানতে পারতাম। রাস্তা থেকেই 'মা সরলা, মা সরলা, কোথায় তুমি,' বলে হাঁকডাক করতে করতে বাড়িতে ঢুকতেন। আর আনতেন কেনেস্তারা টিন ভর্তি ইলিশমাছ কেটেকুটে নুন দিয়ে মাখিয়ে। হয়তো রাত এগারোটা, সবাই খেয়ে শুয়েচি তখন,

তখন শোনা গেলো হাঁক ডাক। তখনই উনুন ধরিয়ে রান্না শুরু হলো, মাছ ভাজা হলো আর পরদিন মাছ সব আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপড়শীর বাড়িতে বিলি করা হলো। যখন-তখন তাড়াতাড়ি উনুন ধরানোর অসুবিধে, তাই তখনকার দিনে গড়পারে দেশীপাড়ায় আমাদের বাড়িতেই ছিলো গ্যা'সর উনুনের ব্যবস্থা।

ছোটবেলায় কুষ্টিয়ার বাড়িতে দেখেছি, সকালে বাইরের বারান্দায় সেরেস্তায় বহুলোকের ভিড়, দুপুরে বহুলোকের খাওয়ার ব্যবস্থা আর রাত্রে হ্যারিকেন বা মোমবাতি জ্বালিয়ে তাঁর লেখা। রাত্রে ঘুমোতেন খুব কম। মাথার কাছেই থাকতো ডেস্ক, তাতে কাগজ কলম। হঠাৎ উঠে খসখস করে কী সব লিখতে শুরু করতেন।

সময় পেলে বাজারে যেতেন। সঙ্গে লোক যেতো। মনে আছে, পেছনে ঘাড়ের উপর ছাতাটা আড়াআড়ি লম্বা করে রেখে, তার দুপাশে দুখানা হাত ঝুলিয়ে দিয়ে বিরাট মানুষটি চলেচেন বাজার করতে। বাজার করতেনও তাড়াতাড়ি। দোকানীকে ধমক দিয়ে দাম কমিয়ে জিনিস কিনতেন, কিন্তু দাম দেবার সময় হয়তো কিছু বেশিই দিয়ে দিলেন। বড় বড় ইলিশমাছ চিতলমাছ আনতেন প্রায়ই। সময় থাকলে অনেক সময় নিজেই বঁটি নিয়ে কুটতে বসতেন, আমরা তখন লাঠি নিয়ে কাক চিল তাড়াতাম। নিজে রান্না করতে পারতেন। তবে সে রান্নার সময় যোগান দিতে হিমসিম খেতেন পার্শ্চর বা পার্শ্চরীরা। বলতেন, 'নিজে রান্না করে খেয়ে লেখাপড়া শিখেছি। গরীব ছিলাম, বাবুগিরি করিনি কখনো।'

ছুটির দিনে বা কোনো দিন দাদামশায় বাড়ি থাকলে বাড়ির লোকেরা সেদিন শশব্যস্ত হয়ে থাকতেন। হয়তো খেয়াল হলো ঘরের আসবাবপত্র ঠিকমত গুছিয়ে রাখা দরকার। অতএব তখনি লোকজন নিয়ে গোছানো জিনিস অগোছালো করে আবার নতুন করে গোছানো হলো। বাড়ির লোকেরা যাকে বলে নাজেহাল! আসলে কর্মবীরের বাড়িতে অকর্মার ধাড়ি হবার কোন উপায় ছিলো না কারোর।

অনেক মজার মজার কাণ্ড করতেন দাদামশায়। কোর্টে যাবেন, সার্ট প্যাণ্ট পরেচেন, কিন্তু প্যাণ্টের বেল্টটা পাওয়া যাচ্ছেনা। খুব ধমকধামকের পর হাতের কাছে গামছাটা দেখতে পেয়ে, সেটাই কোমরে বেঁধে ফেললেন। ভুঁড়ি থেকে প্যাণ্টটা নেমে যাবার ভয়টা তো গেলো, আর

ওর উপর চাপকান চাপালেই তো ব্যস, সব ঢাকা পড়ে যাবে। মধুর অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ—ব্যাপারটা দাদামশায়ের ভালোই জানা ছিলো।

দাদামশায়ের আরো কয়েকটা কাণ্ডের কথা শুনেছিলাম পূর্ণবাবু খোরজান-মামা আর মায়ের কাছ থেকে। এও এক গুড়ং দদ্যাৎ-এর কাণ্ড। একবার মফঃস্বলে গেছেন কাজে। উঠেছেন এক বর্ধিষ্ণু চাষীর বাড়িতে। তাঁর যখন-তখন খাওয়া আর ঐভাবে গরম-গরম মুখ জিভ পুড়িয়ে খাওয়া তো বাইরে গেলে সুবিধা হয় না, কাজেই দাদামশায় অনেক জায়গায় নিজেই ভাতে-ভাত রান্না করে খেতেন। ঐ চাষীর বাড়িতে তাঁকে সযত্নে চাল, ডাল, আলু, পটল, বেগুন, তেল ঘি, নুন লংকা ইত্যাদি ডালায় সাজিয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে ভাতেভাত বাঁধবার ন্যাকড়াও। দাদামশায় ঘরে উনুন জ্বালিয়ে ভাতে-ভাত চড়াতে গিয়ে দেখেন ন্যাকড়াটা ময়লা। অথচ ন্যাকড়াও চাই একটা।। তখন আর দ্বিধা না করে দরজায় খিল দিয়ে নিজের কোঁচার কাপড়ের খুঁটে ডাল বেঁধে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে ঝুলিয়ে উনুনের সামনে বসে রইলেন। এমনসময় বাইরে চাষীর ডাক: 'বাবু, দুধ আনিছি লয়ে যান।' কিন্তু বাবুর তখন ওঠবার অবস্থা নেই। আবার ডাক, 'বাবু।' এবার তেড়ে উঠলেন দাদামশায় ভেতর থেকে: 'আঃ এখন আমি আহ্নিকে বসেচি, পরে দিয়ো।'

আর একবার দাদামশায় গেছেন মফঃস্বলে জরীপের ব্যাপারে। সঙ্গে যন্ত্রপাতি কাগজপত্র নিয়ে পূর্ণবাবু আর খোরজান-মামা। কাজ শেষ করে গাঁয়ের হাটে এক মুদীখানার দোকানে এলেন সদলবলে। হাতে পায়ে ধুলো কাদা। দোকানের সামনেই দেখেন একটা কেনেস্তারা টিন ভর্তি জল। ব্যস, দাদামশায় তাঁর কাদামাখা হাত দুটো ঝপাৎ করে ডুবিয়ে দিয়ে হাত ধুতে গেলেন। দোকানী বাবুর কাণ্ড দেখে হাঁ হাঁ করে উঠলো, 'আরে, করেন কি বাবু। আমার সাদা কেরোসিন তালটা নষ্ট করে দেলেন।' শুনে কোথায় দাদামশায়ের অপ্রস্তুত হবার তো কথা, না তিনিই তেড়ে উঠলেন: 'বলি বাছা, তোমার আক্কা তো আক্কেল। কেরোসিন তেল কি অমন করে বাইরে রাখতে হয়। যদি আগুন টাগুন লেগে যায়। আর দেখতে তো ঠিক জলের মতোই। হুঁঃ, যতো সব। দাও, সাবান দাও, জল দাও।' অবশ্য পরে তাঁর দোকান থেকে মুড়ি বাতাসা কদমা কিনে ভাব করে ফেললেন।

পূর্ণবাবু আর একদিন কথায়-কথায় বললেন, তোমার দাদামশায় ছিলেন খুব তেজী। কাউকে ভয় করতেন না। জজ মুন্সেফরাও বাবুকে সমীহ করতেন, শ্রদ্ধা করতেন। তিনি যখন কোর্টে জেরা করতেন বা সওয়াল করতেন, তখন তা শোনবার জন্যে লোক জমে যেতো। আর বহু দুঃখীকে, প্রজাকে সাহায্য করতেন, অনেকের খাজনা মাফ করে দিতেন। সেনগ্রামে গোবিন্দসুন্দরী স্কুল বাবুরই স্থাপিত। বাড়িতেও অনেক গরীব ছেলেকে রেখে পড়াতেন, আমার ভাইপো বিরজাকে তো দেখেইচো।

পূর্ণবাবু আরো অনেক মজার ঘটনা বলেছিলেন। বাবু একদিন সন্ধ্যার পরে আমাকে ডাক দিলেন, 'পুনস্থ শোনো।' আমি গেলাম। দেখি ঘর অন্ধকার। তাকিয়া মাথায় দিয়ে ওপাশ ফিরে শুয়ে আছেন। আমি যেতেই তিনি আমাকে কতকগুলো দরকারী কথা বলে দিয়ে বললেন, 'যাও, শশধরকে ডেকে দাও।' আমি শশধরের ঘরে গিয়ে দেখলাম শশধর নেই, কোথায় গেচে। সেকথা বাবুকে বলতে ঘরে এলাম। কিন্তু আমার পায়ের শব্দে বাবু ভাবলেন শশধর এসেচে। বাবু বলতে লাগলেন, 'দেখো শশধর, তোমাকে একটা কাজের ভার দিতে চাই, তুমিই পারবে। পুনস্থকে দিয়ে হবে না। ওর মাথায় কিসসু নেই, বোকা। ওকে দিলে কাজটা পণ্ড করেই আসবে ইত্যাদি।' আমি আর থাকতে না পেরে বললাম, 'আজ্ঞে আমি পুনস্থ।' ব্যস, সঙ্গেসঙ্গে এপাশ ফিরে আমাকে তেড়ে উঠলেন, 'আচ্ছা লোক তো তুমি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের নিন্দে শুনচো? শুনতে ইচ্ছেও করে? বলবে তো আমি পুনস্থ।' বাবু কোথায় অপ্রস্তুত হবেন, তা না, আমিই অপ্রস্তুত হয়ে আজ্ঞে-আজ্ঞে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁচি। অপ্রস্তুত হওয়া বাবুর ধাতে ছিল না।

পূর্ণবাবু আর একদিন বলেছিলেন, বাবুর হাতের লেখা ছিলো পাকা। টানা আর জড়ানো। আমরাই পড়তে পারতাম, অন্যে সহজে পারতো না। (সে লেখা উদ্ধার করতে আমিও কম গলদঘর্ম হইনি। মাকে লেখা চিঠিও দেখেচি: মা সরলা, আমি অমুক তারিখে অমুক ট্রেনে কলিকাতায় যাইতেছি। আশাকরি সব খবর ভাল। আশীর্বাদ লইবে, বাবা। —বাড়তি কথা নেই।) পূর্ণবাবু বলেছিলেন, একবার বাবুর ঐরকম হাতের লেখা দেখে এক ভদ্রলোক ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'আপনার হাতের লেখা পড়া দুষ্কর। বোঝা যায় না।' সঙ্গে সঙ্গে বাবু মৃদু হেসে

বললেন—'To write elligibly is clerkish, কেরাণীদের হাতের লেখা ভালো হওয়া দরকার। গ্রেটম্যানদের লেখা অমন দুর্বোধ্যই হয়।'

পূর্ণবাবু আরো জানিয়েছিলেন, বাবু কাজের ফাঁকেফাঁকে সাহিত্য-চর্চাও করতেন। অনেক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, জড়িতও ছিলেন। তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, আত্মজীবনী লিখেছেন 'মনের কথা' নামে। বাবুর সঙ্গে 'বিষাদ-সিন্ধু'র লেখক কুমারখালীর মীর মোশাররফ হোসেন সাহেবের খুব বন্ধুত্ব ছিলো। কুমারখালীর জলধর সেনও তাঁর বন্ধু ছিলেন। 'তাঁকে একখানা জলধর সেন গ্রন্থাবলী'ও উপহার দিয়েছিলেন। (সেখানা পড়েচি। পরে আমার মেজবোন 'স্নেহকণা তাদের বাড়ি বদলাবার সময় হারিয়ে ফেলে। কুষ্টিয়ার বাড়িতে আরো কিছু বই পেয়েছিলাম আমি—বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজীতে Rajmohon's Wife, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ, ব্রাহ্মসঙ্গীত, বঙ্গদর্শন কয়েক খণ্ড ইত্যাদি।)

মনমোহন মজুমদার মশায়ের ছেলে আমার বাল্যবন্ধু সুধাংশুর মুখে শুনেচি, দাদামশায় হিতকরী পত্রিকায় তাদের বংশাবলীর কথা লিখেছিলেন এবং সে সেই পত্রিকাটি দেখেচে।

দাদামশায়ের বিষয়ে সুধাংশু আরো দু'টো মজার ঘটনা বলেছিলো। মোহিনী মিলের সত্বাধিকারী মোহিনী মোহন চক্রবর্তীর এক স্মরণসভায় সাহিত্যিক জলধর সেন গেচেন, দাদামশায়ও গেচেন এবং আরো অনেক ভদ্রলোক। ভাষণ দিতে উঠে দাদামশায় কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'মোহিনী-বাবু তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর একবার উরুর নীচেয় কোঁড়া হয় এবং খবর পেয়ে মোহিনীবাবু তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। —বলেই উকিল মানুষ প্রমাণ দেখাবার জন্যে তখুনি সভার মধ্যে হাঁটুর কাপড় তুলে কোঁড়ার জায়গাটা দেখাতে যান আর কি। জলধর সেন তাড়াতাড়ি বল্লেন, 'থাক ভাই, আমরা বিশ্বাস করচি।'

সুধাংশু আরও একটি ঘটনার কথা বলেছিলো। দাদামশায় ছিলেন কাশিমবাজার রাজ এষ্টেট, নলডাঙ্গা রাজ এষ্টেট-এর উকিল বা ল'এজেন্ট। ঐ এষ্টেট দুটি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যাবার পর সেখান থেকে মামলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক সময় সাহেবরাও আসতেন। দাদামশায় তাঁদের খাতির করে দেশী খাবার খাওয়াতেন। পিঠের সময় পিঠে। তাঁদের গোকুল-পিঠে

খাইয়ে বলতেন, 'আমাদের বেঙ্গলী-কেক। এ তোমাদের বিলিতী কেকের চাইতে ভালো।'

দাদামশায়ের আর একটি মজার কাণ্ডের কথা বলি। এটি শুনেচি আমার ফুলকাকা ডাঃ গিরিজাভূষণ ঘোষের কাছ থেকে। এঁরই পুত্র প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ, রূপদর্শী। ফুলকাকার বয়েস এখন আশির উপর। সোজা হয়ে চলেন, বাসে ট্রামে ওঠেন, দাঁতগুলো প্রায় সবই আছে। বলেন, আমি খাটি, হাঁটি আর পেট ভরে খাই। এসব তাউইমশায়ের কাছে, মানে তোমার দাদামশায়ের কাছেই শেখা। একবার কলকাতায় বললেন, 'গিরিজা চলো, হাওড়ায় ট্রেন ধরতে হবে। জিনিসগুলো তুলে নাও, আমিও কিছু নিই, রাস্তায় একখানা গাড়ি ঠিক করে নেওয়া যাবে'খন।' দুজনে বেরুলাম, পথে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে দরে পোষালো না। 'চলো আরো খানিকটা এগিয়ে'। আবার একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পেয়ে তাউইমশায় জিগ্যেস করলেন ভাড়ার কথা। ভাড়া শুনে তাউইমশায় তেড়ে উঠলেন। বললেন, 'চলো আরো একটু এগোই।' চলুন। এদিকে হাত ভারি হয়ে এসেচে, কিন্তু বলবার উপায় নেই, তাড়া খাবার ভয়। জামাইয়ের ভাই বলে খাতিরও নেই। বলবেন হয়তো, আমি বুড়ো মানুষ হয়ে পারচি, আর তুমি জোয়ান ছোকরা হয়ে পারচো না? যাক, ঐভাবে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া ঠিক করতে করতে আমরা প্রায় অর্ধেক রাস্তা এসে পড়লাম। তখন তাউইমশায় একটা প্রস্তাব দিলেন, 'দেখো গিরিজা, আমরা যত ষ্টেশনের দিকে এগোচ্ছি, তত তো ভাড়া কমবে? কিন্তু তেমন কম বলচে না তো কেউ। তা দরকার নেই গাড়িতে। বরং এসো, একটা খাবারের দোকানে বসে দুজনে পেট ভরে সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়া যাক।' আশ্চর্য, তিনি তেমন কিছু খেলেন না, আমাকেই পেট ভরে খাওয়ালেন। ফুলকাকা বললেন, 'শুনে হয়তো ভাববে, তাউইমশায় কৃপণ ছিলেন। তা নয়। তিনি ছিলেন কর্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু, বিলাসিতা বর্জিত। কারোর কোন অভাব দুঃখ দেখলেই তাকে সাহায্য করতেন তিনি। কোন রকম নেশাও ছিলো না তাঁর। তাঁর কাছে শিক্ষা পেয়েই আজ আমি আমার শরীরটাকে কর্মঠ রাখতে পেরেচি। জানো তো, আমার কোন নেশাও নেই।'

সত্যিই, দাদামশায়কে কোনদিন তামাক সিগ্রেট, এমন কি পান

খেতেও দেখিনি। অপুত্রক ছিলেন তিনি, নিজের বিলাসিতার জন্য ইচ্ছে করলে খরচ করতে পারতেন, কিন্তু সেদিকে তাঁর মন ছিলো না। তখন ব্যাংক ছিলো না ভালো, তাই জমিজমা আর বাড়ি করতেন। একবার ট্রেনে অনেকগুলো টাকা পকেটমার হয়, অথচ টাকার দরকার। তাই নবদ্বীপের তিনখানা বাড়ির মধ্যে একখানা ছোট বাড়ি বিক্রী করে দিলেন।

দাদামশায়ের ছিলো ডায়াবিটিস রোগ। মাকে প্রায়ই বলতেন, 'সরলা মা, আমার শরীরের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে যেন! তখন ঐ রোগের ভালো কোন ওষুধ ছিলো না হয়তো। দাদামশায় কলকাতায় গড়পারে মারা যান ১৩৭৯ সালের ২৩শে কার্তিক, ইং ১৯৩২, ৯ই নভেম্বর বুধবার বেলা ৩-৪৫ মিনিটে। মাস পাঁচ ছয় ভুগেছিলেন। হাঁপানি দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু দেখেছি, ঐ রোগশয্যাতেও তিনি কাজ করতেন। অনেকেই আসতেন পরামর্শ নিতে।